ব্রহ্ম চণ্ডালের হাড়

অভিজিৎ সেন

সুবর্ণরেখা

প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৭২

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর : তারাশঙ্কর চৌধুরী
জে ভি প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রিট
কলকাতা ৬

বাবা ও মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

১

শারিবার যখন বছর বারো বয়স, তখন নানি লুবিনির সঙ্গে তার সখ্য গভীরতর হয়। কেননা তখন শারিবা সব বুঝতে শিখেছে, নিজের এবং নিজের লোকজনের চতুষ্পার্শ্ব দেখতে শিখেছে। আর সেই সঙ্গে নানির কাছে শুনে শুনে বর্তমানের সাথে অতীতের যোগসূত্র রচনা করার চেষ্টাও সে করতে পারে তার অপুষ্ট বুদ্ধিতে।

এইভাবে শারিবা বড় হয়। নিচু দাওয়া, তালপাতার বেড়া দেওয়া ঘর, সরকারী ফরেস্ট থেকে চুরি ক'রে আনা শনের চাল। সেই নিচু গুহার মতো ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার পর স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘন তরলতায় জমে থাকে। লুবিনি তখন কাঁপা কাঁপা গলায় প্রাচীন কথা বলে।

লুবিনি বলে এক অজ্ঞাত দেশের কথা। সি দ্যাশ হামি নিজেই দেখি নাই, তোক আর কি কমো। সে দ্যাশের ভাষা বাজিকর নিজেই বিসোরণ হোই গিছে, তোক আর কি শিখামো।

সে এক অপরিচিত দেশ। যেখানে ঘর্ঘরা নামে এক পবিত্র নদী বয়ে যায়। সেখানে নাকি কবে এক শনিবারের ভূমিকম্পে সব ধূলিসাৎ হয়েছিল। ঘর্ঘরার বিশাল এক তীরভূমি ভূ-ত্বকে বসে গিয়ে নদীগর্ভের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর তাতে মিশে গিয়েছিল গোরখপুরের বাজিকরদের জীর্ণ বাড়িঘর। ধ্বংস হয়েছিল বাজিকরদের প্রধান অবলম্বন অসংখ্য জানোয়ার।

সে এক কালো অন্ধকারের শনিবার, যা লুবিনি নিজে দেখে নি, যা সে তার নানার শ্বশুরের কাছ থেকে শুনেছে। তারপর যাযাবর বাজিকরের দল ঘর্ঘরার উত্তর তারে আরো উত্তরে সরে গিয়ে নতুন বসত তৈরি করে। নতুন ক'রে ভাল্লুক বাঁদর সংগ্রহ করে, দূরবর্তী গ্রাম-শহরে গিয়ে গেরস্থ বাড়ি থেকে ভইস চুরি ক'রে আনে। আবার বছরের আট মাস দশ মাস দুনিয়া ঘুরে বেড়াবার নেশায় বেড়িয়ে পড়ে তারা। তখন গলা লম্বা ক'রে বাড়িয়ে দিয়ে মোষের সারি চলত রাস্তা দিয়ে, গ্রাম-শহরের ভিতর দিয়ে। সেই মোষের পিঠে থাকত বাচ্চারা আর বুড়ো-বুড়িরা। আর থাকত মাল। কোথাও গিয়ে তারা থামত। নদীর পাড়ে, শহরের বাইরের মাঠে, গ্রামের প্রাচীন বটের তলায়। ডুগডুগ ক'রে ঢোলকে কাঠি পড়ত। জনপদের কুকুরগুলো তেড়ে তেড়ে আসত। বাজিকরদের কুকুরগুলো উত্তেজনায় শিকল ছিঁড়ে ফেলতে চাইত। চৌকিদার এসে সর্দারকে থানায় ডেকে নিয়ে যেত।

—জী হুজুর, হামরা বাউদিয়া-বাজিকর বটি। জী মালিক, হামার নাম পীতেম বাজিকর। দলে পাঁচকুড়ি পাঁচজনা আদমি আছে। উস্‌মে শোচ লিজিয়ে দেড়কুড়ি মরদ, দেড়কুড়ি আওরৎ, আর বাকি সব চেংড়া-বাচ্চা।

থানাঘরের বউ-বিবি-বাচ্চারা ভিড করত। অসীম কৌতূহল সবার চোখে। ক কি খেলা আছে তোমাদের ?

—বান্দর আছে, ভাল্লু আছে, দড়ির খেলা আছে, ভানমতি আছে, বহুৎ কিসিমের খেলা আছে।

—সাপ নেই, সাপ ?

—নেহি মালকিন, বাজিকর সাপ ধরা জানে না।

দশ-পাঁচ টাকা থানাবাবুকে জল খেতে দিতে হয়। তারপরে ছাডপত্র মেলে। ঠিক আছে, থাকো, কিন্তু কোনো নালিশ যেন না আসে।

—নেহি জী, নালিশ কেন আসবে ? হামার দলের কোনো বদনাম নেই, হুজুর। সেলাম মালিক, বান্দার নাম পীতেম বাজিকর। কোই দরকার লাগলে চৌকিদারকে ভেজে দেবেন।

—কেন্‌কা বুলি ক'ছেন তুই নানি, বুঝা পারি না। ওলা কি হামরাদের আগ্‌লা দ্যাশের বুলি

—না রে, শারিবা। এলা বুলি বাজকর দ্যাশ দ্যাশ ঘুর্যো শিখা লয়। যেথায় ঘুরে সিথাকার বুলি ধর্যো লয়, সিথাকার ধরমকরম শিখ্যে লয়। সিটা তার আপন বুলিতে মিশাল কর্যো লয়। বাজিকরের আপন কুনো ধরম নাই। করম এ্যাটা আছে বটে, তো সিটা হোল ভিখ্‌-মাঙ্গার কাম। মুলুক মুলুক ঘুর্যো বান্দর লাচানো, ভাল্লু লাচানো, পিচ্‌লু বুড়া, পিচ্‌লু বুড়ির কাঠের পুতলা লাচানো, ভানমতির খেলা, বাঁশ-বাজি, দড়িবাজি, নররাক্ষস হয়া কাঁচা হাঁস, কাঁচা মুরগা কডমড কডমড কর্যো খাওয়া, এলা সব বাজিকরের কাম। এলা সব ভিখ্‌-মাঙ্গার কাম।

—ভিখ্‌-মাঙ্গার কাম !

—হাঁ, ভিখ্‌-মাঙ্গার কাম।

—যাঃ !

শারিবার বিশ্বাস হয় না। অথবা, ভিখ্‌-মাঙ্গা কথাটা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার, সেটা ভিখ্‌-মাঙ্গা হবে কেন ?

—হঁ, হামরা বলি ভিখ্‌-মাঙ্গা। তোর নানা বলত ভিখ্‌-মাঙ্গা। কাম হইল খেতির কাম, কলের কাম, কামার, কুমার, চাষী, মজুরের কাম। হামরা তো ওলা কাম কদাপি করি নাই। হামরা তো ওলা কাম জানি না।

—তুই খেলা দেখাতিস, নানি ?

—দেখাতাম তো। পিচ্‌লু-বুড়া পিচ্‌লু-বুড়ির পুতলা তুই দেখিস নাই, শারিবা ? হাতের উপর গামছা ঢাকা দিয়া সি পুতলা লাচাতাম। কাঠের ময়ূর লাচাতাম।

—আর বাঁশবাজি, দড়িবাজি ?

—হাঁ সিগ্‌লাও করতাম। বিশ হাত উচা বাঁশের মাথাৎ সিধা দাঁড়ায়া ছুঁচে সুতা পরাতাম। দুইধারে ভইসের সিংএ দড়ি বাইন্ধে বাঁশ দিয়া ঠেল্যে সি দড়ি

টনটনা হতো। ভূঁই থিকা বিশ হাত উচাতে বাঁশ হাতে হাটা চলা, লাচ দেখানো—সি ভোয়ানক কঠিন খেলা রে.. শারিবা!

শারিবা মনশ্চক্ষে নানির দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া দেখে, দোল দেওয়া দেখে, তারপরেই তার চমক ভাঙে।

-ভূঁয়ে হাঁটবা পারিস না তুই, দড়িতে হাঁটতি কেম্‌কা!

কল্পনায় সে এই লোলচর্ম কানিপরা নানিকেই দড়ির উপরে হাঁটতে দেখে, তাতেই চমক খায়। অথচ অবিশ্বাসও করতে পারে না। নানিকে তার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

নানি ফোকলা দাতে প্রচুর হাসে।

-হায় বাপু, নানি তোর এংকা বুঢ়াই আছিল্ নাকি চেরদিন। বাজিকরের বেটা, শারিবা, এংকা বেহোঁশই হয়। তোর দোষ নাই।

শারিবা লজ্জা পায়। দেওয়ালে, নিচু চালায় ছায়া কাঁপে। লম্ফে আলো থেকে ধোঁয়া হয় বেশি। নানির শীর্ণ কুৎসিত অবয়ব দেয়ালে ভয়াবহ দেখায়, প্রেতিনীর মতো। বুড়ো কুকুরটা গুঁড়ি মেরে পায়ের কাছে শুয়ে আছে। বুড়ির কুকুর গোকো। গোকোর বয়স বুঝি শারিবার মতোই। দীর্ঘ দেহ আর ঝোলানো কান নিয়ে গোকো অতীতকে ধরে আছে। নানি গোকোর মাথায় হাত রাখে। 'গোকো বুঢাটা হোই গিলি, গোকো।' গোকো হাই তোলে ও গুরগুর ক'রে আদর উপভোগের স্বীকৃতি জানায়।

তারপর রাত বাড়ত। পাচবিবি গ্রামের বাইরে নদীর ধারে কুঁড়েঘরগুলোয় হঠাৎ দমকা হাওয়া লাগত। গোকোর কান খাড়া হতো। শারিবা নানির কোলের আরো কাছে ঘন হয়ে আসত। বাজিকর বোকা বটে। আশপাশের হিন্দু-মুসলমান সবার কাছে বাজিকর বোকা, বাজিকর বজ্জাত। ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে শারিবা এসব চিন্তা করত বারো বছর বয়সে।

তারপর নদীর পাড়ে দুই কুঠিবাড়ির কোনো একটার হাতি নামত জল খেতে। দুই জমিদারের কুঠি ছিল পাঁচবিবিতে। লালকুঠির হাতিটা ছিল মাকনা আর চৌধুরীকুঠির হাতিটা দাঁতাল। দুই হাতি একসঙ্গে যদি কোনোদিন এসে পড়ত, তাহলেই সর্বনাশ হতো।

মরণবাঁচন লড়াই লাগত মাকনা আর দাঁতালে। আশপাশের গাছপালা ভাঙত। বাড়িঘর ভাঙত। মানুষ মরত। গ্রামের মানুষ মশাল জ্বেলে, টিন বাজিয়ে হাতিকে ভয় দেখাত। এপারের মানুষ, ওপারের মানুষ সবাই সন্ত্রস্ত এবং সজাগ থাকত। ভীষণ চিৎকার উঠত। গোকোকে তখন বেঁধে রাখতে হতো।

গোকো সেভাবেই মারা যায় হাতির পায়ের নিচে পড়ে। কেননা সবাই তখন পালিয়েছিল। দু'টো মত্ত হাতি কোনো বাধাই মানছিল না। গোকো বাঁধা ছিল, ত্রাসে সে খেয়াল কারোই ছিল না, নানিরও না। হাতি ঘর ভাঙছে, শনের ঘর,

তালপাতার বেড়া, বাঁশের খুঁটি। গোকো মারা পড়ে।

এভাবে তিনবার ঘর ভাঙার স্মৃতি শারিবার সারাজীবন থাকে। কেননা, তার নানা জামির বাজিকর স্থিতিবান হতে চেয়েছিল। জামিরের পিতামহ পীতেম পুবের এই দেশটাকে বোধহয় ভালোবেসেই ফেলেছিল। সে তার দলবল নিয়ে শেষবারের মতো গোরখপুর ত্যাগ করার পর এদিকেই এসেছিল।

পীতেমের আগেও বাজিকরেরা এদেশে আসত, কিন্তু সে করতে চাইল চিরস্থায়ী গৃহস্থী। পীতেমের পরে বালি, তারপর জামির দলের সর্দারি পায়। জামিরের বাপ ধন্দ অল্প বয়সে খুন হয়। কাজেই লুবিনির স্মৃতিতে সে খুব উজ্জ্বল নয়। বাজিকর এমন অঢেল জমি, ধান এবং জল তার পরিচিত ভূমণ্ডলে কোথাও দেখে নি, যদিও বাজিকরের পরিচিত ভূমণ্ডল খুব ছোট ছিল না।

কিন্তু সেই ভূমণ্ডলে শস্যদানার বড অভাব। বিশেষত বাজিকরের। সারা দিনমান জন্তু-জানোয়ার নাচাও, দড়িবাজি, বাঁশবাজি কর, সন্ধ্যায় সেই ভিখ্-মেঙ্গে পাওয়া ('হাঁ, শারিবা, ভিখ্-মাঙ্গা') শস্যদানা ছাইপাঁশ সব মিলিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসে ফুটিয়ে নেও। এই হল বাজিকরের খাওয়া। এসব নানির বলবার দরকার ছিল না, এসব শারিবা তখন নিজেই বুঝতে শিখেছে।

আর এ জন্যই এর কিছুদিন পরেই শারিবা বুঝতে পারবে বাজিকর বাউদিয়ার স্বর্গে কেন এত অঢেল খাবার বন্দোবস্ত। নানি বলত, স্বর্গ শারিবা, সি এক আশ্চায্য জায়গা!

শারিবা বলবে, স্বগ কুনঠি?

নানি বলবে, সিটা তো জানা নাই, বাপ। জানা থাকলি তো কবিই চলি যাতাম। মবার পরে সেটি যাওয়া যায়।

তখন শারিবা একটা কথা বলবে, যা কোনোদিন আর কোনো বাজিকর বাউদিয়া বলে নি।

শারিবা বলবে, তবি হামার ওঠি যাবার দরকার নাই, নানি। মরার পর হামার অঢেল খাবার খায়্যে কি হোবে?

এসব কথা অনেক পরের। তখনো গোকো মরে নি। তখনো চৌধুরী সাহেব "তুমরা হিন্দু না মোছলমান" এ প্রশ্ন তোলে নি। তখনো হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয় নি। তখনো লালকুঠির ম্যানেজার মহিমবাবু "হাঁই বাপু, তোরা গরুও খাস, শুয়ারও খাস, ই কেম্‌কা জাত রে বাপো!" বলে আঁতকে ওঠে নি।

২

শনিবারের ভূমিকম্পের পর ঘরবার উত্তর তীরে সরে গিয়ে পীতেম আবার তার দলবল নিয়ে ডেরা তোলে। সে গ্রামটা ছিল গোয়ালাদের। তারা এসে বলে, বাজিকর, হেথায় থাকা চলবে না। তাদের হাতে মোটামোটা বাঁশের লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে তারা খেপা ষাঁড় ঠাণ্ডা করে, জঙ্গলের জানোয়ার তাড়ায়।

পীতেম বলে, বাজকর তো স্থায়ী বসবাস করে না। দু-চার মাস থাকব, ফের উঠে যাব। তোমাদের জমি তো দখল হয়ে যাচ্ছে না।

সেকথা কেউ শুনল না। তারা বাজিকরদের তিনদিনের মধ্যে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিল পীতেম বলল, ঠিক আছে যাব। সারা দুনিয়া বাজিকরের। জায়গার অভাব?

কিন্তু অন্যরা বলল, কিন্তু ভইস? কিন্তু ঘোড়া? খাব কি? যাব কি ক'রে?

পীতেম ভাবতে থাকে, কিন্তু ভইস? কিন্তু ঘোড়া? খাব কি? যাব কি ক'রে দেশ-দেশান্তর? শনিবারের ভূমিকম্প কিছুই অবশিষ্ট রেখে যায় না। দলকে এখন বাঁচানোই মুশকিল।

দু'রাত্তির ঘুম হল না পীতেমের। দেবদুর্বিপাক তার মনটাকে দুর্বল ক'রে দিয়েছিল। তৃতীয় রাতে অচেতনের মতো ঘুমায় পীতেম। ঘুমের মধ্যে তার মরা বাপ দনু আসে তার কাছে।

—পীতেম হে, পীতেম?

—বাপ?

—চোখেৎ পানি ক্যান বাপ?

পথেৎ যামো কেংকা বাপ? দল নষ্ট হোই যাবে, বাপ।

ক্যানে বাপ, তোর দুক্ষু কিসের?

—ভইস কোই বাপ? ঘোড়া কই বাপ?

হাঁই দেখ, জঙ্গলের ধারে কত গাবতান ভৈসী ঘুরে বেড়ায়। হাঁই দেখ, কত যোয়ান টাট্টু ঘুরে বেড়ায়। ওলা সব তুমার। দুনিয়ার বেবাক মাঠেৎ চরা জানোয়ার তুমার।

—বাপ।

—পীতেম হে, পীতেম, পুবের দেশেৎ যাও, বাপ। সিথায় তুমার নসীব।

—পুবের দেশেৎ?

—পীতেম, হে পীতেম, রহু তুমার সহায় থাকুক।

পরদিন পীতেমের দল জঙ্গলের পথ ধরে দিগন্তের দিকে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে গেল

পাঁচটি গাবতান মোষ, পাঁচটি বাছাই টাট্টু। পথে সেই মোষদের নধর বাছুর হল। দুধের বান ডাকল। সেই দুধ-ঘি বাজিকরের মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করতে করতে চলল। সে-সব জানোয়ারের বংশ বাড়ল। বাজিকর তখন জানোয়ারও বেচত।

—এইভাবে, শারিবা, গোরখপুর থিকা ডেহ্‌রিঘাট, সিথায় ক'বছর, তাবাদে সিওয়ান, সিথায় ক'বছর, তাবাদে দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের, কত দেশে তোর নানার নানা বসৎ করার চেষ্টা করল, হল না। তারপর এই পুবের দেশ। তা এখানেও কি স্বস্তি আছে? মানুষ চায়, বাউদিয়া বাউদিয়াই থাকুক, বাজিকর বাজিকরই থাকুক। তার আবার ঘর-গেরস্থালি কি? রাজমহল, মালদা, নমনকুড়ি, রাজশাহী, আমুনাডা, পাচ বিবি। সব শেষে এই পাচবিবি। আরো কত জাশ ঘুরলো সি বাজিকরের দল, তোক আর কি ক'মো। সব কি কারো স্মরণ আছে?

বাউদিয়া-বাজিকর পিছনে যা ফেলে যায় তা জানোয়ারের বিষ্ঠা, কে তার কথা স্মরণ করে? যা পরিত্যাজ্য তাই পিছনে ফেলে যেতে হয়। তার কথা মনে রাখার কোনো কারণ নেই। তবুও পীতেম বৃদ্ধ বয়সে নাতবউ লুবিনির কাছে এসব কথা বলত। কেননা ধন্দ জোয়ান বয়সে খন হয়েছিল। জামিরের বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছর বয়সে, তখন লুবিনির বয়স দশ বছর। সেই দশ বছরের মেয়েকে সামলানোর দায় ছিল পীতেমের। বাজিকরের তাবুতে এত কম বয়সে বিয়ের রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু এই পুবের দেশে সাহেবদের তখন বড় হাঁকডাক। কি ভাবে যেন রটে গিয়েছিল, মহারানির রাজত্বে ষোল বছরের ঊর্ধ্বে ছেলেমেয়েদের আর বিয়ে দেওয়া যাবে না। দিলে বে আইনী হবে। এ রকম গুজব হামেশাই রটত তখন। কেউ তলিয়ে ভাবত না, ভয় পেত। কাজেই একদিন পনেরো জোড়া বাজিকরের ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। তার মধ্যে জামির আর লুবিনিও ছিল।

তাই পীতেম সামলাত লুবিনিকে। পীতেম বলত শনিবারের ভূমিকম্পের কথা। পীতেম বলত ডেহ্‌রিঘাট, সিওয়ানের কথা। তারপর রাজমহলের কথা।

৩

রাজমহলের গঙ্গার ধারে বাজিকরের ছাউনি পড়ল সারি সারি। রাজমহল তখন গমগমা জায়গা। এখানে সেখানে রেলের লাইন বসছে। গঙ্গায় শ'য়ে শ'য়ে মহাজনী নৌকো। গোছগাছ হয়ে গেলে দলের লোকদের ডেকে পীতেম বলে, এ জায়গা মনে হচ্ছে পয়সার জায়গা। যে যার মতো কাজে লেগে পড। বাপ আমাকে বলেছিল পুবের দেশে আসতে। এ হল সেই পুবের দেশ। গোরখপুরের ঠিকানা তো উঠেছে। নতুন ঠিকানা বানাতে হবে। এখন পয়সা কামাও।

কদিনের মধ্যেই খবর পেয়ে দারোগা এসে হাজির হয়। পীতেম বলে, চৌকিদার দিয়ে খবর পাঠালেই হতো, হুজুর। কষ্ট করলেন।

দারোগা প্রতি ছাউনিতে উঁকি দিয়ে দেখল। তারপর বলে, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

পীতেম মিথ্যা কথা বলে, কেননা, এ রকমই নিয়ম।

দারোগা বলে, কতদিন থাকা হবে?

পীতেমের অনির্দিষ্ট উত্তর, কেননা এ রকমই নিয়ম।

দারোগা তারপর জন্তু-জানোয়ার দেখে এবং সবচেয়ে দামাল ঘোড়াটি পছন্দ করে।

পীতেম একটু বিপদে পড়ে, কারণ ঘোড়াটা ধন্দুর বড় আদরের এবং ধন্দুকেই সে সওয়ার হিসাবে সহ্য করে। সে বলে, হুজুর, ও বজ্জাতকে নিয়ে পোষাতে পারবেন না। ও হুকুম মানে না, পোষ মানে না। নিয়ে গেলেও পালিয়ে আসবে।

দারোগা এসব অজুহাত মনে করে। তাছাড়া ঘোড়াটা তার পছন্দ হয়েছে এবং ছেলের জন্য একটা তার দরকারও।

দারোগা বলে, দেখ, বাজিকর, জানোয়ারটা আমার চাই। পরে পাঠিয়ে দিও।

পীতেম তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে নানাভাবে। বলে, হুজুর, ও জানোয়ার অবাধ্য। আপনি আর চারটার মধ্যে যেটা হয় একটা বেছে নিন। না হলে পরে আমায় দোষী করবেন।

পীতেম এসব কথা বলছিল এবং ধন্দুর দিকে নজর রাখছিল। ধন্দু গম্ভীর মুখে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

দারোগা কথা না বাড়িয়ে লাফ দিয়ে নিজের ঘোড়ায় উঠে টাপটাপ শব্দে সামনে এগোয়। সঙ্গের চৌকিদার বলে, বাজিকর, ঘোড়া কাল সকালের মধ্যে পৌঁছায় যেন, না হলে তোর কপালে দুঃখ আছে।

ধন্দু হঠাৎ লাফ দিয়ে তার আদরের ঘোড়ায় উঠে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই সে গঙ্গার বালিয়াড়িতে নেমে পড়ে সামনের দিকে ঘোড়া হাঁকাতে থাকে পাগলের মতো।

পীতেম শুধু তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না। ধন্দু দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। গঙ্গার বালিয়াড়িতে ধুলো ওড়ে, তার মধ্যে ধন্দুর মাথার লাল ফেট্টির ঝলক দেখা যায় শুধু। কিন্তু পীতেম জানে ঘোড়াটা দিতে হবে।

ধন্দুও জানত ঘোড়াটা দিতে হবে। কিন্তু ঘোড়াটা তার খুব আদরের। ভারি সুন্দর মাদী ঘোড়া। ভারি ভালো স্বাস্থ্য। পীতেম ভেবেছিল এটার কাছ থেকে বেশ কয়েকটা বাচ্চা পাওয়া যাবে। কিন্তু দারোগাকে এড়ানো যাবে না। এ জন্য তার দুঃখ নেই। কারণ তারাও এগুলো চুরি ক'রে এনেছে। আর দারোগাকে দেওয়াই নিয়ম।

অনেক রাত হয়ে যাওয়ার পরেও ধন্দু ঘোড়া নিয়ে ফিরল না। বাজিকরদের খোলা আকাশের নিচের রাত্রিবেলার আহার শেষ। সব তাবুর সামনের আগুনই প্রায় নিবে এসেছে, কিন্তু ধন্দু ফিরল না।

মাঝরাতে পীতেম আরো তিন যোয়ান বাজিকরকে ডেকে ওঠাল। ধন্দুকে খুঁজে বের করতে হবে, কাল সকালে তো ঘোড়াটা দারোগাকে দিয়ে আসতে হবে।

চারটি টাট্টুতে চারজন সওয়ার হয়ে গঙ্গার বালিয়াড়ি ভাঙতে থাকে।

পীতেম বলে, আমার বাপ বলেছিল, দুনিয়ার সব মাঠে-চরা জানোয়ার তোমার।

বালি নামে এক যুবক বলে, কিন্তু তার মধ্যের ভালোটা দারোগার।

জ্যোৎস্নালোকিত বালির চড়ায় চারজন ঘোড়সওয়ার হঠাৎ হা হা ক'রে হেসে উঠে স্তব্ধতা ভাঙে।

পীতেম বলে, ধন্দুটা বোকা। ভালো ঘোড়া মাঠে আরো চরবে।

চাঁদের আলোয় বাঁ পাশে রূপোর মতো চকচকে গঙ্গা রেখে দু' ক্রোশ মতো বালি ভাঙে তারা। তারপর ধন্দুকে পায়। গঙ্গার দিকে পিছন দিয়ে সে বসে ছিল। সামনে ঘোড়াটা দাঁড়িয়েছিল ছবির মতো।

এদের আসতে দেখে ধন্দু উঠে দাঁড়ায়। কোনো কথা না বলে নিজের ঘোড়ায় উঠে তাঁবুর দিকে চলতে শুরু করে। এরা চারজন নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে।

কিছু সময় পরে পীতেম বলে, তোর নানা বলত, মাঠে যত জানোয়ার চরে তার সবই বাজিকরের।

আর ধন্দুও প্রায় বালির কথাটাই বলে। বলে, কিন্তু এটা দারোগার।

- কিন্তু দারোগার মান তো রাখতেই হবে।

— আজ রাতেই তো এখান থেকে চলে গেলে হয়।

— পাগল!

—তাহলে দারোগাকে তোমার অনেককিছু দিতে হবে, শুধু ঘোড়ায় হবে না।

পীতেম বলেছিল, এ দেশে পয়সা আছে। ভিখ-মাঙ্গা বাজিকরের কাছ থেকে আর কি নেবে দারোগা!

পরদিন দারোগার ছেলে এসে হাজির হয়েছিল সকাল সকালই। বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা। পীতেম বলেছিল, আসুন, ছোট হুজুর, বসুন।

ছোকরা বলে, বসতে আসি নি। কোথায়, আমার ঘোড়া কোথায়?

বালি ঘোড়াটার লাগাম ধরে কাছে নিয়ে আসে। ধন্দু সেই একই গাছের নিচে তির্যকভাবে দাঁড়িয়ে।

পীতেম বলে, ছোট হুজুর, ঘোড়াটা বড় বজ্জাত, ভয় হয়, আঘাত না করে!

দারোগার ছেলে বলে, আমিও বজ্জাত। দেখা যাক কে বেশি বজ্জাত।

সে অত্যন্ত অভিজ্ঞ দাম্ভিক ভঙ্গিতে হাসে, যা দেখে পীতেম অবাক হয়।

ছোকরা লাগামটা হাতে নিয়ে হাতের চাবুকে হাওয়ায় আওয়াজ তোলে। ঘোড়াটা চমকে ওঠে। সব তাঁবু থেকে মানুষ বেরিয়ে এসেছে দারোগার ছেলেকে দেখতে। ছোকরা হঠাৎ লাফ দিয়ে নাঙ্গা পিঠে সওয়ার হয়।

ঘোড়াটা অবশ্যই বজ্জাত। ভীষণ ডাক ছেড়ে সে পিছনের পা জোড়া শূন্যে ছুঁড়তে থাকে। পরিষ্কার সওয়ারকে ফেলে দেওয়ার বাসনা। কিন্তু সওয়ার সহজে পড়ে না। দক্ষতায় সে আঁকড়ে থাকে ঘোড়ার পিঠ এবং শূন্যে চাবুকের শিস তোলে। জানোয়ারটা পরিত্রাহি চেঁচায় এবং এমনভাবে পিছনের পা ছোঁড়ে যেন মনে হয় পায়ে তার সাপ জড়িয়েছে।

দারোগার ছেলে এবার ঘোড়াকে আঘাত করে। তাতে জানোয়ারটা আরো ক্ষিপ্ত হয়। যুবকের চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে উত্তেজনায়। সে আবার লাফ দিয়ে নামে ঘোড়া থেকে। লাগাম তার হাতেই থাকে। ধন্দু শব্দ ক'রে হাসে। পীতেম কিছু বলতে যায়। যুবক লাগামে বারবার ঝটকা মেরে ঘোড়াটাকে আহত করার চেষ্টা করে, তারপর উন্মাদের মতো চাবুক চালাতে থাকে।

ঘোড়া প্রথমে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু দারোগার ছেলে গায়ে শক্তি রাখে। সে নির্মমভাবে চাবুক চালায়। ঘোড়া এবার সামনের দু'পা তুলে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। ধন্দু চিৎকার ক'রে ওঠে। বালি এবং আর একজন যুবক ধন্দুকে দু'দিকে ধরে টেনে হিঁচড়ে তাঁবুর পিছন দিকে নিয়ে যায়।

সমস্ত শরীর রক্তাক্ত ক'রে দিয়ে যুবক তার চাবুক থামায়। ঘোড়াটা সতর্ক স্থির হয়ে থাকে। তার সমস্ত শরীর থির থির করে। তার চোখ বিস্ফারিত। পীতেম নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকে।

যুবকটি আচমকা আবার লাফ দিয়ে ঘোড়ায় ওঠে। জানোয়ারটা এবার আর লাফায় না। শুধু পিছনের পা দু'টো একটু নিচু ক'রে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

যুবক পা দিয়ে তলপেটে গুঁতো মারে। ঘোড়া চলতে শুরু করে। লাগাম টেনে দারোগার ছেলে ঘোড়ার মুখ ঘোরায়। তারপর পীতেমের দিকে তাকিয়ে হাত তোলে। বলে, চলি সর্দার।

ঘোড়া দুলকি চালে রাস্তায় উঠে যায়।

রাজমহল, বারহেট, তিনপাহাড, সাহেবগঞ্জের হাটেবাজারে পীতেমের দল রঙীন কামিজ আর ঘাঘরা উড়িয়ে নতুন বিহ্বলতা আনে। মোষের সিংএ বাঁধা দড়ি দু'পাশে বাঁশ দিয়ে ঠেলে টনটনা করা হয়। তার উপরে লম্বা বাঁশ হাতে যে রমণী চলে ফিরে আগুপিছু ক'রে তার শরীর বড টান টান, তার চোখমুখে আগুনে মসৃণতা, তার গায়ের চামড়া পাকা গমের রঙের। নিচে যে মানুষটা ঢোলক বাজায় তার মাথায় রঙীন ফেট্টি। আর একজন উপরআলির চলার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে বিচিত্র গান গায়, যে ভাষা কেউ বোঝে না, কিন্তু সুরের মাদকতা এড়াতে পারে না।

মাধোয়া ধাইর্ যারে
মাধোয়া ধাইর্ যারে
ছোটি ছোটানি মাধোযা ধাইর্ যা
তিলেক্ পড়োরে তিলেক্ পড়োরে
ছোটি ছোটানি মাধোয়া ধাইর্ যা
হেরছি ধকুড়িরে হেরছি ধকুড়িরে
ছোটি ছোটানি হেরছি ধকুড়ি।

নতুন নতুন বসতি সব, নতুন নতুন মানুষ, উঠতি বড়লোক, জাঁকজমক, ঠাট, সবই নতুন। বাজিকর ভাবে, হ্যাঁ, এমন জায়গাই বা জিকরের উপযুক্ত বটে। সাহেব, পুলিস, মুন্সি, মহাজন, শুঁড়ি, কয়াল, দোকানদার, মোদক, দালাল সব মিলে একটা ব্যাপক লুঠের বন্দোবস্ত। প্রথমে বোঝা যায় না কে লুঠ করে আর কে লুঠ হয়। এ ভারি মজার ব্যাপার। যে লুঠ করে তার উল্লাস বোঝা যায়। কিন্তু যে মানুষটা লুঠ হচ্ছে সে কেমনে দিনের শেষে শুঁড়ির দোকানে হুল্লোড় করে? মোরগা-লড়াইয়ে বাজি রাখে হাটে আনা শেষ সম্বল?

পীতেম বলে, বাজিকরের বেটারা, চোখ কান খোলা রেখে চল। দেখেবুঝে চল। পয়সা তোমাদের হাতে আসবে। দুঃখ তোমাদের ঘুঁচবে।

হাটের মাঝখানে বাজিকর খেলোয়াড়ের খেলার আসর যখন জমে ওঠে তখন পীতেম তার কিছু লোককে ছড়িয়ে দেয় হাটের মধ্যে। তারা নানারকম মনোহারি জিনিস বিক্রি করে অবিশ্বাস্য বিনিময়-মাধ্যমে। একটা রঙীন পুঁতির মালার বদলে একঝুড়ি চাল পাওয়া যায়, একখানা গালার চিরুনিতে পাওয়া যায় পাঁচ সের সরষে, নেশার জিনিসের বদলে সর্বস্ব দিয়ে দিতেও মানুষ রাজি থাকে।

এসব দেয় কারা? এসব দেয় যারা দূর দূর গ্রাম থেকে গরুর গাড়িতে অথবা পিঠের বাঁকে শস্য নিয়ে আসে। যাদের কাঁধে গোঁজা একটি বাঁশি অবশ্যই হাত খালি

হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, যখন সে সমস্ত গ্লানি এবং শ্রমকে ভুলে সেই বাঁশিতে ফুঁ দেয়।

এই মানুষগুলো চকচকে কালো, উজ্জ্বল দাঁত তাদের, অফুরন্ত তাদের আনন্দ। পীতেম তাদের দেখেছিল বিস্ময়ের সঙ্গে। এরা বাদিয়া বাজিকরের মতো নয়, আবার এরা সাধারণ গৃহস্থের মতোও নয়। এরা পণ্ডিতও নয়, মূর্খও নয়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, খেটে-খাওয়া মানুষ এরা। পাহাড় ভেঙে, জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে অবিশ্রান্ত নিষ্ঠায় তারা ফসলের জমি তৈরি করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা পরিশ্রম করে, তার পরেও গান গায় এবং নাচে—জীবনকে উপভোগ করে।

এই মানুষ হড়, এই মানুষ সাঁওতাল। পীতেম দেখেছিল রাজমহল, বারহেট, আমগাছিয়া, পিপড়া ইত্যাদি শহর-গ্রাম-হাটে এইসব মানুষ দ্রব্য বিক্রয় এবং বিনিময় যাই করুক না কেন, প্রায় সব সময়ই তাতে প্রকারান্তর থাকে। যখন বেচে তখন পদ্ধতি থাকে একরকম, যার নাম "হাচ্‌কা", অর্থাৎ ঝুড়িসুদ্ধ অথবা গাড়ি-সুদ্ধ, কখনোই ওজনে নয়। আর যখন ক্রয় করে, তখন গোলাদার, মহাজন অথবা যে কোনো ক্রেতাই হোক না কেন, পদ্ধতিটা হয় ওজনের। সেসময় যে বাটখারা ব্যবহার করা হয় তার কোনো নির্দিষ্ট ওজন-মান নেই, নেই কোনো সাধারণ সর্বজনীনতাও। যে যেমনভাবে পারে এই জটিলতাবর্জিত হড়কে বুঝ দিচ্ছে, তা ওজনে হোক কিংবা পয়সায় হোক। আর কি আশ্চর্য, এরা বুঝে যাচ্ছে, মেনে নিচ্ছে, খুব যে অখুশি তাও মনে হচ্ছে না।

সুতরাং পীতেম মনোযোগ দেয় কিছু সঞ্চয়ের দিকে। তার বহুদেশদর্শী ইন্দ্রিয় বলছিল, এ অবস্থা বেশিদিন চলবে না। কাজেই যতদিন চলে, যতদিন বাজার গরম থাকে, তার মধ্যেই তারা যাযাবরী ব্যবসায় অর্থোপার্জন করতে থাকে।

সে পরতাপ এবং জিল্লু এই দুই বাজিকরকে ঘোড়ায় ক'রে মুর্শিদাবাদ পাঠায় সওদা আনতে। রূপা, তামা, পেতল, রাং এবং গালার নানান ধরনের গহনা এবং অন্যান্য মনোহারী জিনিসের চলন খুবই বেশি। এ সবের বিনিময়ে পাওয়া যায় খাদ্যশস্য এবং তৈলবীজ। যা আবার গোলাদার কিংবা যে কোনো ব্যবসায়ীর কাছে নগদ টাকায় বেচা যায়। দাম ইদানিং খুবই ভালো। বিশ সের গম, পনেরো সের চাল অথবা দশ সের তৈলবীজের বদলে এক থেকে দেড় টাকা পাওয়া যায়। আর এইসব চাল, গম কিংবা তৈলবীজ চতুর মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন নয়।

পীতেম বলে, ভইসের বচ্চাগুলোকে ভালো ক'রে ঘাসজল দেও তোমরা। ওগুলোকে এবার হাটে তুলতে হবে।

বস্তুত পাঁচটি গাবতান ভৈসী পাঁচটি নধর শাবক দিয়েছিল। সেইসব শাবকেরা যথাসময়ে আবার বংশবৃদ্ধি করেছিল। বাজিকরেরা নিজেরাই এঁড়েগুলোকে খাসী করত। কেননা, বলদ ভৈসের বাজার সব দেশে এবং সব সময়ই ভালো। এখন বাজিকরের তাঁবুতে অনেকগুলো বলদ ভইস আছে, যারা উঠতি যোয়ান। এক বছর

শিক্ষিত মোষ কিংবা বলদেব পিছন পিছন নবিশি করলে পরের বছর স্বাধীনভাবে কাজ করানো যাবে।

বাজিকরের ছাউনিতে জানোয়ার কিনতে মানুষ হামেশাই আসে। দয়ারাম ভকত নামে এক মহাজন মোষ কিনতে এসে পীতেমের সঙ্গে আলাপ জমায়। বাজিকরের হালচাল ব্যবসাবাণিজ্য এবং ওষুধপত্তরের খোঁজ নেয়। প্রচুর সম্পত্তির মালিক দয়ারামের দেহে সুখ নেই। পীতেম জানে, দয়ারামের যা বয়েস তাতে দেহে নতুন ক'রে সুখ আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ঝানু মহাজন সমস্ত কিছু বুঝেও এ জিনিসটা বুঝতে পারবে না, এও পীতেম জানে। আর বুঝলে পরে বাজিকরেরই বা চলে কিসে?

কিন্তু দয়ারাম ব্যবসাদার, কাজেই মোষ কেনার ব্যাপারটাই সে প্রথমে উত্থাপন করে। গুহ্য ব্যাপার, যার সঙ্গে দুর্বলতা জড়িত, তা পরের প্রসঙ্গের জন্য রেখে দেয়। আবার পীতেমও জাত বাদিয়া। সেও জানে এরপরে দয়ারামের কাছ থেকে কি প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে। সে সালমাকে কাছাকাছি রাখে। সালমা প্রৌঢ়া, কিন্তু তার শরীর কোন অজ্ঞাত কারণে টানটান এবং স্তনদ্বয় এখনো উদ্ধত।

দয়ারাম বলে, বাজিকর তোমার এ দামড়া ভইসের দাম আশি টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়।

পীতেম বলে, মহাজন আদমি আপনি জানোয়ারের দাম আপনার থেকে ভালো জানবে কে? তবে কিনা এ মুঙ্গেরী ভইস পুরা যোয়ান হলে একটা হাতির কাজ করবে।

—মুঙ্গের? মুঙ্গেরে কি ভালো ভইস হয়। আমার জানা নাই, বাজিকর। তোমার দামটা শুনি।

মালিক ঠিকঠিক যদি বলতে দেন তো বলি, তিনশ' টাকা এর দাম হয়।

—বেচার দাম বল বাজিকর। দয়ারাম ভকতকে এ তল্লাটে সবাই চেনে। জানোয়ার কিনব বলেই তোমার কাছে আসা। আর দশটা বাজে লোকের মতো তোমার ছাউনির আওরৎ দেখতে ছল ক'রে আসি নি।

সুযোগ পেয়ে পীতেম একটু গম্ভীর হয়। বলে মালিক, বাজিকরের আওরৎ হাটেবাজারে ঘুরে বেড়ায়, খেলা দেখায় হাজার দ্রব্যের বেসাতি করে। তাকে দেখার জন্য ছাউনিতে আসতে হয় না। কিষণজীর নাম নিয়ে বলেন, যে দাম বললেন তা দিয়ে আজকাল একটা ধাড়ি শুয়োরও কেনা যাবে কিনা?

—আরে রাম, রাম! সকালবেলাটা ওই জানোয়ারের নাম নিয়ে দিনটা মাটি করলে আমার? ও জিনিস কখনো কিনি নি, তাই তার দামও জানি না। তবে এ কথা জানি বাজিকর, ও দাম দিয়ে একটা মানুষ কেনা যায়।

—হাঁ, জংলী আদমি একটা কিনতে পারেন বটে, কিন্তু মুঙ্গেরী ভইস হবে না।

—তবেই দেখো, একটা আদমির থেকে একটা ভৈসের দাম তুমি বেশি বলছ, এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

সুযোগ বুঝে সালমা আসল জায়গায় ঘা মারে দয়ারামের। বলে, আদমির থেকে জানোয়ারের দাম সব সময়ই বেশি থাকে, জনমভর এমনই তো দেখে আসছি, ভকতজী। যেমন ধর, রাতের বেলা কোনো আওরতের কাছে তোমার দাম কি হবে ?

দয়ারাম কথাটা গায়ে না মেখে রঙ্গচ্ছলে নেয়। বলে, সাবাস বলেছ, ভানুমতি। অস্বীকার করি না, আক্ষেপ কিছু আছে বটে দয়ারামের। জড়িবুটি, গুণ-তুকে তোমার নামও শুনেছি। দরকার আমার তোমার সঙ্গেও। আরো বলি, ভানুমতি, তুলনাটা তোমার লাগ্‌সই হল না।

তারপর মোষের দাম নিয়ে একটা ক্লান্তিকর টানাটানি ক'রে শেষপর্যন্ত উভয়ে পৌনে দু'শ টাকায় রাজি হয়।

ততক্ষণে সালমা উঠে চলে গেছে। দয়ারাম তার ছাউনি খুঁজে বার ক'রে নেয়। সালমা তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। অথচ সে ভাব মুখে প্রকাশ করে না।

দয়ারাম বলে, ভানুমতি, তোমার গুণের কথা শুনেছি দু-চারজনের কাছে, তার মধ্যে জানকীরাম দারোগাও আছে। দারোগা আমার বন্ধুলোক।

—তবে তো তামাকে খাতির করতেই হয়, মালিক। সালমা বলে, সালমা এভাবেই কথা বলে। সব কথাতেই উদ্দিষ্ট একটা সরস তাচ্ছিল্য টের পাওয়া যায়। বস্তুত, সালমা মানুষের অন্তরঙ্গ জীবন বড় বেশি দেখেছে, বিশেষ ক'রে গৃহস্থ মানুষের। গৃহস্থ মানুষের যেসব বিচিত্র গোপনতা আছে, বাজিকরের মিল নেই তার সঙ্গে কিছুই। অথচ, সালমার কালো চোখের তারায় সামনে-বসা মানুষটির অনেক কিছুই ধরা পড়ে। সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে তার রহস্যময় মনের অন্ধকারে যেসব আকাঙ্ক্ষাগুলো নড়াচড়া করে।

দয়ারাম বলে, সময় যখন আছে, হাতটা তোমাকে দেখিয়ে যাই, ভানুমতি।

সালমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাতটা টেনে নেয়। নরম চর্বিযুক্ত হাত। তিনটে পাথর বসানো আংটি আঙুলে। কব্জির হাড় নরম। বাহুতে বিশেষ কোনো শিরা দেখা যায় না।

সালমা আবার তার মুখের দিকে, চোখের দিকে এবং দেহের অন্যত্র দ্রুত দৃষ্টিপাত ক'রে দেখে নেয়। গলায় তুলসির মালা। দয়ারামের দেহে অধিক মেদ নেই। মুখে আবছা লেগে থাকা কর্কশ বিরক্তি, লোভ, দাপট এবং দম্ভ।

সালমা তার হাত ছেড়ে দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইল। তীক্ষ্ণ অথচ অনির্দিষ্ট দৃষ্টি তার। তারপর দয়ারামের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়, কি জানতে চাও মালিক ?

—সবই তো জানতে চাই, ভানুমতি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—

— আগে টাকা দেও।

দয়ারাম হেসে কোমরের গেঁজে থেকে দু'টি টাকা বের ক'রে সালমার হাতে দেয়।

সালমা বলে, দু'টাকায় হবে না, আরো দু'টাকা বের করো।

দয়ারাম তাই করে।

সালমা বলে, শোনো মালিক, দিন তোমার ভালো যাচ্ছে এখন, পয়সাও আসছে প্রচুর। কিন্তু মন ঠিক নেই, কারণ, শরীর আর কথা শুনছে না। একটি আদরের জিনিস অথবা জনকে হারিয়েছ সদ্য, শোক ভুলতে পারছ না। আবার কিছু করারও নেই, মেনে নিতে হচ্ছে। কি তাই নয়?

দয়ারাম সালমার হাত চেপে ধরে।

— ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ তুমি, ভানমতি।

সালমা হাত ছাড়িয়ে নেয়।

অন্যদিকে তাকিয়ে আবার বলে, দু'বছরের মধ্যে তোমার আরো দুর্দিন আসছে। তোমার এই ধনসম্পত্তি আর কোনো কাজে নাও লাগতে পারে।

দয়ারামের নাকের পাশে ঘাম জমে।

আঁতকে উঠে সে বলে, কেন? কেন, ভানমতি?

— তা আমি বলতে পারব না। তবে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার সুদিন স্থায়ী হবার নয়।

— দুর্দিন কি ক'রে কাটবে?

সালমা চোখ বুজে বসে থাকে।

তার পর বলে, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

দয়ারাম অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে খাটিয়ায়। প্রকাশ্যেই ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে সে। আঁতিপাঁতি ক'রে নিজের অভ্যন্তরে এবং পারিপার্শ্বিকে খুঁজে কোনোরকম অদৃশ্য শত্রুকে আবিষ্কার করতে পারে না সে। কোম্পানির আমলে বাঘ-বকরি একত্রে জল খায়, আর সে-কোম্পানির থানা পুলিস, সাহেব হাকিম, সবই তার হাতে। সাহেবী আইনের বাইরে সে কিছু করেও না। তবে?

ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে তার। সে ভাবে বাজিকর রমণীর এ এক রকমের বুজরুকি। সে বলে, ভানমতি, সে যা হবার তা হবে। এখন কিছু দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা কর। জানকীরাম দারোগা তোমার দাওয়াইয়ের কথা আমাকে বলেছে।

সালমা উঠে যেতে যেতে বলে, দাওয়াই বানাতে হবে। দু'দিন বাদে লোক পাঠিয়ে দিও দু'টাকা দিয়ে।

সালমা উঠে চলে যায়। দয়ারামও ওঠে। তার চাকর মোষের দড়ি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। একজন সাঁওতাল। অদ্ভুত শান্ত আর নিরীহ দেখতে

মানুষটাকে। এতক্ষণে কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। লোকটা যোয়ান এবং বিষণ্ণ।

দয়ারাম গাছে বাঁধা ঘোড়ার কাছে গেলে সেই সাঁওতাল মোষের দড়ি ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে। দয়ারাম তার ঘাড়ের উপর পা দিয়ে ঘোড়ায় উঠে আড় হয়ে বসে। সে দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসতে পারে না।

দয়ারাম চলে গেলে সালমা পীতেমের কাছে আসে। পীতেম সালমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোট। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু গোপনীয়তা আছে। ধন্দ, পেমা এবং পরতাপের মা যতদিন বেঁচেছিল, ততদিনই ব্যাপারটা সত্যিকার গোপনীয়তার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু সেই রুগ্ন স্ত্রীলোকটি পীতেমকে সময় থাকতেই রেহাই দিয়ে গিয়েছে। যক্ষ্মা রোগে অনেক অল্প বয়সেই সে মরেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সালমা-পীতেমের সম্পর্ক স্বাভাবিকতার পর্যায়ে আসে নি। এর মধ্যেও কিছু অন্য কারণ বিদ্যমান।

কোন এক দূর অতীতে বাজিকর এবং বানজারা এই দুই যাযাবর গোষ্ঠী একই জায়গায় ছাউনি ফেলে। সেই সময়ে পীতেমের বাপ দনুর যোয়ান বয়স ছিল। দনু বানজারা যুবতীদের পাগল করেছিল। তারপর দুই দল যখন দু'দিকের রাস্তা ধরে, তখন দেখা গিয়েছিল বানজারাদের দলে এক যুবতী কম এবং বাজিকরের দলে এক যুবতী বেশি।

সেই যুবতী সালমার মা। দনুর নিজস্ব স্ত্রী-সন্তানাদি থাকতেও অতিরিক্ত হিসাবে সেও ছিল। সালমা তার প্রথম সন্তান। এ সন্তানের পিতৃত্বে দাবিদার কে, এ সম্পর্কে সালমার মায়েরই সংশয় ছিল। পরবর্তী কালে সেই যুবতী আরো দু'বার গর্ভবতী হয় দনুর সহায়তায়। প্রথমবারে সে মৃত সন্তান প্রসব করে আর দ্বিতীয়বারে সন্তানসহ সে নিজেই মরে যায়।

কাজেই দনুর সংসারে সালমা মানুষ হয়। কালক্রমে যৌবনবতী হয় এবং কোনো এক সময়ে তার থেকে পাঁচ বছরের ছোট পীতেমের উপরে দুর্বার আকর্ষণ বোধ করতে থাকে।

এর আগেই অবশ্য পীতেমের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সালমার তখনো বিয়ে হয় নি। কারণ সালমা তখনো মনস্থির করতে পারে নি। বাজিকরের দলে এবং দলের বাইরেও তার পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ভারী। ফলে সালমা হয়েছিল দাম্ভিক। এই ধরনের সুন্দরীদের স্তুতি করার জন্য অনেক মানুষ থাকে বলে তাদের অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়।

যেমন সালমার। তার সারাজীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়াই হল না।

শেষে ক্রমশ তার প্রেমিকরা হতাশ হতে হতে সংখ্যায় কমতে লাগল। সালমার দম্ভ তাকে সময় থাকতে এ-ব্যাপারে সতর্ক করে নি। তারপরে একসময় সে নিজেকে

দেখেছিল নিঃসঙ্গ।

সেই সময়ই পীতেমের বিয়ে হয়, পীতেম তার প্রেমিকাকে নিয়ে সালমার চোখের সামনে সারাক্ষণ মশগুল থাকে। সেই পীতেম, যার সঙ্গে সালমা একসঙ্গে বড় হয়েছে এবং চিরকাল জ্যেষ্ঠা হিসাবে আধিপত্য বিস্তার ক'রে এসেছে, সেই পীতেম। এখন দু'জনে সম্পূর্ণ আলাদা জগতের হয়ে গেছে সালমার একাকিত্বকে আরো ভারী ক'রে।

প্রথমত সালমার একটা অস্বস্তি ছিল, পরে, সেই অস্বস্তি ঈর্ষায় পরিণত হয় এবং কখন নিজের অজান্তেই পীতেমের স্ত্রীকে সে প্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে ফেলে। শুরু হয় এক বিচিত্র অধ্যায় যা বাজিকরদের মধ্যেই সম্ভব।

পীতেমের স্ত্রী ছিল নরম চেহারার মানুষ, হয়ত যাযাবরী জীবনের উপযুক্ত নয়। ধন্দু জন্মাবার পরই তার শরীর ভাঙতে শুরু করে, পেমার জন্মের পর সে দীর্ঘদিন রোগভোগ করে, তারপর পরতাপ যখন তার পেটে তখনই ধরা পড়ে তার ক্ষয়রোগ।

এর উপরে ছিল সালমার কর্তৃত্বের যন্ত্রণা, যা সালমাকে তৃপ্তি দিত, পীতেমকে আহত করত এবং ধন্দুর মাকে জীবন সম্বন্ধে হতাশ করত। ক্রমশ রুগ্ন স্ত্রী যাযাবরের জীবনে অসহ্য হয়ে ওঠাতে পীতেম সালমার কাছে ধরা দেয়। যেহেতু তারা একসঙ্গে বড় হয়েছে তাই পরস্পরকে ভালো বুঝত। পীতেম সালমার কর্তৃত্বে শৈশব থেকেই অভ্যস্ত, তাই এখন দলের সর্দার হয়েও সালমার কোনো কাজ কিংবা সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করে না। আর এখন দীর্ঘকালের অভ্যাসবশত প্রায় সব বিষয়েই সালমার পরামর্শও নেয় পীতেম।

ধন্দুর মায়ের মৃত্যুর পর তাদের সম্পর্ক যখন বিশেষ কারো কাছেই অপ্রকাশ্য থাকে না, তখন দলে কথা ওঠে। দল মূলত এ বিষয়ের নীতির দিকটাই বিচার করছিল। দনু আবার পীতেমকে বিয়ে করার কথা বলেছিল, পীতেম রাজি হয় নি। রাজি হয় নি এ জন্য নয় যে, সালমা তার কাছে অপরিহার্য ছিল - রাজি হয় নি, কারণ সালমার নিঃসঙ্গতা তাকে ব্যথিত করত।

আবার সালমা এবং পীতেম উভয়ের মধ্যে যখন বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠে তখন দু'জনেই এ ব্যাপারে শিউরে উঠেছিল, কেননা দু'জনের ধমনীতে একই রক্ত বইছে কিনা এ সম্পর্কে তারা নিঃসংশয় ছিল না।

কেননা, হাজার বছর আগে যখন তারা কোনো এক বিশাল নদীর ধারে স্থায়ী বসবাস করত, সেই সময়কার পৌরাণিক স্মৃতি তাদের ভারাক্রান্ত করত। যখন তাদের কোনো প্রাচীন পুরুষ পুরা এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর শুরু হয় সেই অন্তর্কলহ, যা তাদের স্থায়ী বসবাসকে ছিন্নভিন্ন করে। মানুষ তখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরার বিরুদ্ধবাদীরা দাবি তুলেছিল, এ বিয়ে হতে পারে না, কেননা পালি নামের সেই নর্তকী নাকি তার বোন। সুতরাং এ বিয়ে হবে অসামাজিক এবং অমঙ্গলময়।

পুরার সমর্থকরা বলেছিল, এ বিয়ে হবেই, কেননা পালি যে পুরার বোন এর কোনো প্রমাণ নেই।

তারপর পুরা ও পালির বিয়ে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে তাদের উপর। অন্তর্কলহে সমস্ত মানুষ নষ্ট হয়। পুরা ও পালি দেশদেশান্তরে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তাদের বিরুদ্ধবাদী ঘাতকরা তাদের খুঁজে বেড়াতে থাকে। তারা কোথাও আশ্রয় পায় না এবং দেবতা তাদের অভিশাপ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ক'রে দেয়। তোমরা এক বৃক্ষের ফল দু'বার খেতে পারবে না এক জলাশয়ের জল দু'বার পান করতে পারবে না, এক আচ্ছাদনের নিচে একাধিক রাত্রি বাস করতে পারবে না এবং সব থেকে ভয়ানক—এক মৃত্তিকায় দু'বার নৃত্য করা দূরে থাকুক, দু'বার পদপাত পর্যন্ত করতে পারবে না। এই ছিল দেবতার অভিশাপ।

সেই থেকে বাজিকর পথেপ্রান্তরে ঘুরছে। সেই থেকে সে দেবতা থেকে বঞ্চিত। গৃহস্থের গৃহের নিকট পর্যন্ত সে যায়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

সুতরাং বাজিকর এক ভিন্ন জীবন, এক অস্থির চলমান জীবনকে আশ্রয় ক'রে আছে। সে নিজেকে ভুলিয়েছে নাচ গান এবং চিন্তাহীন সরল জীবনযাত্রায়। সে শিখেছে মানুষকে ঠকাতে এবং তা নিয়েই তার অহংকার। সে গ্রহণ করেছে বিচিত্র ভিক্ষাবৃত্তি, যার জন্য কোনো সংকোচ তার নেই।

তবুও প্রাচীন কিছু স্মৃতি কিংবা পাপবোধ কিংবা নিতান্তই বিশ্বাস তাকে এখনো চালিত করে, এখনো নিযুক্ত রাখে কিছু আস্তিক চিন্তায়। কিছু ভীতি অথবা দারুণ দুর্দিনের আশংকা তাদের সমস্ত বিধিহীন জীবনযাত্রাকেও বেঁধে রাখে নিয়মের নিগড়ে।

কিন্তু এই নিয়মের নিগড় থেকে বেগবান অন্য কিছু তাদের একজনকে অন্যের সঙ্গে যুক্ত রাখত। পীতেম কিংবা সালমা কেউ জানবে না তাদের পরবর্তী তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষেই বিষয়টি নিয়মে পরিণত হবে বাধ্য হয়ে, যে বাধ্যতায় পুরা ও পালি-আনীত অভিশাপ মূল্যহীন হয়ে যাবে।

সালমা বলে, মানুষটা লোভী ও বজ্জাত। পীতেম বলে, তাতে তোর কি? তাতে বাজিকরের কি আসে যায়? পয়সা তো রোজগার হচ্ছে!

—তুই আজকাল খুব পয়সা চিনেছিস। ভকত আর বেনিয়াদের মতো খালি পয়সার চিন্তা তোর।

—পয়সা ছাড়া দল বাঁচবে না, তুই আমিও বাঁচব না।

—ভয় হয়, এর পরে তুই কবে আবার ঘর-গেরস্থালির কথা ভাবতে শুরু করবি দলের জন্যে।

—ঘর-গেরস্থালি? বাজিকরের?

— নয় কেন ? পয়সা চিনছিস না ?

— কি জানি ? বাজিকর কেন পথে ঘোরে ? বাজিকর কেন ঘর বাঁধে না ? এসব আমার মাথায় আজকাল আসে মাঝে মাঝে।

— আসে, না ?

— আসে।

—ঘর বাঁধবি। তারপর রাতের পর রাত, সারাজীবন সেই এক ছাউনির নিচে থাকবি ?

— থাকলাম।

— এক পুকুরের জল খাবি সারাজীবন ?

—খেলাম।

— চেনা পথ হাঁটবি সারাজীবন ?

— হাঁটলাম।

— কোন মানুষটা হবি তুই ? দয়ারাম ভকত, না তার ঐ বাঁধা চাকরটা যার ঘাড়ের উপর পা রেখে ভকত ঘোড়ায় উঠল ?

— সালমা।

— হাঁ, হাঁ বল ?

— এত ভাবি নাই।

— দলের সর্দার তুই, পীতেম, তোর ভাবা দরকার। বাদিয়া, বাজিকর, বানজারার জীবনে তো সবার জন্য একই রকম রাস্তা। কিন্তু এই গেরস্থের রাস্তা সবার আলাদা।

— হাঁ, সেটাই ভয়। গেরস্থ হওয়া মানে বাঁধা জানোয়ার। আর জানোয়ার বাঁধা থাকলে তাকে দোয়ানো সোজা। দুইয়ে তার শেষ বিন্দু রক্তও বের ক'রে নেওয়া যায়।

— তবুও তুই বাঁধা জানোয়ার হওয়ার কথা ভাবছিল ?

— ভাবছি।

— কেন ?

— বাজিকর বাদিয়ার দিন বোধহয় শেষ হয়ে আসল। পশ্চিম থেকে পুবে এই যে ক্রমান্বয়ে হেঁটে যাওয়া, সেই পুবদিকের সীমানা বোধহয় অন্য কোনো পশ্চিমে গিয়ে ঠেকে যাবে।

— কিন্তু দেখ, বাজিকরের পালাবার রাস্তা আছে, বাঁধা মানুষের তা নেই।

— বাজিকরেরও আর পালাবার রাস্তা থাকবে না, সব রাস্তা সাহেবরা রেল দিয়ে বেঁধে ফেলেছে, দেখছিস না ?

দু'জনেই খুব সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। দু'জনের ঝোঁক দুই বিপরীত মেরুতে, কিন্তু মজা এই, কারো ঝোঁকই খুব দৃঢ় নয়। পীতেম স্পষ্টত তার মানুষগুলোর অস্তিত্ব

রক্ষার প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু সালমার তেমন কিছু নেই। তার কাছে স্থায়িত্ব খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়, আবার চলমানতাও এখন আর খুব ছন্দময় মনে হয় না।

অতঃপর তারা তাদের এই বহির্জগৎ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। যদিও বাজিকরের জীবন পরিশ্রমহীন নয়, তবুও সতত উৎপাদনশীল জীবনযাত্রা তার অপরিচিত না হলেও, তার বিধি-উপকরণ সম্বন্ধে তার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। যেমন পীতেম বলেছিল বাঁধা জানোয়ারকে দোযানো সহজ, এই বিষযটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত দশ বছরের মধ্যে দোহকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে হাটে বাজিকরের সামান্য পণ্য বিক্রিব সময়ও ভাগীদার এসে উপস্থিত হয। দালাল যেন মাটি ফুঁডে বের হয়। এমন কি নিতান্ত খেলা দেখিয়ে যে ভিক্ষাবৃত্তি, যা বাজিকরের একান্ত নিজস্ব, সেখানেও ভাগ দিতে হয়। ভাগ দিতে হয় দারোগা পুলিশকে, ভাগ দিতে হয় স্থানীয় বদমাশদের।

যেমন বাজিকর ভাবে, কেবলমাত্র যাযাবরই জীবনকে সঠিক জানে ব। জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করে। এ ভাবনা ঠিক কিনা, এখন এরকম সমস্যা কারো কারো মগজে আসতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগে সালমাকে এক সন্ন্যাসী বলেছিল, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, কেননা পাপ অধিক হলে এই দৃশ্যমান পৃথিবী ধ্বংস হবে। তখন পুণ্যাত্মারাই রেহাই পাবে, পাপীরা নয়।

সালমার ধারণা হয়েছিল, এ লোকটা তার রূপে মজেছে, তাই এসব তাকে দলে ভেড়াবার ফন্দি। সে হেসেছিল এবং অবজ্ঞা দেখিয়ে চলে এসেছিল। অথচ পরে অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারে নি, কি আকষণে ঐ লোকটার কাছে সে গিয়েছিল। সে নিজে মানুযের হাত দেখে এবং ভূত-ভবিষ্যৎ বলে, ছক পেতে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে—নিদান দেয় শুভ এবং অশুভের—কিন্তু এ সবের সঙ্গে বাজিকরের কোনো সম্পর্ক নেই। অন্তত এতকাল তো ছিল না।

এই চমৎকার নিসর্গ, পিছনের গঙ্গা, যেখান থেকে বছরের এই সময় যখন খুশি দমকা হাওয়া উঠে এসে আছড়ে পড়তে পারে, নিয়ত-সঞ্চরণশীল নৌকোগুলোকে সন্ত্রস্ত করতে পারে। অথবা দূরের ঐ পাহাড, এখন কি চমৎকার ঝকমকে, সবুজ মুহূর্তে তার রঙ বদল করতে পারে সম্পূর্ণ বিপরীতে। তবুও এই মুহূর্তে প্রাণবন্ত ও রঙীন এইসব প্রাকৃতিক দৃশ্য। আর যদি উঠে দাঁড়ানো যায়, তাহলেই ডান পাশের আমবাগানটার ভেতরেই চোখে পড়বে কুৎসিত বিবর্ণ সব মালখানা, আড়ৎ ও অস্থায়ী চালার সারি। যেখানে হরদম মাল এবং মানুষ এসে জড়ো হচ্ছে, কুৎসিত আওয়াজ, ঝগড়া, হাসি ও কখনো কখনো দাঙ্গা—এইসব প্রবহমানতায় মিশছে। অথবা, আরো একটু এগিয়ে, যেখানে ভারী মহাজনী ও গয়নার নৌকোয় মাল উঠছে। বিচিত্র সব পণ্য, ক্ষেত থেকে আসা, মানুষের উদ্ভাবনীতে ও নৈপুণ্যে বাস্তবায়িত শ্রম—ধান, তৈলবীজ, পাট অথবা, বস্ত্র, শিল্পসামগ্রী,

অথবা বস্তায় বা আধারে আবদ্ধ পণ্য, এমনকি বধের জন্য নীত পশুর দঙ্গল এবং ক্রীতদাস ও বেশ্যা হওয়ার জন্য ক্রীত ও সংগৃহীত মানুষ, এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত মানুষ, যে ঘাম ফেলছে, যে হিসাব রাখছে, যে মস্তিষ্কে লাভের অংক কষছে। এই যাবতীয় চাঞ্চল্য নিয়ে এক পৃথক জীবনযাত্রা। কোথায় অধিক উত্তাপ, জীবন, মুক্তি ?

যেমন ধন্দুর মা বলেছিল, তোমাকে এর শাস্তি পেতে হবে। অথচ পীতেম অন্যদের সহায়তায় বাজিকর রীতিতে গর্ত খ্ঁড়ে শুধুমাত্র মানুষটাকে সমাহিত করেছিল, মাটি দিয়ে গর্ত বোঝাই করেছিল। তারপর দল নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়েছিল। সবকিছুই যেমনকার তেমন ছিল, তেমনই চলছিল।

দয়ারামের সেই ভৃত্য যে নিজের ঘাড় পেতে দেয় প্রভুকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করার জন্য এবং সালমার নতুন পরিচিত সেই ক্রীতদাসী রমণী যাকে প্রতিরাত্রে আবিষ্কার করতে হয় তার প্রভুকে উত্তেজিত করবার পদ্ধতি অথবা রাজমহল বাজারের গোলাদার, মহাজনের ঘরে ঘরে ঋণজালে আবদ্ধ কৃষ্ণকায় সাঁওতাল, অথবা সাহেবগঞ্জের রেলের রাস্তা পাতার কাজে নিযুক্ত শ'য়ে শ'য়ে কুলি—যারা কঠিন প্রহরায় পালাতে পর্যন্ত সাহস করে না ও অজ্ঞাত এক জ্বরের প্রকোপে মরে।

আবার দেখ, আদিম রক্ষণশীলতায় সমস্ত সামাজিক বন্ধনহীন বাজিকরও নিয়মবদ্ধ থাকে—যেমন সালমা আর পীতেমের পরিণতি।

এই যাবতীয় বিভ্রান্তির বিষয় পীতেমকে পীড়িত করে। তার নানা একবার তার বাপের সঙ্গে এদেশে এসেছিল। সে সম্ভবত তার শৈশব কিংবা কৈশোরের কথা, এখন থেকে ষাট-সত্তর বছর আগের ঘটনাই হবে। সেবার বাজিকরের দল এখান থেকে পালিয়েছিল। কেননা তারা দেখেছিল মানুষ তখন যেভাবে মরে তাতে পতঙ্গের মৃত্যুর মর্যাদাও সে পায় নি। অথচ, সেই মানুষই ফসল ফলিয়েছিল, যে যার নির্দিষ্ট নিয়মমতো শ্রম দিয়েছিল। আর সেই সব মানুষ, যারা এইসব শ্রমদায়ী মানুষের সর্বস্ব লুঠ করেছিল, তাদের মতো হৃদয়হীন যন্ত্র বাজিকর সমস্ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়বার দেখে নি। দেখতে চায়ও না। কে তখন বাজিকরের ভানুমতি দেখবে? তখন বাজিকর দেখেছে খাজনা না দিতে পারার জন্য গাছে ঝোলানো মানুষ, চুনের ঘরের মধ্যে বদ্ধ মানুষ, বিষ্ঠা ভক্ষণে বাধ্য মানুষ, বস্তাবন্দী জলমগ্ন মানুষ, আরো অসংখ্য অশ্লীল কদাচার যার নাম শাস্তি, যার নাম প্রজাকে শায়েস্তা করা! পৃথিবীর যাবতীয় ইন্দ্রজাল কিংবা ভানুমতির খেল্ থেকে অনেক বেশি উত্তেজক ও বিস্ময় উদ্রেককারী এইসব ঘটনা। তখন পীতেমের নানার নানা বলেছিল, এ দেশের মানুষগুলোকে অবশ্যই দানোয় পেয়েছে, না হলে এমন হয় না। সুতরাং পালাও এখান থেকে।

আবার বাপ না বলল তাকে পুবের দেশে যাও, পীতেম ?

—পুবের দেশে কি আছে, বাপ ?

—পুবের দেশে জল আছে, ফল আছে, মানুষ আছে, জানোয়ার আছে।

—তবে যে নানা বলেছিল, সেখানে দুর্ভিক্ষে আধা মানুষ মরে যায় ?

— আধা মানুষ থাকে, তারা আবার নতুন মানুষ বানায়।

কিন্তু আমার ভানুমতী দেখে কে? কে দেখে ভালুক আর বাঁদরের নাচ? কে কেনে সালমার ভবিষ্যৎবাণী? টোটকা, মাদুলী, কুহক বিদ্যা?

দৈত্যের মতো রেলের গাড়ি ভীষণ গতিতে শ'য়ে শ'য়ে মাইল ছুটে যায়। জলের উপর দিয়ে অতবড় লোহার নৌকো মালবোঝাই হয়ে দ্রুত এগোয়। টেলিগ্রাফের তার শহর ছেড়ে গ্রাম পেরিয়ে নতুন শহরের দিকে ছোটে।

— বাপ, হে বাপ, আমার সওদা কে নেবে?

— বাপ, হে বাপ, আমার খেলা কে দেখবে?

অত সময়ও নেই মানুষের। সাহেবরা নিত্য নতুন উত্তেজনার আমদানি করছে। সদাচঞ্চল, সদাকর্মব্যস্ত মানুষ। কেউ কি দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে বাজিকরণীর নাচ দেখবে? দেখবে কি ঘাঘরার উপরে কাচ আর পুতির কারুকার্য?

— দেখ, সালমা, কেউ তোকে না বাঁধলেও তুই বাঁধা পড়বি। যেন সারা দুনিয়া জুড়ে ফাঁদ পাতা। সেই ফাঁদে অজস্র ফাঁক, তবু তুমি যেতে পারবে না, এমনই মজা। তোমাকে থাকতেও কেউ বলে না, যেতেও কেউ বলে না। মানুষ শুধু দুঃখ পায়।

সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় পীতেমের। অতি পরিচিত এবং অপরিচিত সমাজ, নিয়মশৃঙ্খলা, লোভ, পাপ, ক্ষুধা, ঘাম, রক্ত, ব্যক্তি, গোষ্ঠী কোন নিয়মে চলে! কেনই বা চলে। এসব বাজিকর বুঝতে চায় না, বোঝার দরকারও বোধ করে না। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিহাসের মতো যে বিষয় তা হল, বাজিকরের অস্তিত্ব নির্ভর করে যেসব মানুষের উপর তারা বাজিকর নয়। তারা সব যূথবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ, আপন আপন অঙ্গীকারে বদ্ধ মনুষ্যকুল। সেই মানুষের সময় আর অজস্র নয়, সেই মানুষের উপকরণ আর যথেষ্ট নয়। যে মানুষ সারাদিনের শ্রমে শুধুমাত্র অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে তার অপরিহার্য বিষয়গুলো স্পষ্ট। কিন্তু যার গুদামে মালের পাহাড়, যার সিন্দুকে টাকায় উপরের চাপে নীচের অংশের ধাতব বিকৃতি হয়, তার অভাববোধ অস্পষ্ট অথচ বাস্তব। আর এই যাবতীয় বিষয়ই এখন সমাজগ্রাহ্য নিয়মের অংশ।

এই নিয়মকেই যত ভয় পীতেমের। দেবতার অভিশাপে শিকড়হীন জীবনে অভ্যস্ত বাজিকর এখন সবদিকে বিস্তারী এক বৃক্ষের অজস্র শিকড়কে ঝুরির মতো নেমে পথ-রোধ করতে দেখে। যার বাইরে তার অস্তিত্ব বিপন্ন এবং ভিতরেও তার অস্তিত্ব অনিশ্চয়। সে জন্যই সম্ভবত সে শুনেছিল তার বাপকে বলতে, পীতেম হে, পুবের দেশে যাও।

এইভাবে শীত পার হয়ে সূর্য উত্তপ্ত হতে থাকে। গঙ্গার পাড়ের বালি হাল্কা হাওয়ায় দিগ্বিদিকে উড়তে থাকে। তারপর ক্রমশ গঙ্গার উপরে হঠাৎ হঠাৎ টুকরো মেঘের আবির্ভাব হয় এবং অচিরে তা ঝঞ্ঝার আকারে ফেটে পড়ে, তাঁবুগুলোকে ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

একসময় সবাই বোঝে গঙ্গাপাড়ে থাকা সম্ভব নয়। তখন পীতেম শহরের সংলগ্ন মাঠে তাঁবু ফেলে। তার জন্য আবার দারোগার অনুমতি নিতে হয়।

হাটে ও বাজারে এবারে শীতের মাঝ থেকেই অপর্যাপ্ত শস্য আসতে শুরু করেছে। সেইসব পণ্য বৃহদাকার জলযানে ও বেলগাড়িতে চেপে যায় মুর্শিদাবাদ, সিউড়ি ও কলকাতা নামক শহরগুলোতে। এই সময় হাটবাজার প্রাণবন্ত হয়।

এইসব প্রাণবন্ত হাটে পীতেমের দল বাঁদর ও ভালুক নাচায়; রহু চণ্ডালের হাড়ের ভেলকি দেখায়; বাঁশবাজি, দড়িবাজি দেখায়। কিন্তু সবাই টের পায় মানুষ আর আগের মতো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায় না। বাজিকর রমণীরা চলতে ফিরতে বিচিত্র হিল্লোল এবং কটাক্ষ ছুঁড়ে যেসব পুরুষকে ঘায়েল করে—যা তাদের স্বভাবের অঙ্গ, যা সৎ-অসৎ কিংবা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না—সেই সব মানুষের কেউ কেউ বলদর্পী ও বেপরোয়া। কখনো কখনো তারা হামলা করে। তাতে কিছু অশান্তি হয় এবং পীতেমকে দলের মধ্যে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করতে হয়, যা একান্তই নতুন।

তারপর ধন্দুর ছোট বোন পেমা একদিন দড়ির উপর থেকে ভিড়ের মধ্যে সওয়ার-সহ ধন্দুর সেই ঘোড়াটিকে দেখে এবং উৎসাহে দুই আঙুল মুখে দিয়ে নিতান্তই যাযাবরী শিসধ্বনি বাতাসে ছুঁড়ে দেয়। ঘোড়াটি তাকে দেখে এবং সওয়ারের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তোয়াক্কা না ক'রে একটি উল্লাস-হ্রেষা তুলে পেমার দিকে ধাবমান হয়।

আরোহী দারোগাপুত্র আনন্দরাম কৌতুক বোধ করে ও ঘোড়াকে ইচ্ছামতো চলতে দেয়। ঘোড়া এসে বাজিকরের জটলার কাছে থামে এবং চঞ্চল হর্ষ প্রকাশ করে।

পেমা দড়ি থেকে নেমে এসে বলে, এ বাবু, ঘোড়া তোমার কথা শোনে?

আনন্দ হেসে বলে, না শুনলে মার খায়।

ঘোড়াটির দেহ আরো উজ্জ্বল হয়েছে। বোঝা যায় সে আদরযত্ন ভালোই পাচ্ছে। এত সুন্দর ঘোড়া এ অঞ্চলে দেখা যায় না। পেমা এবং অন্য মেয়েরা ঘোড়াকে ঘিরে ধরে এবং আনন্দর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের লঘু কৌতুক করে। কলহাস্য ওঠে।

এতগুলো রহস্যপ্রিয় উচ্ছল যুবতীর সান্নিধ্যে আনন্দ গর্ব বোধ করে। এই সব

মেয়েদের চলতে ফিরতে সে অনেকবার দেখেছে বটে কিন্তু কখনো মনোযোগ দেয়-নি। এখন কাছ থেকে ভালো ক'রে এদের উদ্দামতা দেখে এবং নেশাগ্রস্ত হয়।

আনন্দ ফিরে যায়, কিন্তু মস্তিষ্কে পেমার যুবতী-শরীরের জন্য আক্ষেপ নিয়ে যায়। অবশ্য এই আক্ষেপ নিতান্তই আকাঙ্ক্ষার নামান্তর, কেননা তখন সময়টা ছিল দারুণ উত্তেজক ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সমর্থ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। সাধারণ মানুষ, বিশেষ ক'রে শ্রমদায়ী মানুষ তখন ছিল একেবারেই দুরভিসন্ধিহীন। এই জন্য অঘ্রান মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চতুর মানুষ, যারা দয়ারাম ভকতের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তারা ঘোড়া, বলদ ও মোষে টানা গাড়ি নিয়ে রাজমহল পাহাড়ের উৎরাইতে বসতি গ্রামগুলোতে হাজির থাকত। এর আগে শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন মাসে প্রয়োজনে ও কৌশলে তারা যে দাদন ক'রে রেখেছিল সাঁওতাল গ্রামগুলোতে, এখন তার বহুগুণ তারা প্রাপ্য হিসাবে ফেরত পায়। আর তাদের পাল্লা ও বাটখারা দাদন এবং পরি-শোধ এই দুই উপলক্ষে দু'রকম ব্যবহার করে। ফলে খাতকের দেনা শোধ একটা দর্শনীয় ব্যাপার। আবার প্রায়ই তা খাতকের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তখন খাতক নিজেকে বাঁধা রেখে, অথবা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বাঁধা রেখে সেই দেনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রয়াস পায়। বস্তুত, ক্ষমতাশালী মানুষের কাছে সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তি যে কোনো উপায়েই হোক প্রাপ্য।

কাজেই আনন্দ নেশাগ্রস্ত হয় এবং পেমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করার চেষ্টা করতে থাকে। সে যেমন বাজিকরের ছাউনিতে গেল ও বাছাই ঘোড়াটি নিয়ে এল, এই দ্বিতীয় ব্যাপারটি যে তেমনই হবে, এতে তার সামান্য সংশয় ছিল। একটা মাদী ঘোড়া আর এক বাজিকর যুবতী তার কাছে এই মুহূর্তে এক নয়।

তবে আনন্দ নিজের দৈহিক সৌন্দর্য ও ক্ষমতার উপরে যথেষ্ট আস্থাবান। আর এই ধরনের যুবকেরা প্রথমেই বলপ্রয়োগটা লজ্জাজনক মনে করে।

দু-একদিনের মধ্যে আনন্দর ঘোড়া বাজারে সওদা নিতে আসা পেমার রাস্তা আটকায়। পেমা আনন্দর আশানুরূপ ঝিলিক দিয়ে হাসে। আনন্দ এই যাযাবরীর চোখে আহ্বান দেখে এবং ভাবে এ কি যাযাবরী চোখের স্বাভাবিক দ্যুতি, না বিশেষ কম্পন?

পেমা অবশ্যই শহরের সেরা যুবকটির মনোহরণ করার কৃতিত্ব জাহির করে সঙ্গিনী-দের কাছে। বিষয়টা যাযাবরীদের চিরকালের দম্ভ। কিন্তু রাজমহল পাহাড়ের উপত্যকায় তখন শুকনো পাতা বড় বেশি ঝরছিল, হাওয়া ছিল উদ্দাম। আর পীতেমেরও দল নিয়ে অন্যত্র সরে যাওয়ার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা এত তাড়াতাড়ি ছিল না। কাজেই বাজিকর ছাউনিতে পেমা সমস্যা সৃষ্টি করে যখন সালমার কাছে সে আসে তার ভাগ্য গণনা করতে।

৬

পরতাপ এবং জিল্লু অঘ্রান মাসে মুর্শিদাবাদের পথ ধরেছিল। আশা ছিল পনেরো-বিশ দিনের মধ্যে তারা ফিরে আসবে। কিন্তু এক মাসের মধ্যেও যখন তারা ফিরে এল না, পীতেম তখন চিন্তায় পড়ে। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট এখনো বাজিকরদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। তাছাড়া রাস্তা বিপদসংকুল। দল বেঁধে ছাড়া মানুষ একাকী কিংবা দু-একজনে রাস্তা চলাচল করে না। পীতেমের চিন্তা অমূলক নয়। সে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগত ও চলাচলকারী ব্যবসায়ী মহাজনের কাছে খোঁজখবর করতে শুরু করে। কিন্তু কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। কোনো পথিকের হদিশ না পাওয়া গেলে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে দস্যু-তস্করের হাতে সে খুন হয়েছে।

তিন-চার মাস যাওয়ার পর পীতেম ধরে নেয় জিল্লু কিংবা পরতাপকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে বিষণ্ণ হয় এবং এই দুই যুবকের স্ত্রীদের কাছে অপরাধী হয়ে থাকে। পরতাপ যেহেতু তার কনিষ্ঠ সন্তান, সে প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং সালমার কাছে সান্ত্বনা খোঁজে।

এইভাবে ছ'মাস পার হয়ে যাবার পরে সবাই যখন একরকম স্থির ধরেই নিয়েছে যে জিল্লু কিংবা পরতাপের ফেরত আসার কোনো আশাই নেই এবং যখন এই দুই যুবকের স্ত্রীরা দৈনন্দিনতার সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে নতুন ক'রে জীবন খুঁজতে শুরু করেছে, তখন তারা ফেরে।

দলের সব মানুষ ভিড় ক'রে তাদের এই অজ্ঞাতবাসের বিবরণ শোনে। বস্তুত, তাদের পোশাক-আসাকে এবং হাবভাবেও কিছু নতুনত্ব ছিল। তারা শহরে ঢুকেও ছিল আকস্মিক উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে।

ত্রিশ-চল্লিশজন সাঁওতাল যুবকের সঙ্গে তারা মিছিল ক'রে শহরে ঢুকেছিল। মিছিলের আগে ছিল আটজন বাহকের কাঁধে বাঁশে ঝোলানো একটি মৃত বাঘ। তার পিছনে দড়ির খাটিয়ায় ভীষণ আহত এক যুবক। সেই যুবক খাটিয়াতে উপবিষ্ট ছিল এবং চারজন বাহক তাকে বহন করছিল। যুবকের মাথায় পাগড়িতে রক্তের ছোপ, তার ডান দিকের গাল বিক্ষত এবং ভীষণভাবে ফোলা, তবুও তার দৃষ্টি বীরত্ব-ব্যঞ্জক। তার মাথায় চুলের ভিতর দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটি তীর গোঁজা ছিল। তাতে তার অবয়বে একটা সমীহ আদায় করার ভঙ্গি ছিল। স্বভাবতই বোঝা যায় এই যুবকই বাঘটির শিকারী। খাটিয়ার দুই পাশে ছিল জিল্লু ও পরতাপ। পরতাপের হাতে ছিল রক্তমাখা একখানা পরশু এবং তার দৃষ্টিও যথেষ্ট দাম্ভিক ছিল। পরিষ্কার বোঝা যায় এই বৃহৎ শিকারে সেও অংশীদার।

বাজারের চত্বরে পৌঁছে দলের বেশ কিছু যুবক তুমদা ও ধামসা বাজিয়ে একটি

শিকার-নৃত্য শুরু করে। বাজিকরদের চমকিত ক'রে জিল্লুও সেই নৃত্যে সমান তালে পা মেলায়। অন্যরা ব্যবসাদার, মহাজন ও সাহেবদের কুঠিতে কুঠিতে বীরত্বের স্বীকৃতি বাবদ পুরস্কার আদায় করতে থাকে।

সমস্ত চত্বরে উৎসবের আলোড়ন ওঠে। রেশমের কারবারী উড সাহেবের কুঠির সামনে আহতদের নিয়ে আসা হয়। উড কিছু চিকিৎসা জানত এবং এ অঞ্চলে সাহেবদের নিজস্ব কোনো চিকিৎসক না থাকাতে উডের এ কাজটা অতিরিক্ত ছিল।

শিকারী যুবকের নাম ডুমকা সোরেন। ডুমকার ক্ষত খবই গুরুতর ছিল। উড চিকিৎসা শেষ না হলে তাকে স্থানত্যাগ করতে 'না' করে। বাজিকরের ছাউনিতে সসম্মানে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। তার সঙ্গে থাকে তার বাপ লক্ষ্মণ।

পীতেম এই অপরিচিতদের সান্নিধ্যে আনন্দ বোধ করে। প্রথমত, হারানো দুই যুবকের এমন আকস্মিক ফিরে আসা তাকে এবং দলকে যেমন উদ্বেল করেছিল, তেমনি এই নতুন সম্পর্ক তার ভেতরে এক নতুন ভাবের উদ্রেক করে।

জিল্লু ও পরতাপ এই অপরিচিতদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রৌঢ় লক্ষ্মণ সোরেন বলিষ্ঠ ব্যক্তি এবং খুব সম্ভ্রমপূর্ণ তার আকৃতি ও ব্যবহার। পীতেম তার ভিতরে এমন এক আত্মমর্যাদা দেখে যা দীর্ঘকাল বিরাট সামাজিক কর্তৃত্বে থাকলেই আয়ত্ত করা সম্ভব।

বিষয়টি ভিখ্-মাঙ্গা বাজিকরের কাছে বিস্ময়ের বটে। কেননা, এই মানুষেরা যে দৈন্য ও অভাব নিয়ে থাকে তাতে আর্থিক দিক দিয়ে বাজিকর গোষ্ঠীর থেকে তাদের স্বতন্ত্র করা যায় না। কিন্তু এই সম্ভ্রম ও মর্যাদা বাজিকরের চিন্তারই বাইরে। মানুষটিকে পীতেম যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় এবং অতিথিদের বিরাট দলকে সে এক-সন্ধ্যার আতিথেয়তার জন্য আমন্ত্রণ করে। এই উৎসবে বাজিকরেরা পাঁচ-ছটি বাছাই শুয়োর মারে। সন্ধ্যার পরে তাঁবুর সামনে আগুন জালিয়ে পীতেম লক্ষ্মণ সোরেনের সঙ্গে একত্রে বসে মদ্যপান করে এবং সবিস্ময়ে লক্ষ করে দলের অন্যান্যরা তার সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্ত সম্ভ্রম দেখাচ্ছে। তার ভেতরে অংকুরিত হতে থাকে এক অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষার বীজ।

ভোজন এবং পান যথেষ্ট হওয়াতে দুই প্রৌঢ় অত্যন্ত আন্তরিক ও উষ্ণ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে দু'খানা খাটিয়া তাঁবুর বাইরে নিমগাছের নিচে দু'জনে প্রভূত আয়াসে টেনে নিয়ে আসে এবং এই কাজে তারা দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। যেমন, খাটিয়া দু' হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করতে লক্ষ্মণ পীতেমকে হাত দিয়ে আটকায়। বলে, তুমি রাখ সর্দার। নেশাটা তোমার বড় জবরই হয়েছে। আমি নিয়ে যাই।

পীতেমের মর্যাদায় লাগে। সে নেশাগ্রস্ত মস্তিষ্কে যতটা সম্ভব দৃঢ়তা এনে বলে, তুমি একদম কথা বলবে না, পারগানা। এটা আমার কাজ, আর তুমি আমার অতিথি। ব্যস্।

এবং দু'টি খাটিয়া একসঙ্গে নেওয়ার প্রয়াসে পীতেম বেটাল হয়। লক্ষ্মণ এগিয়ে এসে তাকে সোজা রাখে এবং বলে, বলেছি না, নেশাটা তোমার জবর হয়েছে। চুপচাপ এগুলো আমার কাছে ছেড়ে দেও।

—যেন তোমারই কিছু কম নেশা হয়েছে।

—দেখই না।

—ঠিক আছে।

তারপর লক্ষ্মণ খাটিয়া দু'টি ওঠাতে যায় এবং পীতেমের মতোই টাল খেয়ে পড়ে।

পীতেম বলে, বহোৎ খুব। যেন সাঁওতাল সর্দারকে চিনতে আমার কিছু বাকি আছে।

—নাঃ, নেশাতে নিশ্চয়ই কিছু তুক্ করেছ তোমরা।

—না হে পারগানা, এর নাম বয়স, বুঝলে। তুমি পারতে ওই বাঘটাকে মারতে?

—আমার বেটা মেরেছে!

—তুমি তো খুব নির্লজ্জ, পারগানা! আমার বেটার নাম করছ না!

—আলবাৎ! তোমার বেটা না থাকলে আমার বেটার জান বাঁচত? খুব বাহাদুর বেটা তোমার।

—তবে?

—তবে কি?

—তবে এই খাটিয়ার এদিকটা আমি ধরি, আর ওদিকটা তুমি ধর। তারপরে দেখি দুই বুড়োতে নিমগাছের নিচে নিয়ে যেতে পারি কি না।

—চমৎকার। তাই চল।

দু'জনে খাটিয়া দু'টি ধরাধরি ক'রে গাছের নিচে নিয়ে যায়। এবং যেন খুব পরিশ্রান্ত এমন ভঙ্গিতে দু'জনে মুখোমুখি বসে। তারপর দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে শুয়ে পড়ে নিশ্চুপে আকাশ দেখে।

জ্যৈষ্ঠের পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা, ছায়াপথ, প্রাচীন পরিত্যক্ত পথের স্মৃতি। দুই দলের যুবকেরা দূরে উল্লাস ও নাচগান করছে। যুবতীরাও আছে তাদের সঙ্গে। ধামসা, তুম্‌দা, ঢোলক, বাঁশি এবং একটি নামগোত্রহীন তার যন্ত্রে বিচিত্র সুর উঠছে।

লক্ষ্মণ বলে, আজকের দিনটা একটা খুব দিন। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। অথচ এমন হয় না।

—না, বাজিকরের সঙ্গে গেরস্থ মানুষের বন্ধুত্ব হয় না, এটা ঠিক। আমরা তো পথের মানুষ। মিলমিশ যতটুকু হয়, সে শুধু উপরে উপরে।

লক্ষ্মণ গভীর শ্বাস ফেলে বলে, দিনকাল খুব খারাপ। না হলে, তোমাকে বলতাম আমাদের গ্রামে গিয়ে থাকতে। এখন আর একথা বলতে সাহস হয় না।

অথচ, পাঁচবছর আগেও কত মানুষকে বসত করিয়েছি। জঙ্গল কেটে, পাথর চটিয়ে, চাষের জমি পত্তন ক'রে দিয়েছি। এখন আর সে দিন নেই। সব জমির মালিক তৈরি হয়ে গেছে। জঙ্গল কেটে জমি যেই খালাস হল তখনই মালিক এসে হাজির হবে। দেও, তখন তাকে ভাগ দেও। আর সে ভাগ ক্রমশ সর্বস্ব হয়ে যায়।

—পারগানা, সেজন্যই বাজিকর জমিতে বসত করতে চায় না। জমিতে বড় দুঃখ।

লক্ষ্মণ ঝট্ ক'রে উঠে বসে। হাত দু'টোকে কোলের মধ্যে সশব্দে আছড়ে ফেলে বলে, তোমার মাথা। জমিতেই স্থিতি, জমিতেই স্থায়িত্ব, জমিতেই সুখ। জমি না থাকলে জীবনের কোনো অর্থই হয় না। তুমি জান জমিতে যখন ফসল ধরে তখন মানুষের মনের ভাব কেমন লাগে?

পীতেম তেমনি আকাশের দিকে তাকিয়ে। সংক্ষেপে বলে, না, জানি না।

—তোমার বউয়ের পেটে যখন বেটাবেটিরা এসেছে তখন তোমার মনের ভাব নিশ্চয়ই মনে আছে?

—আছে।

—তবেই বোঝ।

লক্ষ্মণ আবার শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়েই সে বলে, তুমি মানুষটাকে আমার বড় ভালো লেগেছে। তোমাদের কি জাত, সরদার?

—আমরা বাজিকর জাত।

—বাজিকর কোনো জাত নয়।

—হিন্দু-মুসলমান সমাজ আমাদের ডোম-চণ্ডালের জাত হিসাবে ধরে।

—তোমরা ডোম জাত আর তোমাদের জমির আকাঙ্ক্ষা নেই?

—না

—হতেই পারে না।

—আকাঙ্ক্ষা থাকলেই বা দেয় কে জমি?

—জমি আবার কে দেবে? জমি নিজেকে হাসিল ক'রে নিতে হবে।

—এই না বললে দিনকাল বড় খারাপ?

—তা তো খারাপই। তা বলে মানুষ থাকবে তার জমি থাকবে না! পুরুষ-মানুষের যেমন একজন মেয়েমানুষ চাইই, তেমনি সব মানুষেরই জমিও চাই।

—তারপর তোমাদের মতো মালিকের বাঁধা গোলাম হই আর কি! ওর মধ্যে বাজিকর যায় না।

—তা যাবে কেন? খালি লোক ঠকিয়ে খাবে!

লক্ষ্মণের উষ্মায় পীতেম হাসে। বলে, ঠিক ক'রে বল তো পারগানা, জমি থেকে যে ফসল তোল ক'জন তা থেকে খাবলা মারে?

—ওঃ, তার কি হিসাব আছে। যেমন ধর, জোতদার, গাতিদার, পত্তনিদার,

ঘাটোয়াল, জমিদার, সাহেব, পুলিশ, দারোগা, ব্রাহ্মণ, আড়তদার, গোলাদার, মহাজন—

—থাক্ থাক্, ওরে-ব্বাপ—

—আরো আছে, শুনবে ?

—না, আর দরকার নেই। অবুও তুমি বলবে জমিতেই স্থিতি, জমিতেই সুখ ?

—ও তুমি বুঝবে না। তবুও তোমাকে বলে রাখি, যদি কখনো মন কর থিতু হবে গেরস্থ হবে, পারগানা লক্ষ্মণ সোরেনের নাম মনে রেখো। এখান থেকে বিশ ক্রোশ দক্ষিণে, গ্রামের নাম বহেরা, থানার নাম দীঘি।

পীতেম জানবে না আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের এই নক্ষত্রখচিত রাতে খোলা আকাশের নিচে লক্ষ্মণ সোরেন যে বীজ তার অভ্যন্তরে প্রোথিত করল, তার অধস্তন তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষে সে পল্লবিত হয়ে অনেক সমস্যা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখের জন্ম দেবে।

সে অভিভূত বোধ করে এবং বলে, মনে রাখব, ভাই।

—ভাই ? তুমি আমাকে ভাই বললে ?

—ভাই বললাম।

বাজিকর ছাউনির দু'টি বিশেষ তাঁবুতে আজকের রাতটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সে দু'টি তাঁবু জিল্লু ও পরতাপের। বাঘের থাবার ঘায়ে পরতাপ কিছু আহত ছিল, কিন্তু সে কারণে তার বউ তাকে খাতির করে না। সারাদিনে নানা কথা হয়েছে কিন্তু কোনো একান্ত কথার অবকাশ হয় নি। আর এখন যখন অবকাশ হল তখন কথার কোনো প্রয়োজনই নেই যেন।

শেষরাতে ঘুম ভাঙলে পরতাপ বউয়ের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে সন্তর্পণে মুক্ত ক'রে বাইরে আসে এবং ডুমকা সোরেনের তাঁবুতে আসে। উড সাহেবের ওষুধে ডুমকা আজ তিন রাত্তির পর ঘুমায়। তার পাহারাদার ছেলেটিও ঘুমে অচৈতন্য।

সেখান থেকে পরতাপ বেরিয়ে আসে এবং তখনই আবছা অন্ধকারের মধ্যে পেমাকে গঙ্গার দিক থেকে সে সন্তর্পণে ফিরে আসতে দেখে। তার কিছু সংশয় ও সন্দেহ হয়। কিন্তু এতদিন অনুপস্থিতির ফলে কিছুটা দূরত্ব ও সংকোচ সে বোধ করে। ফলে চট ক'রে পেমাকে কিছু বলতেও পারে না, আবার তাকে দেখাও দেয় না।

ছাউনিতে ফিরে এসে পরতাপ তার বউকে জাগ্রত দেখে।

বউ বলে, এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে ?

পরতাপ বলে, রাত কোথায় ? গিয়েছিলাম ডুমকাকে দেখতে।

সে আবার বউয়ের পাশে শুয়ে পড়ে এবং সামান্য সময় পরে বলে, পেমাকে দেখলাম গঙ্গার দিক থেকে আসতে ?

পেমার সঙ্গে আনন্দর সম্পর্ক গভীর হয়েছে। বিষয়টা আর গোপন নেই। যেহেতু এটা বাজিকর ছাউনির ঘটনা তাই যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা সবাইকেই কেন্দ্র করে। দলকে ও পীতেমকে যে এ নিয়ে ভাবতে হবে একথা সবাই জানে, জানে পেমাও গোষ্ঠীবদ্ধ থাকার সুবিধা এবং অসুবিধা এই। পেমা যখন সালমার কাছে ভাগ্য গণনা করতে গিয়েছিল, সালমা তখন বুঝতে চেষ্টা করে যে সে কতখানি বাজি ধরেছে পেমা যে অচিরে তলিয়ে যাবে, এ সম্পর্কে তার সংশয় থাকে না। সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল- তুই তো সবনাশ ক'রে বসে আছিস।

– সর্বনাশ কেন? আমার মনে লাগলে সে মানুষের কাছে যেতে পাবব না আমি?

– তা বলে দলের বাইরের মানুষ? সে তোকে কি দেবে?

– কি দেবে? কিছু কি চাই আমি? আমি কি বেশ্যা?

– তুই বেশ্যা না হলেও বাইরের মানুষ বাদিয়ার বেটিকে বেশ্যা হিসাবেই চায়।

– চাক না। বেশ্যা কেন, আমাকে যদি সে একটা মাদী ঘোড়ার মতো চায়, তবে আমি তাই হব!

সালমা খুব আশ্চর্য হয়। এই মেয়েটা, সেদিনের মেয়েটা কবে এমন দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তির অধিকারী হল? তারপরে ভাবে তার এক পুরনো আক্ষেপ। বাজিকর কখনো জাত যাযাবর নয়। জাত যাযাবর হল বানজারা। বাজিকরের ঘর-গেরস্থালির সঙ্গে সম্পর্ক করার একটা প্রবণতা সব সময়েই থাকে। এ সবই রক্তের দোষ।

তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে সালমা জিজ্ঞেস করে, মানুষটা কে?

– বলব না।

– তবে আমার কাছে এসেছিস কেন?

– আমার কি হবে?

– সে তো তুইই বলে দিলি। তুই ঘোড়ী হবি।

পেমা রাগ ক'রে উঠে যায়। লোকটা কে জানতে সালমা বা অন্য কারো দেরি হয় নি। দারোগা ভয়ানক ক্ষমতাশালী মানুষ। কাজেই পীতেমের কানে কথাটা ওঠার পরও সে অনেক চিন্তা করেও স্থির করতে পারে নি কি ক'রে এ সমস্যার সমাধান করবে। সমস্যাটা অন্য সবার মগজেও ঘুরপাক খায়। কিন্তু এই দু-তিন মাসের মধ্যে নানা ব্যস্ততায়, তাছাড়া দলের দুই ব্যক্তির নিরুদ্দেশ হওয়ায় দলের কেউই বিশেষ ক'রে এ নিয়ে ভাববার অবকাশ পায় নি।

এখন পরতাপ পেমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে তার বউ একটু সমস্যায় পড়ে। জ্যৈষ্ঠের শেষরাত্রির অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক ঠাণ্ডা বাতাস শরীরকে আরাম দিচ্ছে। তাছাড়া এতদিন পরে যে মানুষটা ফিরে এল তার কথা কিছুই শোনা হয় নি। কাজেই এই মুহূর্তে সে এ প্রসঙ্গ তুলতে চাইল না।

সে বলল, হবে হয়ত আড়ালে গিয়েছিল! তারপর কথা ঘুরিয়ে বলে, তোমার কথা তো কিছুই শোনা হয় নি কাল। কি ক'রে ছিলে এতদিন আমাকে ভুলে?

পরতাপ তাদের অজ্ঞাতবাসের কথা বলে, যার প্রথম পর্ব গতানুগতিক। মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথেই ডাকাত তাদের ধরে। তারা লুণ্ঠিত ও আহত হয়। টাকাকড়ি ও ঘোড়া দু'টি দস্যুরা নিয়ে যায়। মাথায় আঘাত পেয়ে জিল্লু অচৈতন্য হয়ে পড়ে। পরতাপ হাঁসুয়ার কোপ হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়ে জখম হয় এবং দৌড়ে জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচে।

পরদিন সকালে শিকার থেকে ফেরত একদল সাঁওতাল তাদের ওই অবস্থায় দেখে তুলে নিয়ে যায় নিজেদের গ্রামে।

সেই গ্রাম ডুমকাদের। পাহাড়ের উপত্যকায় সবুজ সেই গ্রামে মানুষ খুব প্রাণবন্ত, জীবন খুব বেগবান।

—তাহলে সেখানে ভালোই ছিলে? আমাদের কথা যখন মনেই পড়ে নি!

—খারাপ ছিলাম কি ক'রে বলি? সমস্ত ব্যাপারটাই নতুন তো।

সবই নতুন। পরতাপ ও জিল্লু সেখানে অনেক কিছু শিখেছে যার সঙ্গে বাজিকরের কোনো সম্পর্ক নেই। সেখানে তারা ধান কেটেছে, ধান মেরেছে। বলদ দিয়ে সর্ষে-কলাইয়ের খেত চষেছে। দেখেছে কেমন ক'রে বীজ অংকুরিত হয়ে মাঠ সবুজ হয়ে যায় এবং তাতে শরীরের ভিতরে কেমন খুশির শিহরন জাগে। সন্ধ্যার পরে তারা অন্য সবাইয়ের সঙ্গে উদ্দাম হয়ে নাচ গান করেছে, নেশা করেছে পচানি ও তালের রসের। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দল বেঁধে শিকার খেলা। শিকারের উত্তেজনার কাছে কোনো কিছুই লাগে না, এমনকি বাজিকরের জানোয়ার চুরি করাও নয়। ধাবমান জানোয়ারকে তীরবিদ্ধ করা, আক্রমণোদ্যত জন্তুকে সাহসের সঙ্গে ঘায়েল করা এক বিরাট অভিজ্ঞতা। এই সব কাজে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে মানুষের জন্মের কারণ এবং জীবনের অর্থ।

—আর কিছু? আর কিছু?

—কি আর?

—কোনো সঙ্গিনী জোটে নি? এদ্দিন থাকলে?

·কেন? তুমি জুটিয়েছ নাকি এর মধ্যে?

—জোটাই নি। তবে ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলে?

—ভাবছিলাম, জীবন কি ভাবে কাটবে? ভাবছিলাম, কি নিয়ে থাকব?

—তাহলে, আমি ছাড়াও চলে?

—কি দেখলে এত ঘুরে এসে? আমি ছাড়াও তো তোমার চলেছে। কাছে থাকলে মানুষ একরকম থাকে, দূরে গেলে আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়, ভুলে যায়। তুমি দুনিয়া ঘুরে এসে একথা বুঝলে, আর আমি তো একা এখানে বসে সেই একই

কথা শিখলাম !

—খব ভেবেছ এ কয়মাস, না ?

—ভেবেছি, খুবই ভেবেছি প্রথম প্রথম।

—তারপরে ?

—তারপরে সব আবার পুরানো হয়ে যায়। তখন আবার নতুন ক'রে ভাবনা শুরু হয়।

—তুমি অনেক বদলে গেছ।

—তুমিও কি সেই মানুষ আছ ? তা যাকগে, তারপর তোমার কথা বল। শুধু ভাবতে আবাক লাগছে যে, এত দীর্ঘ দিন যা তোমাদের আটকে রাখল, সে কোন জিনিস ?

পরতাপ যা বলতে পারে না তার নাম জীবন। সমস্ত যাযাবরী চাঞ্চল্যেও একসময় ক্লান্তি আসে। একঘেয়ে লাগে। যাযাবর তখন নতুন রাস্তায় পা বাড়ায়। কিন্তু সব রাস্তাই প্রাচীন এবং প্রথম চমক কেটে গেলে যাযাবর বোঝে সেই একই জায়গায সে দাঁড়িয়ে আছে।

জিল্লু ও পরতাপ সেই একঘেয়েমি থেকে কিছুদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেয়েছিল। সেজন্যই এই বিস্মরণ। আর যেখানে ছিল সেখানে জীবন অঢেল। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদ্যতা অটুট। এমন চমৎকার একাত্মবোধ তারা সারা দুনিয়ায আব কোথাও দেখে নি।

৭

প্রায় এক মাস পরে ডুমকা সম্পূর্ণ সুস্থ হলে লক্ষ্মণ তাকে নিয়ে নিজের গ্রামে চলে গেল। যাওয়ার সময় পীতেমকে বলল, যদি নেমন্তন্ন পাঠাই, যেতে হবে কিন্তু।

পীতেম বলে, কথাটার মানে বুঝলাম না। 'যদি নেমন্তন্ন পাঠাই' মানে কি? 'যদি' কেন?

এই একমাসে তাদের সম্পর্ক এমনই গভীর হয়েছে। প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ পীতেম লক্ষ্মণকে দিয়েছে একখানা অদ্ভুত আকৃতির হাঁসুয়া, যার হাতলটা ছোট কিন্তু ধাতব অংশটা চওড়া ও ভারা। ধারালো অস্ত্রটায় এক কোপে একটা পশুর মাথা নামিয়ে দেওয়া যায়।

লক্ষ্মণ বলেছিল, 'যদি'র মানে এই যে দিনকাল খারাপ। তারপরে একমাসের উপরে ঘরছাড়া। ওদিকের কি অবস্থা, কে জানে? তবুও কথা রইল, ডাক দিলে সাড়া দিও।

পীতেম বলেছিল, দেব।

তারপর রাজমহল শহরের উৎসবের মাস শেষ হলে লক্ষ্মণ সোরেনের নেমন্তন্ন এসেছিল। লক্ষ্মণ তাদের শহরায় উৎসবে যোগ দেবার জন্য পীতেমকে সদলে নেমন্তন্ন করেছিল।

বাজিকরেরা ইতিমধ্যে নিজেদের কিছু শ্রীবৃদ্ধি করেছিল। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন এই তিন মাসে চাষী গৃহস্থের বড় দুঃসময় কাটে। এই সময় তাদের সঞ্চিত সম্পদ সব ব্যয় করতে হয়। কৃষকের সঞ্চিত সম্পদ হল তার গৃহপালিত পশু। প্রথমে তারা এইসব পশু বেচে খায়, তারপর মহাজনের কাছে হাত পাতে।

কাজেই পশুর দাম এসময় একেবারে পড়ে যায়। বাজিকরেরা এবার অনেক পশু কিনেছে। পীতেমের দলে এখন ঘোড়াই আছে বারোটা, মোষ, শুয়োর, ভেড়া ইত্যাদিও অনেক। গরু ও বকরি তারা রাখে না, কারণ এই জানোয়ারগুলো তেমন কষ্টসহিষ্ণু নয় এবং রাস্তাঘাটের জীবনে অভ্যস্তও নয়।

পীতেমের জানোয়ারগুলো এখন রাজমহলের পাহাড়ের গায়ে বর্ষার পরের অফুরন্ত সবুজ ঘাসে চরে ও স্বাস্থ্যবান হয়। স্বাস্থ্যবান জানোয়ারের মালিকানায় বাজিকরেরা বরাবরই খুব গর্বিত।

লক্ষ্মণের কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসাতে পীতেম মনে মনে আনন্দ ও গর্ব দুইই বোধ করে। বাজিকরকে কেউ কোনোদিন নেমন্তন্ন করে না। তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করার কথা কেউ ভাবে না। লক্ষ্মণ সেই মর্যাদা দিয়েছে তাদের, এ কি কম কথা?

কার্তিকের শেষে পীতেম, সালমা, পরতাপ, জিল্লু ইত্যাদি দশজন বাজিকর দশটি

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বহেরা আসে।

রাস্তায় সাঁওতাল গ্রামগুলিতে ঢোকার মুখে তারা দেখল গাছের গায়ে গরুর চামড়া ও আড়াআড়ি একজোড়া বাঁশী টাঙানো। তারা দেখল মোড়ে মোড়ে পুঁতে রাখা ঝাণ্ডা, ঘণ্টা, ভাঙাকুলো।

গ্রামে ঢোকার আগেই বাধা পায় বাজিকরেরা। প্রথমত বিদেশী চেহারা, তার উপরে ঘোড়সওয়ার। পথ আটকায় সাঁওতাল মানুষ।

—কে যায়?

—আমরা বাজিকর।

—কোথায় যাওয়া হবে?

—যাব দীঘি থানার বহেরা গ্রামে।

—সেখানে কি দরকার?

—সেখানে পারগানা লক্ষ্মণ সোরেন আমাদেব বন্ধু লোক, শহরায় নেমন্তন্ন আছে।

রাস্তা ছেড়ে দেয় মানুষ। পীতেমের দল অগ্রসর হয়। মাঠে মাঠে পাকা ধান এখন কাটার অপেক্ষায়। বাতাসে তার সুঘ্রাণ। পাখপাখালি সারা মাঠে উল্লাস জুড়েছে। পরিচ্ছন্ন সাঁওতাল গ্রামগুলোতে শহরায়-এর উৎসব শুরু হয়ে গেছে। পীতেমের ভারি ভালো লাগে।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে কোনো গ্রামে তারা রাত্তিরের মতো আশ্রয় নেয়। গ্রামের সর্দারেরা পীতেমের কথা জানে। হয়ত লক্ষ্মণের ব্যবস্থাই এই রকম।

—কে যায়?

—আমি পীতেম বাজিকর।

—কোন পীতেম? পারগানা লক্ষ্মণ সোরেনের বন্ধু বটে?

—তাই বটে।

—বসো হে কুটুম। আজ রাতে এখানেই কুটুম কর, বিশ্রাম কর, খাও দাও, নাচ-গান দেখো।

এ রকম একটি নাচ-গানের আসরে পীতেমেরা একটি অদ্ভুত গান শোনে। গানটি বড় বিষাদের। গানটিতে স্ত্রী তার স্বামীর উদ্দেশে বলছে,—বাবারা আর ভাইয়েরা শুয়োর বলি দিচ্ছে, সাদা মোরগ বলি দিচ্ছে, সব জামাইরা হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করছে, পানভোজনে আনন্দ উপভোগ করছে। হায় রে, হায় রে, একজন মানুষ শুধু ভকত দয়ারামকে পিঠের উপরে বয়ে বেড়াচ্ছে।

চকিতে বাজিকরদের সেই দৃশ্যটির কথা মনে পড়ে, যখন দয়ারাম ভকত মোষ কিনতে এসেছিল। সেই মানুষটির কথা মনে পড়ে, যার ঘাড়ে পা রেখে দয়ারাম ঘোড়ার উপরে আড় হয়ে বসে।

বহেরা গ্রামে বাজিকরেরা পৌঁছালে, লক্ষ্মণ সোরেন সপরিবারে পীতেমের দলকে

প্রত্যুৎগমন করে। এমন রাজকীয় অভ্যর্থনা বাজিকরেরা কোনোদিন পায় নি। সমস্ত ঘরবাড়ি নিপুণ ক'রে নিকোনো, ঝকঝকে পরিষ্কার উঠোন। প্রবীণরা এসে সম্মান জানায় পীতেম, সালমা ইত্যাদি প্রবীণদের। পরতাপ এবং জিল্লু পুরনো সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কলরব করে।

সন্ধ্যার পরে লক্ষ্মণ সোরেন, তার স্ত্রী পীথা মুর্মু এবং অন্যান্য প্রবীণদের সঙ্গে পীতেম-সালমা বসে শহরায় উৎসবের কথা শোনে। নিয়মমতো, কার্তিক মাসের অমাবস্যাতে শহরায় পূজা হয়। কিন্তু এখন আর সব নিয়ম ঠিকমতো মানা যাচ্ছে না। সাঁওতালরা মহাজন, মালিকের শোষণে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। ফলে ধান ওঠার আগে উৎসবের কথা কেউ ভাবতে পারে না। এখন তাই অঘ্রান মাসেই উৎসব হয়। উপায় কি? শহরায়ে যে ঠাকুর-ঠাকরানের পূজা হয় তাঁরা শস্য ও পালিত পশুর শ্রীবৃদ্ধি করেন, নিরাপদে রাখেন। গোয়ালঘরে মারাংবুরু এবং ঠাকরানের পূজা হয়—আতপ চাল, মেথির গুঁড়া, তেল-সিঁদুর দিয়ে গোলাকার "খঁড়" সাজানো হয়। বলি দেওয়া হয় মোষ, শূকর, মোরগা। মোষ বলির চিন্তা এখন আর কেউ করে না, তবে শুয়োর ও কাটোল মুরগি বলি হয়। মানুষ প্রচুর নেশা করে। নাচ-গান চলে কয়েক দিন ধরে।

এবার যেসব নতুন গান বাঁধা হয়েছে, তার অধিকাংশই মানুষের দুঃখকে নিয়ে। একটি গানে বলছে—

রাজমহল পাহাড়ে,
গাড়ি চলে লহরে,
চার হালের মোষ বেচে
হায়রে, হায়রে,
মরদ গেল শহরে।
হায়রে, হায়রে,—
গোমানীর জল গেল শুকিয়ে।

অথবা,

পারগানার কাছে নালিশ জানালাম,
পারগানা চুপ ক'রে থাকে।
আমার বিচার করে দারোগা,
আমার বিচার করে মহাজন,
আমার বিচার করে
ঘোষা নালার ঘাটোয়াল।
পারগানা চুপ ক'রে থাকে।

অথবা,

পারগানার কাছে আর্জি জানালাম,

হায়রে, হায়রে, মিছাপুর মেলায়,
কেনারাম দারোগা পেয়াদার জন্য
হায়রে, হায়রে! মিছাপুর মেলায়!
নির্দয় দারোগা, ধূর্ত পেয়াদা,
মনে প্রাণে সুখ নেই,
দারোগা ঘোড়ার উপর টাপটাপ যায়—
কোমরে পেতলের বেল্ট,
উজ্জ্বল পোশাক
আমার সুখ নেই।

পারগানা লক্ষ্মণ সোরেন এসব গান শুনে বিষণ্ণ হয়ে যায়। পীতেম তার পাত্রে মদ ঢেলে দেয়। লক্ষ্মণ ম্লান হেসে পানপাত্র মুখে তোলে। এক ঢোক খেয়ে, তারপর বলে, আমি কি করব বল? আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আমার কি করবার আছে।

কথাবার্তা হয় আঞ্চলিক বাংলায় বাজিকরেরা যে ভাষাটা ভালোই আয়ত্ত করেছে। গানগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে জিল্লু, যে আগেকার ছ'মাসে এদের ভাষাটা মোটামুটি ভালোই শিখেছে। বাজিকর অন্যদের ভাষা চট ক'রে ধরে নিতে পারে। কিছু-কিছু গান আবার বাংলাতে হয়, কিছু বাংলা ও সাঁওতালি মিশ্র ভাষায় হয়।

পরতাপ ও জিল্লু সাঁওতাল যুবক-যুবতীর নাচের তালে তালে চমৎকার পা মেলাতে শিখেছে। এতে উভয় পক্ষই প্রচুর কৌতুক বোধ করে। ডুমকার মা পীথা একসময় সালমাকেও টেনে নামায়। বাজিকরদের কিছু নিজস্ব নাচও আছে। সালমা মাথায় রুমাল বেঁধে দলের আরো পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে হাততালি ও গান সহকারে নাচে। পীতেম জিল্লুর কাছ থেকে ঢোলক টেনে নিয়ে বোল তোলে।

প্রচুর উচ্ছ্বাস ও কোলাহল হয়। প্রবীণেরা পুনরুজ্জীবিত বোধ করে। দিন কেটে যায় অত্যন্ত দ্রুত। উৎসব তারপর স্তিমিত হয়ে আসে।

নতুন উৎসব শুরু হয় তারপরে। সে উৎসব ফসল কাটার। মানুষের পরিশ্রম যেন পরিশ্রমই নয়। সারাদিন মাঠের পর মাঠ—ধান কাটা ও সেগুলো ঘরে বয়ে আনা। অফুরন্ত উৎসাহ। পীতেম অবাক হয়ে দেখে, জিল্লু ও পরতাপ এ কাজেও বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই নিতান্ত গেরস্থালি কাজটাতে তারা সমান উৎসাহ বোধ করছে।

তারপর বাজিকরেরা একদিন দেখতে পেল কাটা ধানের খেতের ভেতরের আল কেটে কেটে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি আসছে লাইন দিয়ে। গাড়িগুলো এ গ্রাম সে গ্রামে ঢুকে যাচ্ছে। বহেরাতে দশখানা গাড়ি এল এক দিনেই।

পীতেম একসময় লক্ষ্মণকে জিজ্ঞেস করে, এ সব ফসল তোমাদের নয়?

—আমাদেরই, আবার আমাদের নয়ও।

—কেমন ?

— মানুষ সব বাঁধা হয়ে আছে ধারে দেনায়। এখন সেসব উশুল হবে। দেখছ না, মহাজনরা সব এসে হাজির হয়েছে ?

— এরা সব মহাজন ?

—হ্যাঁ। ঐ যে কুঁজো মতো লোকটাকে দেখছ, ও হল পতিত সাউ। দশ বছর আগে বর্ধমান না কোথা থেকে যেন আসে এখানে। হাটে তামাক পাতার দোকান নিয়ে বসত। পাঁচ টাকার মালও রাখতে পারত না, এমন দুঃস্থ ছিল। এখন দেখ লাখ টাকার মালিক।

— কি ক'রে হল ?

— সাঁওতালের রক্ত নিঙড়ে হল। বেশিদিনের কথা নয় সর্দার, এই সব জমি, যতদূর তোমার চোখ যায়, এই সব জমি আমরা জঙ্গল কেটে পাথর চটিয়ে খালাস করেছি। তখন কোনো ভাগীদার ছিল না। তারপরে পাকুরের রাজারা বেশি খাজনা পাবার আশায় সব জমি পত্তনি দিয়ে দেয। পত্তনিদাব গ্রাম গ্রাম ঘুরে আওয়াজ তোলে, যে চাষা টাকায় সিকি খাজনা এখন বেশি না দেবে তার সঙ্গে আর নতুন ক'রে বন্দোবস্ত হবে না। তারপরে জরিপের জন্য যে রশি ফেলে তার মাপ পরিমাণ তারাই বোঝে, কি তারাও বোঝে না। এইভাবে পত্তনিদার আবার দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার, ইজারাদার, ছে-ইজারাদার নিয়োগ করে। তাদের হাতে মানুষের যন্ত্রণা নিত্য নতুন ক'রে বাড়ে। সাঁওতালের চোখে ঘুম নেই। সর্দার চোখ বন্ধ করলে ম্যানেজার, তশীলদার, পাইক, চৌকিদার, দারোগা এসব চোখের সামনে দেখে। সবাই খালি হাত পেতে আছে। না দিলেই হুজ্জৎ। না দিলেই তোমার সর্বনাশ। অথচ আগে এমন ছিল না। আমার খাটনির ভাত আমিই খেতাম, আর কেউ নয়। এখন আমার খাটনির ভাত আমি ছাড়া আর সবাই খায় !

— পারগানা, তুমি এত বোঝ ! আর রাজমহালের মানুষ বলে সাঁওতাল হল জংলী জাত, বোধভাষ্যি নেই।

-- হাঁ, তারা এমন ভাবে বটে। পাঁচ শলি ধান মহাজনের কাছ থেকে সাঁওতাল ধান নিলে দেড বছরে কত ফেরত দিতে হয় জান ?

— কত ?

— হিসাব করতে জান তুমি ?

— জানি।

— তবে দুনা হিসাবে হিসাব কর।

— দশ শলি।

—হল না।

— তবে ?

—দেড় বছরে…ধর, প্রথম সনে ধান দেওয়া গেল না—হয় ফসল হয় নি বা অন্য

কোনো কারণ। সুতরাং তার পরের বছর।

—বিশ শলি ?

—হল না।

—হিসাবে তো তাই হচ্ছে।

—সর্দার হিসাবটা কার, সেটা দেখতে হবে।

—কার হিসাব ?

—হিসাব পতিত সাউ-এর, হিসাব দয়ারাম ভকতের, হিসাব গোরাচাঁদ সেনের।

—হিসাব তো একই হয়, হিসাব আবার আলাদা আলাদা হয় নাকি ?

—হয় না ? পতিত সাউ-এর হিসাবে এই বিশ শলি ধান তুমি আলাদা নিয়ে ওজন কর, দেখবে চল্লিশ শালি হবে। আবার অন্য দু'জনার ওজন করা ধান নিয়ে আলাদা ওজন কর, যা বলবে তার দেড়া তো হবেই।

—মানুষ দেয় ?

—সাঁওতাল দেয়।

—বুঝে দেয়, না, না বুঝে দেয় ?

—বুঝেও দেয়, না বুঝেও দেয়।

—কেন দেয় ?

—হায় রে সর্দার ! আশপাশের দশটা গ্রামের পারগানা আমি। নিয়ম ক'রে দিয়েছি, ধান উঠলে পরে শহরায় উৎসব হবে, কার্তিক মাসের অমাবস্যায় হবে না। কারণ কি ?

—কি ?

—পাঁচ টাকা বেনিয়ার কাছ থেকে কর্জ নিয়ে সারা জীবন বেগার দিয়েছে আমার এলাকার মঙ্গল মুর্মু, সেই দেনা এখনো শোধ হয় নি। দয়ারাম ভকতের ঘরে তার বেটা সুফল এখনো বাঁধা চাকর হয়ে আছে। সাঁওতাল কর্জ নিলে তা আর বংশসুদ্ধ মরে হেজে না গেলে শোধ হয় না।

এসব কথাবার্তা হচ্ছিল লক্ষ্মণের বাড়ির উঠোনে বসে। তিন পাশে ধানের মরাই উঠেছে উঁচু হয়ে। লক্ষ্মণের ছেলেরা এবং অন্য কয়েকজন পাটার উপর ধান মাড়াই করছে। একপাশে পীথা ও অন্য কয়েকজন রমণী কুলো দিয়ে বাতাস কেটে মড়া ধান পরিষ্কার করছে। লক্ষ্মণের বাড়ির মুরগি ও শুয়োরগুলো সুযোগে পেলেই ধানে মুখ দিচ্ছে। বহেরায় লক্ষ্মণই একমাত্র ব্যক্তি যার কোনো ঋণ নেই। পীতেম এইসব গেরস্থালি কাজকর্ম নজর ক'রে দেখছে ও লক্ষ্মণের কথা শুনছে।

এমন সময় গ্রামের অন্তপ্রান্তে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। উত্তেজিত গলা মানুষের। সবার উপরে একটা তীক্ষ্ণ চেরা গলার তর্জনগর্জন। লক্ষ্মণ উৎকর্ণ হয়ে শুনল। গণ্ডগোল ক্রমাগত বেড়ে চলায় তাকে উঠতে হল। পীতেমও তার সঙ্গে ওঠে।

একটা অপ্রশস্ত উঠানে ধান মাপা হচ্ছে। গণ্ডগোল সেখানেই। চেতন মাঝির বাড়ি সেটি। এখন উত্তেজনা অপেক্ষাকৃত শান্ত। কিন্তু লক্ষ্মণের সঙ্গে পীতেম সেখানে উপস্থিত হয়েই বোঝে, একটা চাপা ত্রস্ত ভাব স্থানীয়দের মধ্যে রয়েছে। একপাশে একটা খাটিয়ায় জিল্লু শুয়ে আছে, তার মাথায় ও গালে রক্ত। কয়েকজন সাঁওতাল যুবক তাকে নানাভাবে শুশ্রূষা করবার চেষ্টা করছে।

জিল্লুকে ঐ অবস্থায় দেখে পীতেম ও লক্ষ্মণ দু'জনেই তার কাছে দৌড়ে আসে।

—কি ক'রে হল এসব ?

পীতেম সমস্ত উঠানটা খুঁটিয়ে দেখে। একপাশে আড়াআড়ি জোড়া বাঁশে ঝোলানো দাঁড়িপাল্লা। ওজন করার সিঁদুরের দাগ দেওয়া পাথর। লক্ষ্মণের পরিচিতি মতো পতিত সাউ দু' হাতে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়ানো। তার সামনে ছ'জন লাঠিধারী। একজন বৃদ্ধ, সম্ভবত চেতন মাঝি, উবু হয়ে বসে। তার দুই হাঁটুর ভিতরে মাথা. দুই কানের উপর হাত।

পীতেমকে দেখে পতিত সাউ হুংকাব দিয়ে ওঠে, পারগানা, এ ছোকরা কে ?

লক্ষ্মণ সে কথার উত্তর দেয় না। জিল্লুর পাশে বসা ডুমকাকে সে জিজ্ঞেস করে, কি ক'রে হল, এসব ?

—জিল্লু ওজনের কারচুপি ধরেছিল।

পতিত তার কথার উত্তর না পাওয়াতে সম্ভবত অপমান বোধ করে। সে এগিয়ে এসে বলে, আমি জানতে চাই এ ছোকরা কে, আর কেন আমার কাজে বাধা দেয় ?'

লক্ষ্মণ শান্ত অথচ গম্ভীরস্বরে বলে, এরা আমার অতিথি। তোমার লোক এদের গায়ে হাত দিয়ে ঠিক করে নি।

—আরে যা যা, শালা জংলী সাঁওতাল। তোর কাছে জিজ্ঞেস ক'রে তবে আমি কাজ করব ?

—জবান সামলে রাখ, বাবু। গতবার তোমাকে বলেছিলাম সরকারী বাটখারা নিয়ে এসে ধান ওজন করবে, অথচ এবারও তুমি ওই পাথরগুলো নিয়ে এসেছ।

—এই পাথরগুলো আমার লক্ষ্মী, এ পাথর দিয়েই আমি ওজন করব। যার পোষাবে সে আমার সঙ্গে কারবার করবে, যার পোষাবে না, করবে না। এই, তোল, তোল, ধান তোল—

—থামো, কথা আমার শেষ হয় নি। এ পাথর তোমার লক্ষ্মী, আমরা জানি, কিন্তু ও পাথর সাঁওতালের দুশমন। আমার ঘরে পাঁচসেরী সরকারী বাটখারা আছে। এবার তোমাকে সেই বাটখারা দিয়ে ধান মেপে নিতে হবে। কি, রাজি ?

পতিত সাউ-এর কণ্ঠস্বর নিমেষে চাপা তর্জনে নেমে আসে। সে কেটে কেটে বলে, লক্ষ্মণ সোরেন, এবার তোর মরণের পাখা গজিয়েছে। নিজের ভালো চাস তো আমার কাজে বাধা দিতে আসিস না।

এই শেষ কথার পর ডুমকা ঝট ক'রে উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্মণ হাত তুলে তাকে নিষেধ

করে। লক্ষ্মণ পতিত সাউ-এর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। পতিত হঠাৎ যেন নিজের দুর্বলতা দেখে লজ্জা পায় এবং ওজনদারকে ধমক দিয়ে ওঠে, এই শালা, ধান তোল, ধান তোল!

—খবরদার!

লক্ষ্মণ এবার প্রচণ্ড ধমকে সমস্ত চাঞ্চল্য স্তব্ধ ক'রে দেয়। তার পিছনে গোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছে। পতিত সাউ যেন উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসও শুনতে পায়।

সে বলে, আচ্ছা, আমিও দেখব। এই চল সব।

দলবল নিয়ে সে ক্রুদ্ধ পশুর মতো ফিরে যায়। লক্ষ্মণ তারপরও কিছুক্ষণ চুপ থাকে। তারপর একজন বয়স্ক মাঝিকে বলে, হাডমা, সব মহাজনকে জানিয়ে দে এবার সরকারী বাটখারায় ধান মেপে নিতে হবে। আমার বাড়িতে লোহার বাটখারা আছে। তাতে রাজি না হলে, তারা এবার ধান নিতে পারবে না।

জিল্লুর আঘাত গুরুতর নয়। কানের পাশে একটা জায়গা লাঠির ঘায়ে থেঁতলে গেছে খানিকটা। ফেরার পথে পীতেমকে লক্ষ্মণ বলে, সর্দার, তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই আমার।

পীতেম বলে, ক্ষমা বরং আমিই চাইব, পারগানা। আমার লোকই তো এসব ঝামেলা বাধালো।

—না না, তা নয়, তা নয়। এ ঝামেলা বাধতই। কতদিন মানুষ সহ্য করে? তোমাদের ছেলে উপলক্ষ মাত্র। হয়ত, এ ভালোই হল। একটা মুখ দরকার ছিল বাঁধ ভাঙার। জিল্লু সেই মুখটা খুলে দিয়েছে। তবুও তোমার অপমান হল, এই আমার লজ্জা।

এ ঘটনার পর লক্ষ্মণ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে গেল। পীতেম লক্ষ করল, কয়েকজন যুবককে কি কি নির্দেশ দিয়ে সে বিভিন্ন গ্রামে খবর দিতে পাঠালো। একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা।

তৃতীয় দিনে পীতেম বলল, আমরা এবার ফিরে যাব, পারগানা, অনুমতি কর।

লক্ষ্মণ বলে, বুদ্ধিমান লোক তুমি, তাই আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছ, নয়?

—কেমন?

—ঢাকাঢাকির কোনো ব্যাপার নেই, সর্দার। তোমার এখন যাওয়াই আমি চাচ্ছিলাম। বড় মুখ ক'রে ডেকে এনে বিপদে ফেললাম তোমাকে। তোমার এখন যাওয়াই ভালো। পতিত সাউ, গোরাচাঁদ এরা আমাকে ছেড়ে দেবে না। পুলিশ-দারোগা এদের জাতভাই। তারা আসবে।

—হুজ্জুতি হবে?

—হবে।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পীতেম বিদায় নেয়। কিন্তু গ্রাম চোখের আড়াল হতেই জিল্লুকে সে শাসন করে। কি দরকার ছিল তোর পরের বেপারে নাক গলানোর!

জিল্লু অবাক হয়, বাঃ, বোকা পেয়ে লোকগুলোকে ঠকাচ্ছে, দশ সেরকে পাঁচ সের বানাচ্ছে, কিছু বলব না!

—না, বলবি না। আমরা হলাম বাজিকর। গেরস্থের হাল-হকিকতের আমবা কি বুঝি! আমাদের তো রাস্তাতেই থাকতে হবে!

৮

রাজমহলে ফিরে এসে পীতেম সংবাদ পায় পেমা পালিয়ে গেছে। ধন্দু জানায় পেমাকে আনন্দরাম শহরের মধ্যের একটা কোঠা বাড়িতে রেখেছে। বাইরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কে নেই। ধন্দু জানেও না পেমা সেখানে স্বেচ্ছায় আছে, না, জবরদস্তিতে আছে। তবে দরজায় পাহারা আছে চব্বিশ ঘণ্টাই।

বেপরোয়া পরতাপ এ খবরে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়। সে প্রকাশ্যেই বলতে থাকে যে দু'জনকেই খুন করবে। পীতেম ধমক দিয়ে তাকে থামাতে পরতাপ বউয়ের উপরে গিয়ে তম্বি করে। তুইই আমাকে মিথ্যা বলেছিলি। সেদিন আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।

সালমা পীতেমকে বলে, তোদের বাজিকরদের হালচালই এইরকম। সব সময় গেরস্থ মানুষের পানে নোলা বাড়ানো স্বভাব। পেমার দোষ দিয়ে লাভ কি? এ তো জাতের দোষ! দেখে আসলি না, কেমন সুখের কপাল গেরস্থ মানুষের!

তারপর অবশ্য সালমাই পেমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসে। পাহারাদারকে কথায় ভোলাতে তার সময় লাগে না বেশি।

পেমার সামনে এসে প্রথমে কথা বলে না সালমা। পেমা বলেছিল, আনন্দ যদি চায় আমি ঘোড়ী হই, তো আমি ঘোড়ী হব। সালমা দেখতে চায় পেমার সে তেজ এখনো আছে কি না। দেখে আশ্চর্য হয় যে সে তেমনি আছে।

পেমা হেসে বলে, খুব অবাক হচ্ছ, পিসি?

সালমা তুচ্ছার্থক ধ্বনি করে। বলে, অবাক হব কেন? বাজিকরের জাতটাই তো এমন, যে কোনো ছুতোয় বাঁধা পড়তে চায়। কি সুখে আছিস এখানে?

—কেন? দুঃখ কিসের আমার? চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দু'জন মানুষ আমার সেবা করে। এই দেখ শাড়ি, এই দেখ কত গয়না।

—আনন্দ পয়সা পায় কোথা এত?

—জমিজমা আছে, মহাজনী কারবার আছে। দারোগা তো সেসব দেখাশুনা করে না, আনন্দই দেখে।

- তবে ভালোই আছিস?

—হ্যাঁ।

—দারোগা কিছু বলে না?

—বলবে কি? তার তো নিজের তিনজন মেয়েমানুষ আছে।

সালমা পেমার সর্বাঙ্গে তাকিয়ে তার অধঃপতন দেখে। শেষে সে একটু আতঙ্কিত হয়। বলে, তোর পেটে বাচ্চা এসেছে, মনে হয়?

পেমা সংকোচ বোধ করে না। বেহায়ার মতো হাসে। বলে, হ্যাঁ, এসেছে তো।

এখন দাম্ভিক পেমা। অথবা, এখনো দাম্ভিক পেমা। যা সালমা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তা এখন পেমা দেখতে পাবে না। দেখিয়ে দিলেও দেখবে না। হঠাৎ সালমার মায়া হয়, যা তার কদাচিৎ হয়। সে বলে, আনন্দ জানে ?

— না। আরে সেটাই তো মজা !

হেসে গড়িয়ে পড়ে পেমা। যেন ভাবি মজার ব্যাপার সে লুকিয়ে একা উপভোগ করছে।

— জানলে তোকে রাখবে ?

— রাখবে না ? আমাকে ছাড়া একদিন বাঁচবে না আনন্দ।

— তোকে বলেছে ?

— বলবে কেন ? আমি বুঝতে পারি না ?

— আনন্দর ঘরে বউ আছে না ?

—থাকল, তাতে আমার কি ?

সালমা বোঝে পেমার দম্ভ এখন যে স্তরে আছে, সেখানে আঘাত করলেও ফল হবে না। বস্তুত, বাজিকর মেয়েদের সতীত্বের তেমন বড়াই নেই। কেউ ভ্রষ্টা হলে, দল কিছু শাস্তি অবশ্যই বিধান করে, কিন্তু সে গেরস্থ সমাজের মতো নয়। কিন্তু যাযাবর রমণীরা বেশ্যা হতে কখনোই চায় না। সালমা সে কথাটাই বলে।

— আনন্দ তোকে বেশ্যা বানিয়ে রেখেছে।

— পিসি !

— তবে কি সে তোকে ঘরের বউ করবে ?

— আনন্দ আমাকে ভালোবাসে।

— ভালোবাসা ? বাজিকরের বেটিকে গেরস্থ মানুষ ভালোবাসলে তাকে বাজিকর হতে হয়। আনন্দ তোকে রাখনী করেছে। নেশা কেটে গেলে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

—কক্ষনো নয়।

নির্বোধ এই অল্প বয়সের মেয়েটার জন্য সালমার করুণা হয়। শেষবারের মতো বলে, দল এখান থেকে চলে যাবে ঠিক করেছে, তুই কি করবি ?

— আমি যাব না, আমি যাব না !

— বেশ।

সালমা চলে আসে এবং পীতেমের কাছে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। পীতেম দুঃখ পায়, কিন্তু এ অবস্থায় কি করণীয় তা স্থির করতে পারে না। সালমার কাছে বুদ্ধি চায় সে।

সালমা বলে, এখান থেকে উঠে চল।

পীতেম বলে, এত তাড়াতাড়ি ? এখানে রোজগার ভালো হচ্ছিল।

—তবে আর কি ? থাক। এরপরে মানুষ মেয়েলোকের জন্য ছাউনিতে হামলে পড়বে। তখন কি ক'রে সামলাবি ?

এসব শুধু কথার কথা। এসব ভাবনা বাজিকর ভাবে না। ছাউনিতে লোভী পুরুষ হামলে পড়লে ছুরি ঝল্‌কে উঠতে পারে। আবার কোনো ব্যভিচারিণী নিজেই তার প্রেমাস্পদকে ছাউনিতে নিয়ে আসতে পারে। পুরুষেরা এসব দেখেও না-দেখার ভান করতে পারে। দলের অন্য কেউ কিংবা বাপ মা-ও না দেখে থাকতে পারে, কিন্তু ভাইরা প্রায়শ গণ্ডগোল করে। বিষয়টি বিচিত্র বটে।

কিন্তু পেমার উপাখ্যানে অভিনবত্ব আছে। দলছাড়া যাযাবর মেয়েপুরুষ নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় দেখে। দলত্যাগ করার কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবে না। কিন্তু পেমা কি ক'রে এর ব্যতিক্রম হল ? পীতেম নিজের ভিতরেই এ প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়। গভীর চিন্তা করেও সে কোনোরকম সুরাহা করতে পারে না এ সমস্যার। শেষে নিজেকে একসময় তার অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অসমর্থ বোধ হয়। সে তখন সালমার কাছে আশ্রয় খোঁজে।

কিন্তু আশ্চর্য, এতেও সে পুরনো জায়গায় ফিরে আসে না। একসময় সালমা তার দেহের সান্নিধ্যে তাকে স্বস্তি ও উদ্যম দিতে পারত। এখন বয়স তার প্রয়োজনকে কমিয়ে দিয়েছে, কাজেই সে কিছুই ভুলে যেতে পারছে না। ফলে, সে চায় স্থিতি, যার অন্য নাম অর্থোপার্জন।

বাংলাদেশের বর্ষাকালের ভয়াবহতা সম্বন্ধে বাজিকরদের কোনো ধারণা ছিল না। যারা তাঁবুর নিচে থাকে, বর্ষা সব জায়গাতেই তাদের কাছে আতংকের। গোরখপুরে মাটির ঘরে বর্ষার কয়েকটা মাস ছিল আপাত স্বস্তির। কিন্তু গোরখপুর থেকে চির-কালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে আর একটি অনুরূপ বন্দোবস্তের কথা বাজিকর ভাবছিল প্রথম থেকেই। তারা চেয়েছিল এমন একটি জায়গা যেখানে সারা বছর ঘুরে বেড়াবার পর বর্ষার সময়টা অন্তত এসে বিশ্রাম মিলতে পারে। রাজমহলে এসে পীতেমের আশা হয়েছিল এখানে সেরকম একটা বন্দোবস্ত হতে পারে। চারপাশের জমি এখনো খালাস হচ্ছে, নতুন নতুন মানুষ বসতি করছে। যারা বন্দোবস্ত নিচ্ছে তারা প্রায় সবাই চাষী। জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তারা জঙ্গল কেটে, জমি সমতল ক'রে চাষের খেত বানাচ্ছে। কিন্তু বাজিকর তো আবাদ করে না, তাকে কে জমি দেবে?

তবুও এমন লোকও পাওয়া যায়। ঈশ্বরপুরের জমিদারির কিছু খাস ছিল রাজমহল পাহাড়ের গায়ে। জঙ্গলাকীর্ণ জমি। জমিদারের নায়েব শ্যামলাল মিশ্র সেইসব জমির পাট্টা বিলি করতে শুরু করল রাজমহলের কুঠিতে বসে। একেবারে নগদ কারবার। টাকা ফেলে চাষীরা পাট্টা নিযে নিচ্ছে।

খোঁজ পেয়ে পীতেমও গিয়েছিল। আগের দু-একবারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবারে কিছু তফাত ছিল। আগে দু-বার পীতেম এ ধরনের পাট্টা বিলিতে জমি নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয় নি। জমিদারের লোক জমি দিতে রাজি হয় নি। বাজিকর ঘুরে বেড়ানো জাত, তার কাছ থেকে খাজনা পাওয়ার কোনো স্থিরতা নেই।

কিন্তু শ্যামলাল মিশ্র এসব প্রশ্ন তুললই না। তার সম্পর্ক টাকার সঙ্গে। কাছারিতে সারাদিন মানুষের আনাগোনা। পত্তনিদার, দালাল, মোসায়েব, গোমস্তা সবরকমের মানুষ জমিপ্রার্থী চাষীর সঙ্গে চোটপাট করছে, পয়সা নিচ্ছে।

পয়সা খরচ ক'রে পীতেম পাঁচ বিঘা জমির পত্তনি পেল। পীতেম এবার পেল, কেননা, ঈশ্বরপুরের জমি নিলামের ডাকের মতো ডাক উঠিয়ে তবে বন্দোবস্ত হয়।

তারপর পত্তনি জমির দখল দেওয়ার পালায় কাছারির গোমস্তারা তাদের কেরামতি দেখায়। এসব মাপজোখ ভালো ভালো চাষীরাই বোঝে না, বাজিকরের তো প্রশ্নই নেই। জমি মাপার রশির কোনো স্থিরতা নেই। আর থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি। কাজেই হামেশা ষোল-সতেরো কাঠায় বিঘার প্রমাণ হয়। দশ বিঘার পত্তনি রশির মাপে বারো বিঘা দাঁড়িয়ে যায়।

পরতাপের এসব কাজে উৎসাহ বেশি। বহেরা গ্রামের কয়েক মাসের জীবনে সে

কি পেয়েছে কে জানে! গোমস্তা সীমানা নির্ধারণ ক'রে দিলে জমির চৌহদ্দিতে পরতাপ গর্ত ক'রে ক'রে পাথর বসায়। সেই পাথর ধারালো অস্ত্রে খোদাই ক'রে চিহ্ন রাখে।

পীতেম কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। সালমা ঠাট্টা করলেও সে হাসে। বলে, বর্ষার সময় তাঁবুর নীচ দিয়ে যখন নদী বইবে, তখন বুঝবি।

বর্ষা আসাব এখনো সাত-আট মাস দেরি। কাজেই পত্তনি জমিতে ধীরেসুস্থে ঘর তোলা যাবে, এবকম ভাবে পীতেম।

অন্যান্য বাজিকরদের মধ্যেও পরিবর্তনের ঢেউ আসে। পীতেম জানত না, গোপনে তার দলের অনেকেই ছোটখাটো মহাজনী কারবার শুরু করেছে। আশপাশের গ্রামের গরীব মানুষ, বিশেষত সাঁওতাল চাষী গেরস্থ ছাউনিতে আসছিল, নানা ধরনেব দাদন নিচ্ছিল। একথা পীতেম যেদিন জানতে পারল সেদিন সে খুব হেসেছিল। বলেছিল, বাহা, বাহারে রঘু! কি তোব কণ্ঠাব হাড়ের কিসমৎ!—আসলে এভাবে সে জিনিসটা সমর্থনই করছিল। আর এইভাবে নিজের ভিতরে সে দ্বিতীয় আর একটি সত্তাকে ক্রমশ স্পষ্ট ক'রে চিনছিল, যে-মানুষটা সঞ্চয় চায়, স্থিতি চায়, মর্যাদা চায় এবং সালমার "চল, বেরিয়ে পড়ি" কথাতে খুবই অবসন্ন বোধ করে।

বাজারের পাশের ময়দানে ধান ওঠার পরে কালীপুজো হয়। বিশাল কালীমূর্তি। আগে মূর্তি বানানো হয়, তারপর তার মণ্ডপ। সেই উপলক্ষে মেলা।

তখন রাজমহল পাহাড়ের উপব শীত জাঁকিয়ে নামে। পীতেমও তখন তার উৎসবের আযোজন করে। মাঠের একটা দিক বেশ ভালো ক'রে ঘিরে ফেলা হয়। সন্ধ্যার পর সেখানে অনেক আলো জ্বলে। বেশ খানিকটা দূরে দূরে বাঁশ পুঁতে মশাল জ্বালিয়ে একটা আলো-আঁধারি রহস্য তৈরি করা হয়। একপাশে মদের ভাঁটি বসে দু-তু'টো। মিষ্টি ও ভাজার দোকান বসে। মাঝখানের প্রশস্ত জায়গায় বাজিকর যুবক-যুবতীরা শারীরিক কসরৎ দেখায়। চারপাশের আলাদা আলাদা তাঁবুতে আলাদা আলাদা খেলা। কোনোটায় রঘু চণ্ডালের হাড়ের কেরামতি—নিমেষে টাকা দ্বিগুণ হচ্ছে, পিতল সোনা হচ্ছে। কোনোটায় নিছক ভানুমতি—যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় যুবতীর লম্বা বিনুনি মাথার উপর খাড়া হয়ে উঠছে সোজা হয়ে, আবার কোথাও নিমেষে গাছ থেকে ফল, ফল থেকে ফের গাছ তৈরি হচ্ছে। কোথাও বা বীভৎস নরকযন্ত্রণার মহড়া, যার বিষয়বস্তু বিশ্বাসহন্তার শাস্তি অথবা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কর্মফল। এইসব প্রযোজনায় একজন চতুর কথক থাকে, যে অতিক্রান্ত দক্ষ বক্তৃতাবাজিতে তস্করবৃত্তি, বিশ্বাসভঙ্গ, স্বজনগমন ইত্যাদি অনাচার, লোভ, হিংসা যাবতীয় উত্তেজক ও নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে অনর্গল কথা বলে যায়, অভিনয় করে যা গ্রাম্য মানুষকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে।

সবচেয়ে উত্তেজক ও রোমহর্ষক খেলা বালি বাজিকরের তাঁবুতে (যে খেলার কথা দর্শকেরা বৃদ্ধবয়সে অধস্তন পুরুষের কাছেও গল্প করবে)। বালি একখানা চওড়া

কাঠের পাটাতনের সামনে তার যুবতী বউকে চোখ বেঁধে দাঁড করিয়ে দেয়। চারপাশে তার মশালের আলো জ্বলে। দশ হাত দূর থেকে বালি অত্যন্ত দ্রুতলয়ে একের পর এক ধারালো ছুরি নিক্ষেপ করে ঐ কাঠের উপর তার বউয়ের শরীরের চারপাশে। এক একখানা ছুরি ছুটে যায় আর দর্শক শিউবে চোখ বন্ধ করে, তারপর আবাব চোখ খোলে, ততক্ষণে আরেকখানা ছুরি বিদ্ধ হযেছে নির্দিষ্ট জায়গায়।

পীতেম তার এই বড খেলায় মানুষ আকর্ষণ করে বিস্তর। শহর ও তার আশপাশের লোকেরা তো আসেই, আসে গঙ্গাঘাটের মহাজনী নৌকোর বাঙালি, মুঘল ও সাহেব ব্যবসাদারেরা, আসে কাছের ও দূরের গ্রামগঞ্জের মানুষ। সমস্ত মাঠে একটা মেলাব মতো আয়োজন চলে দশদিন ধরে। পীতেমের পযসা বোজগাব হয ভালোই। দলেব অন্য সবাইও ভালো রোজগার করে। এমনকি সালমাও তাব বাণিজ্য ভালোই চালায়।

এর মধ্যেই একদিন দয়ারাম আবার এসেছিল সালমার কাছে। সালমার ওষুধে যে একেবারেই ফল ফলে নি সেকথা জোর দিয়ে দযারাম বলতে পাবে না। তবে কিনা আরো একটু দ্রুত ফল সে চায।

সালমা মোহিনী হাসে। দয়ারাম প্রগলভ হয। গলা কাঁপে তাব। তারপব সে ফিসফিস ক'রে করুণ আর্তি জানায ভানুমতি, একটা উপায ক'বে দেও। অনেক টাকা দেব তোমায। সে হাত ধবে সালমার।

সালমা হাত ছাডিযে নেয। কপট দুশ্চিন্তায বলে, ভকত, বড কঠিন ব্যাপার। মানুষ ঠকিয়ে অনেক পয়সা করেছ, সময়মতো ভোগ-আহ্লাদে মন দেও নি, এখন মনে হচ্ছে ঠকে গেছ, নয় ?

—ভানুমতি, পয়সার তো অভাব নেই ! কিন্তু এত তাড়াতাডি যে সব শেষ হয়ে যাবে, ভাবি নি।

—কি ক'রে এত পয়সা করলে, ভকত ?

—আঃহা, কি ক'রে পয়সা করলাম, না ? এই জংলীর দেশে পযসা করতে হলে কিছু বুদ্ধি লাগে শুধু। আর কিছু নয়। করবে তুমি পয়সা ? শিখিয়ে দেব ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দু-একটা কৌশল শেখাও তো !

দয়ারাম এই বিষয়ান্তরেও সমান উৎসাহ পায়। সারাজীবন ধরে পয়সা রোজগারই তার প্রধান নেশা। পয়সাব আলোচনাও তার ভালো লাগে।

সে বলে, ভানুমতি, এই দেখ শ্যামলাল নায়েবকে কেমন জমিদার বানিয়ে দিলাম। কত পয়সা কামালো লোকটা। অবশ্য আমাকেও সিকি ভাগ দিয়েছে, কারণ কি, বুদ্ধিটা তো আমার !

—শ্যামলাল নায়েবকে ? কি বুদ্ধি দিলে ?

—কি বুদ্ধি দিলাম ? দেখছ জমির কেমন টান এখন মানুষের ? আর শ্যামলাল বহুদিন ধরে নায়েবি করছে, এখন এই শেষ বয়সে একটু আরাম করতে চায় নিজে

জমিদার হয়ে। তা সেজন্যই আমার কাছে এসেছিল। পুরানো বন্ধু লোক আমার। রাজমহল পাহাড়ের তিন হাজার বিঘা জমির পাট্টা বিলি হল আর মন্দার পাহাড়ের নাবালেও, তা কম ক'রে আরো পাঁচ-ছ' হাজার বিঘা জমির পাট্টা বিলি হল। ভালো সরেস জমি সব। দাম যা পেয়েছে তাতে জঙ্গীপুরে দেখ গিয়ে কেমন জমিদারী কিনে বসেছে।

—নায়েব জমি বিক্রির টাকা মেরে দিয়েছে? জমিদারকে দেয় নি?

—অঃ হা হা হা! মজা তো ঐখানেই। তোমরা বাদিয়া লোক, জমির বেপারে কিছুই বোঝ না। আবে জমি বিক্রি নয়, শ্যামলাল শুধু পাট্টা বিক্রি করেছে। আর কার জমি কে পাট্টা বিলি করে দেখ।

দয়ারাম প্রচুর উপভোগের হাসি হাসে। সালমার কান তীক্ষ্ণ হয়, চোখের দৃষ্টি খর হতে সে নিজেকে শাসন করে। এই পাট্টা বিলির সঙ্গে বাজিকরেরাও যে জড়িত একথা দয়ারাম নিশ্চয়ই জানে না। জানলে এত আবেগ নিয়ে নিজের বুদ্ধিমত্তার কথা কখনোই বলত না, একথা সালমা বোঝে। সে মুখে কৌতুকের ভান করে। বলে ব্যাপারটা একটু খোলস ছাড়িয়ে বল তো, ভকত যাতে বুঝতে পারি।

দয়ারাম আকর্ণ হাসে। বলে, দেখ ওই পাট্টা সব ভুয়া পাট্টা। ওতে জমিদারের দস্তখৎ নেই, নায়েবেরও দস্তখৎ নেই। শ্যামলাল চাকরি ছাড়ার পর ঈশ্বরপুরের জমিদার ব্যাপারটা জেনেছে। মন্দার পাহাড়ের জমি এর মধ্যেই লাঠিয়াল দিয়ে জমিদার আবার দখল নিয়েছে। রাজমহলেও দেখ না ক'দিনের মধ্যেই কেমন ধুন্দুমার লাগে।

- পাট্টাতে দস্তখৎ নেই?

- তবে আর বলছি কি?

সালমার মুখ নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। বলে, হাজার লোকের সঙ্গে এভাবে বেইমানী করলে?

—পয়সা কি আর এমনিতে হয় সুন্দরী? পয়সা এমনি করেই হয়।

দয়ারাম আবেগে সালমার চিবুক নাড়িয়ে দেয়। সালমা ঝটকা দিয়ে হাতটা সরাতে গিয়ে নিজেকে সামলায়। চেষ্টা ক'রে হাসে। তারপর বলে, সত্যি বাবা, তোমার বুদ্ধিও বটে!

—সবই আছে ভানুমতি, শুধু এক জায়গায়ই ঘাটতি। এখন শুধু তোমার করুণা।

সালমা উঠে গিয়ে ঝোলানো বাঁশের ভাঁড় নিয়ে আসে। ভাঁড় থেকে মদ ঢেলে দয়ারামের সামনে ধরে। বলে, খাও।

দয়ারাম বলে, খাব? বল কি? আমার যে কণ্ঠি!

—আরে খাও, খাও, ভকত। কতদিন আর নিজেকে শুকিয়ে রাখবে?

সালমা নিজে গলায় পানীয় ঢালে। বিস্বাদ পানীয়, মুখ কুঁচকে ঢোক গেলে সে।

দয়ারাম বলে, তবে খাই?

সালমা ধমকের সুরে বলে, খাও।

দয়ারাম মদ পান করে। বলে, তোমার হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছি, ভানমতি। এখন তুমিই ভরসা।

খানিক সময় নিশ্চুপে যায়। দু'জনের রক্তেই আস্তে আস্তে নেশা লাগে। দয়ারামের মদের নেশা নেই। ফলে, অতিদ্রুত তার উত্তেজনা বাড়ে। প্রগলভ হাসিতে তার ঠোঁট বেঁকে যায়।

—এ কি ওষুধ দিলে, ভানমতি, শরীর যে টানটান লাগে?

সালমা বলে, ও কিছু নয়, ভকত, ও শুধু আরকের নেশা। নেশা কেটে গেলে আবার পুরানো মানুষ হয়ে যাবে।

—তাহলে নেশা কেটে দরকার নেই, ভানমতি, দেও আনাকে আরো নেশা দেও।

সে আরো পান করে। দয়ারাম এরকম উত্তেজনা জীবনে ভোগ করে নি। সে এবার ফিসফিস ক'রে বলে, ভানমতি, একটু সুখ দেও আমাকে, একটু সুখ।

সালমা বলে, ওখানে চুপ ক'রে বস ভকত, আমার কথা শোন। তাকৎ যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে একটাই উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুমি পারবে?

—পারব, পারব!

—এসব বানজারা-বাজিকরের গুপ্তবিদ্যা, তোমাকেই শুধু শিখিয়ে দেব। মন দিয়ে, শোন।

দয়ারাম উত্তেজিত মস্তিষ্কে যথাসম্ভব একাগ্রমনে সালমার নিদান শোনে। না তেমন কিছু অসম্ভব মনে হয় না তার। এ আর এমন কি কঠিন বেপার? খুব পারব, খুব পারব, ভানমতি।

সালমা কিছু শিকড়বাকড়ও দেয় তাকে। তারপর একজন লোক দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

পাট্টা বন্দোবস্তের টাকা শ্যামলাল মিশ্র ও দয়ারামই শুধু খায় নি, খেয়েছিল আরো অনেকে। শ্যামলাল এবং পাট্টাপ্রাপ্ত প্রজাদের মধ্যে ইজারাদার, দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার ইত্যাদি মধ্যবর্তীরাও ছিল। এ ছাড়াও ছিল সেরেস্তার গোমস্তা, তশীলদার ইত্যাদি আমলারা। যেসব জমিতে কোনোরকম জলের আয় আছে সেখানে বুভুক্ষু চাষীরা যেমন করেই হোক কলাই কিংবা তৈলবীজের চাষ করেছে। সেসব ফসল এখন সবে লকলকিয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময়ই কোনোরকম সাবধানতা না জানিয়ে ঈশ্বরপুরের জমিদারের লাঠিয়ালেরা সেই সব চাষীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেননা, নিয়মটা এমনই। দখল কিংবা বেদখল করতে হলে আচমকা সন্ত্রাস ছড়াতে হয়। জমি নিয়ে যাদের কারবার তারা এসব জানে।

কাজেই প্রথম চোটেই যে দু-চারজনের লাশ পড়ে তারা জানতেই পারে না তাদের অপরাধটা কি। ভুয়া পাট্টা-প্রাপ্ত কৃষিজীবীরা খবর পেয়ে এরপর লাঠি বল্লম নিয়ে এসে কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সে অল্প কয়েকজন মাত্র এবং তারাও শুধুমাত্র তাদের সর্বস্ব যাওয়ার কথাই চিন্তা করেছিল, আর কিছু নয়। কাজেই তাদের প্রতিহত করা আক্রমণকারীদের বিশেষ অসুবিধার ছিল না, বরং এতে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। ফলে এরপর আক্রমণ হয় আশপাশের গ্রামে এবং লাঠিয়ালেরা মাইনের উপরে ফাউ হিসাবে কয়েকশো গরু-মোষ ধরে নিয়ে চলে যায়।

পীতেম ও অন্য বাজিকরেরা দূরের থেকে এসব ঘটনা শুধু লক্ষ করেছিল, কোনোকিছু করার চেষ্টা করে নি। তারা অবশ্যই আগে থেকে এসব জানত। সালমা-দয়ারাম সংলাপ কারো কাছেই অজ্ঞাত ছিল না। সালমা আর একবার শুধু পীতেমকে অন্তরটিপুনি দিয়েছিল গেরস্থ হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দিয়ে।

পীতেম ভয়ানক দমে যায় এই ঘটনায়। চাষীদের নালিশই কেউ শুনছে না, কাজেই বাজিকরকে আর কে পাত্তা দেয়! যাযাবরের নালিশ কেউ গ্রাহ্য করে না, একথা যাযাবরের থেকে আর বেশি কে জানে? সুতরাং পীতেম বিষয়টা একেবারে হজম ক'রে ফেলে, এ নিয়ে আর দ্বিতীয় বার কথা তোলার অধিকার দেয় না কাউকে। এমন কি যখন মহী কর্মকার নামে একজন মানুষ গোপনে তার কাছ থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায় তখনো সহসা মুখ খোলে না পীতেম। মহী তার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল তারা কত টাকা দিয়ে কতটা জমির পত্তনি নিয়েছিল। জানতে চেয়েছিল, এই জমি পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে তারা রাজি আছে কিনা, কিংবা অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে কি না।

পীতেম দেওয়ালের মতো মুখ ক'রে বলেছিল, না। এ সম্পর্কে আর কোনো আলোচনাই করতে সে রাজি হয় নি। কর্মকার মানুষটা এক সাহেব ডাক্তারের চাকর ছিল এককালে। সে খানিকটা লেখাপডা, নতুন আইনকানুন সম্পর্কে সামান্য কাণ্ডজ্ঞান এবং সরকারী মহলে ক্ষীণ একটা যোগাযোগ ইত্যাদির ভিত্তিতে কিছু চেষ্টা চালাতে চাইছিল, যাতে এই পাহাড়প্রমাণ অবিচারের কিছু সুরাহা হয়। পীতেমের বাস্তব অবস্থা, সে নিজে হতাশ হলেও, বোঝে এবং বলে যায় যে, যদি সফল হয় বাজিকরদের ভুলবে না। একথা শুনেও পীতেমের মুখের কোনো ভাবান্তর হয় নি।

মহী কর্মকার শেষ পর্যন্ত খুন হয়েছিল। কিন্তু তার আগে কালেক্টর হ্যাচ সাহেবকে এ ঘটনার প্রতিকারের ব্যাপারে সে খানিকটা সচেষ্ট করতে পেরেছিল।

প্রজাদের নালিশ শুনে কালেক্টর হ্যাচ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের ক'রে জঙ্গীপুর থেকে শ্যামলাল মিশ্রকে গ্রেপ্তার করেও মুর্শিদাবাদে আনে। তারপর মোকদ্দমা উঠল তার নামে। কিন্তু চতুর শ্যামলালকে বাগে আনা এত সহজ হল না। টাকা দিয়ে সে হ্যাচের সহকারীদেব হাত করল। তার উপরে বড কথা, ঈশ্বরপুরের জমিদারের রাজস্ব বাকি পডেছিল পরপর দু' সন। যদিও এর কারণ শ্যামলাল নিজে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে প্রমাণ করতে পারল বকেয়া রাজস্ব জমিদারের খেয়াল-খুশিতেই রাজ-সরকারে জমা হয় নি, সে নির্দোষ। হ্যাচের সহকারীরা গোপনে লাটসাহেবের কাছে কালেক্টরের বিরুদ্ধে চিঠি দিল। হ্যাচের বিরুদ্ধে রাজস্ব আদায়ের গাফিলতির নালিশ ছিল। হ্যাচ কিন্তু খুব দমবার পাত্র ছিল না। মুর্শিদাবাদ থেকে শ্যামলালকে সে ভাগলপুর নিয়ে গিয়ে মামলা স্থানান্তর করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শ্যামলাল বেকসুর খালাস পেয়ে জঙ্গীপুরে জমিদারী করতে ফিরে গেল। এর পরে কয়েকদিনের মধ্যেই মহী কর্মকার খুন এবং তার বাডি ঘর লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়।

এসব নজীর সালমা খুবই নির্মোহভাবে পীতেমকে দেখিয়েছিল। পীতেম তবুও রাজমহল ছেডে যাবার কথা ভাবতে পারছিল না। তার ভিতরে যেন জডত্ব এসে গিয়েছিল। আগে সে সালমাকে বলেছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই বর্ষা আসছে। তাঁবুর নিচ দিয়ে যখন নদী বইবে, তখন আমার কথা বুঝবি।

জলকে বড ভয় যাযাবরের। তাই বর্ষা আসার আগে, পীতেম ভেবেছিল, পাহাডের ঢালে দুঃসময়ের স্থায়ী ঘর তুলতে পারবে। দল না হয় ঘুরলই সারা দুনিয়া, কিন্তু অসময়, বর্ষা এবং দলের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য থাকলই না হয় একটুকরো আশ্রয়। এসব সালমা বোঝে না। অধিকন্তু পক্ষপাতদুষ্ট আরো সব ঘটনা ঘটতে থাকে যা পীতেমকে বেশি বেশি ক'রে আহত করে। সালমার যুক্তির কাছে সে দাঁড়াতেই পারে না। আসলে, সালমা তো কোনো যুক্তি বিশেষ দেখায় না! শুধু ইঙ্গিত দেয় সে, শুধু ছোটখাটো দু-একটা মন্তব্য করে। সে-ই বা কী করে, ঘটনা যে ঘটছেই!

যেমন লক্ষ্মণ সোরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বালির। শুনে পীতেম অধোবদন হয়েছিল অনেকক্ষণ। বিস্তারিত বিবরণ জানতে চায় তার অনেক পরে। হায় রে হায় ঐরকম মানী লোকের হাতে হাতকড়া, পায়ে শেকল। কেন, কেন রে বালি? কবা তার দোষ?

বালি দেখেছিল শৃঙ্খলিত লক্ষ্মণকে আমগাছির হাটে। সে হাটে তো সাঁওতাল মানুষই বেশি? তবে? হ্যাঁ, হাট সেদিন থমথমা ছিল। কালো কালো মানুষগুলো বোবা হয়ে ছিল। মদের ঠেকে, তাড়ির গদিতে, মোড়গ-লড়াইয়ের জুয়ায় জনপ্রাণী নেই। হাটের বিক্রিবাটাও যেন বন্ধই। একটা পিপুল গাছের নিচে দারোগা বিশ্রাম করছিল। দু'জন চৌকিদার দু'টো ঘোড়াকে দানাপানি দিচ্ছে। একপাশে ক্লান্ত অবসন্ন এবং শৃঙ্খলিত লক্ষ্মণ আধশোয়া। পাথরের মতো মানুষটার শরীর যেন হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। শিকলের ঘষায় পায়ে লাল দগদগে ঘা। মাছিও তাড়াতে পারছে না লক্ষ্মণ। গাছটা থেকে বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে মানুষের ভিড়, যার মধ্যে অধিকাংশই সাঁওতাল। লক্ষ্মণ তাদের দিকে তাকিয়েছিল অথচ দৃষ্টি তার অনির্দিষ্ট। সিপাইরা মাঝেমাঝেই ভিড় দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

বালি ভিড়ের ভেতরে নিজেকে গুপ্ত রেখে এসব দেখছিল। হঠাৎ একজন যুবক ভিড় ঠেলে দৌড়ে লক্ষ্মণের কাছে যায় এবং তার হাঁটু দু'হাত দিয়ে ছোঁয়, হাঁটুতে মাথা রাখে। একজন সিপাই ঘাড় ধরে তাকে ছিটকে ফেলে এবং ঠেলে দূরে সরিয়ে চড়চাপড় মারে। আর কেউ এগোয় না। হঠাৎ লক্ষ্মণ উঠে দাঁড়ায়, তার শিকলে আওয়াজ হয় ঠনঠন ক'রে। তার বুক ঘন ঘন ওঠা-নামা করতে থাকে। সে আচমকা চিৎকার ক'রে ওঠে, আমি দেখতে চাই এই দারোগার কত শিকল আছে। আমি দেখতে চাই এই দারোগা সমস্ত সাঁওতাল জাতকে শিকল দিয়ে বাঁধতে পারে কি না।

দারোগা একটু সতর্ক হয়। সিপাইরা লাঠি তুলে ভিড়ের কাছাকাছি গিয়ে হম্বি-তম্বি করে। মানুষ দূরে সরে যায়। তারপর দারোগা এবং বড় সিপাই ঘোড়ায় ওঠে, অন্যরা লক্ষ্মণের কোমরের শিকল ধরে টেনে নিয়ে যায় শহরের পথে।

হাট তারপরে আর জমে নি। মানুষ ক্রমশ সরব হয়ে দলে দলে ফিরে যেতে থাকে। শুধুমাত্র লক্ষ্মণের হাঁটুস্পর্শকারী সেই যুবক গাছটার নিচে একাকী অনেকক্ষণ বসে থাকে।

ফাঁক বুঝে বালি একসময় তার কাছে যায় এবং পাশে বসে। যুবকটি প্রথমে চমকে ওঠে, তারপর বিরক্ত হয়।

– কি চাই?

– কিছু চাই না, ভাই। পারগানার বাড়িতে আমরা একবার কুটুম হয়েছিলাম। তাই ঘটনাটা একটু জানতে চাই।

– ও, তোমরা সেই বাজিকর?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আর কি জানতে চাচ্ছ ? এসব ঘটনার গোড়ায় তো তোমরাই।

—হ্যাঁ, বহেরায় থাকতে অঘ্রান মাসে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল বটে, কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি ? তোমরা ঝামেলা না করলে আজ—

—না, ভাই, পারগানা কিন্তু এমন কথা বলে নি। মানুষ তোমাদের ঠকিয়ে খায়, তোমরা বাধা দেও না। আমরা বাধা দিয়েছিলাম, তাও তো মুখে।

—তাই বা করতে গেলে কেন ?

বালি ম্লান হাসে। বলে, আরে ভাই, অন্যায় আমাদের হয়েছে, মানছি। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ওদের বাধতই। এক্ষেত্রে আমরা শুধু নিমিত্ত হয়েছি।

যুবকটি অন্যদিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করে খানিকক্ষণ। তারপর বলে, হয়ত ঠিকই বলেছ। পারগানাও এমন কথাই বলত।

তারপর,বালি তার কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ শোনে। পতিত সাউ মিথ্যাই শাসিয়ে আসে নি। বরং এই ঘটনায় তার লাভই হয়েছিল। কেননা লক্ষ্মণকে দাদন নিতে হতো না অন্যদের মতো। বহেরাতে পারগানা লক্ষ্মণই ছিল দাদনের ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম থাকলেই সে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং লক্ষ্মণ পারগানা হিসাবে তা করতও। তাছাড়া বহেরার বাছাই জমি ক'খানাও ছিল লক্ষ্মণের পরিবারের বিভিন্ন জনের হাতে। এই জমির উপরেও পতিত সাউ এবং তার সহব্যবসায়ীদের লোভ ছিল। কাজেই এই সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাইল না। তারা ভালো ক'রে জানে সাঁওতাল জাত বড় নিরীহ জাত। ফুর্তিতে থাকতেই তারা পছন্দ করে। মন ভারাক্রান্ত হয়, ঝামেলা হয়, কিংবা রক্তপাত হয় এমন কাজে তাই তারা মোটেই থাকে না। উত্তেজনা সঞ্চয় ক'রে রাখে শিকার খেলার জন্য, নাচগান ও নেশার জন্য। এসব পতিত সাউরা ভালমতোই জানত। কিন্তু এই পারগানা কিছুটা যেন অন্য ধাঁচের মানুষ। অনের কিছুই বুঝত এবং যা বুঝত না তাও তলিয়ে দেখতে চাইত। লক্ষ্মণ সোরেনই গ্রামের প্রথম ব্যক্তি যে ওজন ও পয়সার হিসাব বুঝতে শেখে। সুতরাং প্রতিপক্ষের কাছে সে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

আর ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ বহন ক'রে আনল এক বাজিকরের ছোকরা। পতিত সাউকে হিসাব বোঝাতে গেল! পতিত সাউ দারোগাকে কেনে, দারোগা পতিত সাউকে কেনে। কি বা মোকদ্দমা, কে জানে রে ভাই ? পারগানা জানতেই পারল না, অথচ তার ধান চাল গরু মোষ সব ক্রোক হয়ে গেল! 'হায় রে, হায় রে, কোন লোহারে বানাল এ শিকল ? ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার দারোগা টাপ টাপ যায়।'

এ কাহিনী শুনে পীতেম বিষাদগ্রস্ত হয়। আহা রে এমন মানুষ, এমন মর্যাদাবান মানুষ! কোনো বাজিকর যা কোনোদিন পায় নি, লক্ষ্মণ পীতেমকে তাই দিয়েছিল। লক্ষ্মণ দিয়েছিল সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার। এমন কি সালমা পর্যন্ত চুপ ক'রে থাকে। বহেরার সব মানুষ তাকেও জোহর করেছিল এক অপরিচিত অথচ সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে।

আর সেই মানুষ! অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ বসে থাকে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে দু'জনকেই ঢেকে দেয়। তখন সেই অন্ধকারেব মধ্যে সালমা বলে, হাজাব নাগ-নাগিনী আসছে মানুষকে গিলে খাবার জন্য। কি তাদের হিসহিস শব্দ! তাদের জিভ লক লক করে। তাদের চোখ থেকে আগুন বের হয়! পীতেম, এ দেশ থেকে পালিয়ে চল।

১১

যেমনটি সালমা এবং অন্য বাজিকরেরা আশা করেছিল ঠিক তেমনটিই হয়। পেমার তলপেট যত স্থূল হতে থাকে আনন্দের আসা-যাওয়াও তত কমে। তারপর পেটের চামড়া যখন একেবারে টানটান হয়ে নাভিকে পর্যন্ত সমতল ক'রে দিল, তখন আনন্দর আসা একেবারেই বন্ধ হল।

আর মালিকের পছন্দ-অপছন্দ সব থেকে আগে বোঝে চাকরবাকরেরা। পেমার দেখাশোনার জন্য যে দু'জন চাকরানী ছিল, প্রথমে তারা তাকে অবহেলা দেখাতে শুরু করে, তারপরে অবাধ্য হতে থাকে এবং সবশেষে অপমান করতে শুরু করে।

সালমা যখন আকারে ইঙ্গিতে এসব কথা বলেছিল তখন যে পেমা বোঝে নি এমন নয়। সে বয়সে নিতান্ত বালিকা হলেও সালমা বলার আগেই সে এসব চিন্তা করেছিল। কিন্তু এসব চিন্তাকে আমল দেওয়ার কোনো কারণ সে তার যাযাবরী রক্তে খুঁজে পায় নি। সালমা যা চিন্তা করেছিল তা হল, বয়সের অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতায় মানুষ পেমার মতো অপরিণামদর্শী যুবতীকে মূর্খ মনে করে। বয়সের অভিজ্ঞতা ও তজ্জনিত উপলব্ধি অন্য একটা বয়সের আবেগ এবং উপলব্ধিকে তির্যকভাবে দেখে। সালমা যখন পেমাকে সাবধান করে তখন সে নিজের যৌবনের কথা, তার মায়ের যৌবনের কথা, সবই ভুলে থাকে।

তাছাড়া পেমা প্রেমে উন্মাদ হয়েছিল। আনন্দর রাজকীয় চেহারা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যতদিন সে দলে ছিল সেই ক'দিনের গোপন অভিসার তার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। আর এখন যে সমস্যা, তার সমাধান এখনই করতে হবে। এসব আগে থাকতে কিছুতেই স্থির করা যায় না। আনন্দর অদর্শনে সে কষ্ট পায়, কাঁদে এবং পরিচারিকাদের অনুরোধ করে, ঘুষ দিয়ে আনন্দকে ডাকতে পাঠায়।

আনন্দ বিরক্ত হয়ে আসে, সামান্য সময় বসে কিন্তু কথাবার্তার বিশেষ উত্তর দেয় না। পেমা আহত এবং অপমানিত বোধ করে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়।

তারপর বহুদিন আনন্দ আসে না। পেমা বারবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও আসে না। খরচ-পত্তরও নিয়মিত পাঠায় না সে। দু'জন পরিচারিকার একজন এবং দারোয়ান চলে যায় কোন অজ্ঞাত নির্দেশে। বস্তুত, আনন্দ আর এই আয়োজনের অর্থও খুঁজে পায় না। এ কথা ঠিক, এই বিদেশী মেয়েটা তাকে অস্বাভাবিক নেশাগ্রস্ত করেছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে। এসব নিয়মে নেই। তবুও একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারছে না আনন্দ। সামান্য একটা দুর্বলতা এখনো রয়েছে তার।

শেষ পর্যন্ত পেমা তার পরিচারিকাকে শেষ বারের মতো আনন্দের কাছে পাঠায়। বলে দেয়, যদি সে না আসে, তাহলে আমিই তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হব, এ কথা মনে রাখে যেন।

সুতরাং আনন্দ আসে। এবার শুধু বিরক্ত নয়, ক্রুদ্ধও সে। বলে, কি ব্যাপার, তুই যে বিয়ে করা মাগের মতো দাবি করছিস ?

—এখানে আস না কেন ?

—এখানে এসে কি হবে ? আমার আর কাজকর্ম নেই ?

—তা বলে একেবারেই আসতে পার না ?

—তোর যদি এখানে ভালো না লাগে, তাহলে দলে ফিরে যা।

- তার মানে ?

—তার মানে, তোকে যে সারাজীবন পুষতে হবে এমন কি কথা আছে ?

—সে কথাই তো ছিল।

—না, সে কথা ছিল না, আর তোকে আমি ডেকে নিয়ে আসি নি। তুই নিজেই এসেছিস। আমার এখন অন্য কাজ আছে, এসব ঝামেলা আর পোয়াতে পারব না, বুঝলি ?

পেমা দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে। চিৎকার ক'রে বলে, বেইমান, এখন আমাকে চলে যেতে বলছিস, তো, এটার কি হবে, এটার ?—সে তার পেটের উপর চড় মারতে থাকে উন্মাদের মতো। জঠরের শিশু মোচড় মেরে ওঠে। পেমা অস্বস্তি ও যন্ত্রণায় মাটির উপরেই বসে পড়ে।

আনন্দ বলে, ওটার আমি কি জানি ? বাজিকরের ছাউনিতে অমন বেজন্মা অনেক আছে। আজই এ ঘর খালি ক'রে দিবি।

পরিচারিকাকে ডেকে আনন্দ বলে, এ যদি সন্ধ্যার মধ্যে ঘর ছেড়ে না যায় তবে ঘাড় ধরে বের ক'রে দিবি। না হলে, তোদেরই তাড়িয়ে দেব, মনে রাখিস !

পেমা লাফিয়ে উঠে ক্ষিপ্তের মতো আক্রমণ করে আনন্দকে। দাঁতে নখে ঘায়েল করতে চায় সে। সঙ্গে অশ্লীল গালিগালাজ।

আনন্দ বলশালী পুরুষ। এক হাতে পেমার আক্রমণ সামলে অন্য হাতে মুখের উপর আঘাত করে বারবার। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

পেমা দরজার উপরে থুথু ছিটায়, মা-বাপ তুলে খিস্তি করে, কাঁদে, তারপর বিছানার তলা থেকে একখানা ছুরি ঝট্ ক'রে টেনে বের করে। বাজিকরের কামারশালার তৈরি ছুরি, মাথা ভারী, বাঁট ছোট। সে ছুটে যায় দরজার দিকে। পরিচারিকা তাকে আটকাতে সাহস পায় না।

আনন্দ তখন উঠোনে তার ঘোড়ার কাছে। পিছনের চিৎকারে সে কান পাতে না। তীক্ষ্ণ চিৎকার ক'রে পেমা ছুরি ছুঁড়ে মারে। ছুরিটা বিদ্যুৎ গতিতে আনন্দকে পাশ কাটিয়ে ঘোড়ার পিছনের নরম মাংসে বিদ্ধ হয়। ত্রাসে আনন্দ পিছন ফিরে তাকায়

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিপ্ত ঘোড়ার পিছনের পায়ের চাট খায় পরপর দু'বার। একটি আঘাতে তার মাথার খুলির খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে যায়, সে সেখানেই পড়ে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত পেমা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর পরিচারিকার চিৎকারে তার চমক ভাঙে। আনন্দর দেহটা ছটফট ক'রে এখন স্থির হয়ে আছে। ঘোড়াটা দড়ি ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। ভয়ংকর চোখে পেমা অপর স্ত্রীলোকটির দিকে এগোয়। তার যাযাবরী রক্ত এবং ইন্দ্রিয় এবার পুরোপুরি ক্রিয়াশীল। স্ত্রীলোকটি ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ছুটে যায় চিৎকার করতে করতে।

পেমা তারপর দ্রুত তার অলংকার ও টাকা-পয়সা নিয়ে রাস্তার বেরিয়ে আসে। তার গন্তব্য এখন পীতেমের ছাউনি। যাযাবর কি দলছাড়া বাঁচতে পারে?

•

পেমা যখন ছাউনিতে পৌঁছায় তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। দলের কেউ কেউ তাকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসতে দেখে, কিন্তু কথা বলে না। পেমা সালমার ছাউনিতে গিয়ে ঢোকে।

সালমা তাকে লক্ষ করতে থাকে কিন্তু কিছু বলে না। পেমা বসেও তার অস্থিরতা দূর করতে পারে না। অবশেষে সালমা বলে, কি হল?

—আনন্দ খুন হয়েছে।

—কি ক'রে?

পেমা সবকিছুই বলে। সালমা ধৈর্য ধরে শোনে, কোনোরকম অধীরতা দেখায় না। তারপর পেমাকে ছাউনিতে রেখে সে পীতেমের কাছে যায়।

১২

শীত শেষ না হতেই সে বছর হাওয়া উঠেছিল দুরন্ত। সূর্য যত চড়া হতে থাকে হাওয়াও বাড়তে থাকে। ফাল্গুন মাসে এত তাপ কেউ কখনো দেখে নি।

হাটে-বাজারে ফসল আসছিল অজস্র, কিন্তু নিমেষে সে সব উধাও হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সারাদিন হাজার হাজাব মন মাল, যার প্রায় সবটুকুই খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ। সে সব নৌকোয় বোঝাই হয়। এ ছাড়া চালান যায় রেশম ও তাঁত-বস্ত্র। এত অজস্র উপকরণ, তবু মানুষ ধুঁকছে। রেশম, তাঁত, ধান, নীল প্রভৃতি সমস্ত উৎপাদন প্রচুর পরিমাণ দাদনের আওতায়। রাজকর্মচারীরাও ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রচুর দাদন খাটাচ্ছে। গঙ্গার ওপাবে মালদার কালেক্টরের সঙ্গে লবণ ও বস্ত্রব্যবসায়ী সাহেবদের বিরোধ বাধে। কতকগুলো লবণের নৌকো বিভিন্ন জায়গায় জমিদারেরা আটকে দিয়েছিল। তাদের দাবি জমিদারকে খাজনা না দিয়ে জমিদারীতে লবণের ব্যবসা করা চলবে না। আবাব অন্য এক জায়গায় দাদন নেওয়া তাঁতী-দেব উপর জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করলে ব্যবসায়ী সাহেবরা কালেক্টরের উপর এসবের জন্য কৈফিয়ত ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কোন সাহেব কত ক্ষমতাশালী, কালেক্টর বড না ব্যবসাদারেরা বড এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন জায়গায়। সেই সব বিরোধ কলকাতা পযন্ত গড়ায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোম্পানির কর্তারা কালেক্টরকেই অপদার্থ প্রতিপন্ন কবে। কালেক্টরের সবচেয়ে বড ত্রুটি রাজস্ব আদায়ে ধরা পড়ে। এ এমনই একটি কাজ যাতে কোনো কর্তৃ-পক্ষকে কখনো খুশি করা যায় না।

এ-ছাড়া স্থানে স্থানে ছোটখাটো প্রজাবিদ্রোহ লেগেই আছে। আছে ছোট বড জমিদার ও তাদের নায়েবদেং হাতে আইনের ব্যাপারে কালেক্টরের নাস্তানাবুদ হওয়ার নানারকম ঘটনা। সবার উপরে সমস্ত দামিল-ই-কো, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি জায়গার সাঁওতালদের সংঘবদ্ধতার খবর।

প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন গুজব ছড়ায়। যে কথা সালমা একদিন ঘোরের মধ্যে উচ্চারণ করেছিল, কি ক'রে যেন সেটা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। হয়ত সালমা আরো কারো কাছে কথাটা বলেছিল। এখন সে কথা সাঁওতাল গ্রামে মুখে মুখে ফেরে। হাজার হাজার নাগ-নাগিনী উড়ে আসছে। তাদের নিশ্বাসে বিষ। সেই বিষ-নিশ্বাসে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এসব কথা মানুষ বিশ্বাস করত।

বাজিকরের ছাউনিতে এখন ঘোর দুর্দিন। চতুর্দিকে এত বিশৃঙ্খলা যে দল আর এখানে-সেখানে ঘুরে, খেলা দেখিয়ে বিশেষ কিছু রোজগার করতে পারছে না। যে যার সঞ্চয় খেয়ে শেষ করছে। অথচ নতুন রাস্তায় পা বাড়াতেও সাহস করছে না।

সালমা যখন পীতেমের কাছে এসে পেমা-আনন্দ বৃত্তান্ত বলে, তখন সে আশা করেছিল, পীতেম বোধহয় এবার তার প্রস্তাবে রাজি হবে। সে প্রস্তাব দিয়েছিল, সেই রাত্রেই পালিয়ে যাবার। সে ভেবেছিল, বাপ হিসাবে পীতেম হয়ত পেমাকে বাঁচাবার কথা ভেবে তার মতে সায় দেবে। কিন্তু পীতেম রাজি হয় নি। সে গৃহী মানুষের মতো আতংকিত হয়েছিল। কোথায় যাব পালিয়ে? কোম্পানির রাজত্বে পালাবার জায়গা নেই। গর্ত ক'রে ঢুকে থাকলে বেত-আঁকড়া দিয়ে সেখান থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে আসবে।

কাজেই সে জানকীরামের অপেক্ষায় ছিল। জানকীরাম আসে নি। কিন্তু অন্য পুলিশ এসে বাজিকর ছাউনি তছনছ করেছিল। পীতেম, ধন্দু, পরতাপও গ্রেপ্তার হয়েছিল পেমার সঙ্গে। অত্যাচার চলেছিল সারারাত ধরে। পীতেম কিংবা কেউই জানত না এ সমস্যার সমাধান কোন পথে।

সমাধান পেমাই ক'রে দেয়। চরম শাস্তি হিসাবে পেমাকে রাখা হয়েছিল দাগী কয়েদিদের সঙ্গে। দারোগার ছেলে খুন, যে-সে অপরাধ নয়। সারারাত ধরে পেমার চিৎকার শোনা গিয়েছিল। দু'দিন পরে পেমা মৃত সন্তান প্রসব করে এবং প্রচুর রক্তপাতে নিজেও মরে যায়। পীতেম, ধন্দু ও পরতাপ ছাড়া পায় সেদিনই।

এর থেকে আর স্বস্তির সমাধান কিছু ছিল না পীতেমের কাছে। পেমাকে যদি ছেড়ে যেতো হতো, তাহলে সারাজীবন একটা কাঁটা বুকের কাছে খচখচ করত।

এবার সে নিজেই সালমাকে বলে, গোছা জিনিসপত্র, গোটা তাঁবু, চল বেরিয়ে পড়ি।

১৩

কিন্তু 'চল' বললেই যাওয়া যায় না। চারদিকে তখন যেসব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, তার উপরে কারোই কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বাজিকর ছাউনিতে তখন অভাবটা সংকটের আকার ধারণ করেছে। গৃহস্থদের দেখাদেখি তারা যেসব দাদন করেছিল তার অধিকাংশই ফেরত আসে নি। জন্তু-জানোয়ার যা ছিল তার কতক বেচে খাওয়া হয়েছে, কতক বেচে পুলিশের হুজ্জতি বন্ধ করা হয়েছে।

এরই মধ্যে একদিন শোনা গেল কোথায় নাকি সাঁওতালরা সভা করেছে, তার পরে এক দারোগাকে সদলবলে খুন ক'রে বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়েছে। রাজমহলে তখন সরকারী মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য শুরু হয়। থানা পুলিশ বন্দুক লাঠি সব জোরদার করা হতে লাগল। কেননা মানুষের স্মৃতিতে বাবা তিলকা মাঝির বিদ্রোহের কথা তখনো জাগ্রত ছিল।

হাওয়ায় গুজব এত ছড়াচ্ছিল যে পীতেম যেদিন শুনল দয়ারাম ভকত গাধার পায়ের চাট খেয়ে মরেছে, সে বিশ্বাস করে নি। সে ভেবেছিল বজ্জাত লোকটা বেঘোরে মরেছে কোনোরকমে, আর মানুষ রটাচ্ছে এই রকম। কেননা দারোগার ছেলের ঘোড়ার চাট খাওয়া ব্যাপারটা দূরদুরান্তের সবাই জেনে গিয়েছিল। কাজেই চাট খাওয়াটা মানুষ একটা সাধারণ ব্যাপার ক'রে ফেলেছে। তাছাড়া, গাধা কখনো চাট মারে, এ কখনো কেউ শুনেছে? তবুও খোঁজ নিতে গিয়ে সে খুবই তাজ্জব বনে যায়। ঘটনাটা সত্যি। দয়ারামের খামার-বাড়িতে দয়ারাম মরে পড়েছিল তার নতুন কেনা গাধার পায়ের কাছে। এত কাছে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকাতে গাধাটা নাকি ভয়ে সারারাত চিৎকার করেছে। পরদিন মানুষ বিরক্ত হয়ে সেই খামার-বাড়িতে গিয়ে দয়ারামের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে। কেউ বলছে দয়ারাম গাধার পায়ের চাট খেয়ে মরেছে, কেউ বলছে তার চাকর সুফল তাকে খুন ক'রে পালিয়েছে। সবিস্তারে সব শুনে পীতেম সালমার কাছে এসেছিল।

— দয়ারামের মরার খবর শুনেছিস?

— শুনেছি।

সালমার মুখে কোনোরকম ঔৎসুক্য ছিল না। কিন্তু পীতেম এত সহজে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। এই আশ্চর্য ঘটনার পেছনে সালমার হাত সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। অথচ সালমা যেন কিছুই জানে না।

পীতেম, সালমা, বা অন্য কেউই জানত না সেদিন দয়ারামের নতুন কেনা মাদী গাধাটা আরেকজন মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। সে মানুষটা দয়ারামের সেই বাঁধা দাস সুফল টুডু। খামার-বাড়িতে গাধা নিয়ে মালিক ব্যস্ত ছিল, তখন সে বন্ধ

দরজায় মালিকের নির্দেশ মতো পাহারা ছিল। কিছু একটা সন্দেহ হওয়াতে ফোকর দিয়ে উঁকি দিয়ে সে যা দেখেছিল, তা তার জাতের আর কেউ কখনো দেখে নি। তারপর চাট খেয়ে জলচৌকির উপর থেকে মালিককে ছিটকে পড়তে দেখেছিল সে। তারপর আবার চাট। তখনো সে ভেতরে ঢোকে নি, কেননা, না ডাকলে ভেতরে ঢোকা নিষেধ ছিল মালিকের। শেষে একসময় নিঃসন্দেহ হয় যে, মালিক আর ডাকবে না।

তখনো সে ঢোকে নি। সে ভেবেছিল, গাধাও গা-জোয়ারী কিংবা বদমাইসি সহ্য করে না, অথচ সে সুফল টুডু আজ দশ বছর ধরে এই জানোয়ারের অধম মানুষটাকে সহ্য ক'রে যাচ্ছে। সে ভেবেছিল, পরপর সাতদিন স্বর্গের ঠাকুর আকাশ থেকে সিদু-কানুর ঘরে এসে নেমেছিল, নির্দেশ দিয়েছিল। সে ভেবেছিল, তার ঘরের উঠোনে নিশ্চয়ই আগাছা আর ঘাসের জঙ্গল হয়ে আছে। যদি সেই অমঙ্গল চিহ্নিত মোষ আর কোথাও চরার জায়গা না পায়, তবে তার উঠোনে নিশ্চয়ই জেঁকে বসবে এবং ঘাস খাবে। কেননা তখন সব সাঁওতাল জানত এ রকম মোষ আসছে। কোথা থেকে আসছে কেউ জানত না। তবু গ্রামে গ্রামে খবর রটে গিয়েছিল এবং প্রত্যেকটি বাড়িতে উঠোন চেঁছে গোবরজল দিয়ে সবাই পরিষ্কার ক'রে রেখেছিল। কেননা ঘাস দেখলেই সেই অমঙ্গল বহনকারী মোষ তাতে চরবে, ঘাস খাবে। আর তাতে সবংশে সে বাড়ির মানুষ ধ্বংস হবে। সুফল টুডুর বাড়ি আছে, বংশের মানুষও আছে, কিন্তু এখন আর কেউই সে বাড়িতে থাকে না।

সে ভেবেছিল, তার বাড়ি তিন মাথার মোড়ে। সেখানে গাছের গায়ে গরুর চামড়া, জোড়া বাঁশি এবং শাল পল্লব সাজিয়ে রাখার দায়িত্ব ছিল তার, যাতে প্রমাণ হয় এ বাড়িটা সাঁওতালের, এ গ্রাম সাঁওতালের, তা না হলে রাঁচী না কোথায় যে নেতা জন্মে বড় হয়েছে সে যদি এসে এসব দেখতে না পায়, তাহলে ক্রুদ্ধ হয়ে সবাইকে হত্যা করতে পারে। সে মনে করেছিল, যেসব যুবক সাঁওতাল এখন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে টামাং নিয়ে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে প্রচার করছে এবং অন্যকে প্রচারে উদ্বুদ্ধ করছে, তাদের দলে তার থাকা অবশ্যই উচিত ছিল। তার মনে হল, সে তো এক মায়ের এক বেটা, আর এখন সব এক বেটার মায়েরা পরস্পর সই পাতাচ্ছে। হয়ত, তার মাকে সবাই অবহেলা করছে এবং সই না পাতিয়ে নিঃসঙ্গ ক'রে রেখেছে। কেননা সে তো অন্যসব এক মায়ের এক বেটাদের মতো নির্ভীক হয়ে এগিয়ে যেতে পারে নি।

এসব চিন্তা করার পর মাদী গাধাটাকে তার খুব মহীয়সী মনে হয়। সে তার পর মালিকের ঘোড়াটার বাঁধন খুলে তাতে সওয়ার হয়ে বসে। ঘোড়াটা দীর্ঘকাল সওয়ারকে এককাতে বসিয়ে আস্তে চলতে অভ্যস্ত। এখন দু'পা ঝোলানো সওয়ারী পেয়ে একটু বেকায়দা বোধ করে। সুফল দু' ঘা চাবুক চালিয়ে বলে, চল বেটা, আজ মনের আনন্দে ছোট্। ঘোড়া গ্রামের পথে ছুটতে শুরু করে।

দলের হালচাল সম্বন্ধে অনেকদিন ধরেই পীতেম আর মনোযোগ দেয় না। নানা ধরনের আপদ-বিপদে একেই তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল, অবশেষে পেমার মৃত্যু তাকে মারাত্মক আঘাত দিয়ে যায়। তাছাড়া অনেক চিন্তা করেও দলের মতি--গতি এবং অবস্থা ফেরাবার মতো কোনো বুদ্ধি তার মাথায় আসে নি।

সেই মেলার সময় যে বড খেলা হয়েছিল তখন ইউসুফ নামে এক মুসলমান যুবক একদিন খেলার শেষে হাত ধরে বালিকে একধারে টেনে এনেছিল। হাত দু'খানা একত্র ক'রে ঝুঁকে পড়ে সে চুম্বন করেছিল। মুখে অকুণ্ঠ বাহবা ছিল তার।

ইউসুফ বলেছিল, কি হাতই বানিয়েছ ওস্তাদ, ইচ্ছে হয় সোনা দিয়ে মুড়ে রাখি। এসব বীরাচারের স্তুতিতে সব বীরেরাই বিগলিত হয়। বালিও হয়েছিল। তারপর ইউসুফের সঙ্গে দোস্তি হতে তার দেরি হয় নি।

কিন্তু ইউসুফের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। দু-একদিনের মধ্যেই সে কথাটা পাড়ে বালির কাছে। বালির মতো এক-আধজন লোক তার দরকার। এসব ডুগডুগি বাজানো ছেঁচড়া কাজে বালির মতো ওস্তাদের সময় নষ্ট করা অন্যায়। বড কাজ কিছু করতে চায় তো বালি আসুক তার সঙ্গে। যে কাজে সাহস লাগে, উত্তেজনা ও পয়সাও ভালো আছে।

বালি বলেছিল, আদারে-পাদারে ঢিল না ছুঁড়ে, আসল কথাটি বল। আমার ছুরি কেমন সোজা এবং জায়গামতো যায়, দেখেছ তো? আমি মানুষটাও সেরকম।

তারপর ইউসুফ মনের কথা খুলে বলেছিল। গঙ্গায় আছে অনেক মহাজনী নৌকো। দেশবিদেশের ব্যবসাদারেরা এখানে হরেকরকমের মাল বোঝাই করে। প্রশস্ত গঙ্গার অন্ধকার রাতগুলো ইউসুফের। মানুষ আজকাল ভীষণ ত্রাসে থাকে। পাহারাদারগুলো টের পেলেও রা কাড়ে না। সেখান থেকে পাঁচ-দশ পেটি মাল সরালে দিব্যি মাসখানেক নিশ্চিন্তে বসে খাওয়া যায়। আর এসব কাজের সুলুক-সন্ধান ইউসুফের ভালোই জানা আছে। যা করার সেই করবে। বালি শুধু সঙ্গে থাকবে তার।

প্রস্তাব শুনে বালি ভয় পেয়েছিল। সে বলেছিল, না ভাই, দলে থেকে এসব হাঙ্গামায় জড়িয়ে পডতে চাই না। আমার একার দোষে দল নষ্ট হবে, এ ঠিক নয়।

ইউসুফ অবশ্য বেশি পেড়াপীড়ি করে নি। যাওয়ার সময়ে বলে গিয়েছিল, গেলে ভালো করতে, না যাও, ইউসুফ মিয়ার আটকাবে না। এ দুনিয়ায় বোকা লোকেরা খেটে মরে আর বুদ্ধিমানেরা বসে খায়। আর আমার মতো তোমার মতো,.

যারা খাটতেও চায় না আবার পয়সা রোজগার করার মতো অনেক বুদ্ধিও নেই। তারা সাহস দিয়ে রোজগার করে। কথাটা তোমার কাছে তোলা রইল, ভালো মনে কর, খবর দিও একসময়।

বালি কথাটা তখন ভালো মনে করে নি। এখন এই দুর্দিনে কথাটা ভালো মনে না করলেও একেবারে ফেলনা মনে হয় না। কাজেই সে ইউসুফের খোঁজ লাগায়।

অস্থিরতার সময় সব ধান্দাবাজরা শহরেই থাকে, ইউসুফও তার ব্যতিক্রম নয়। কাজেই তাকে খুঁজতে বালিব বেগ পেতে হয় না।

ইউসুফ বলে, আমি জানতাম তুমি আসবে। খুব ভালো সময়ে এসেছ। ঘাটে নৌকো রাখার জায়গা নেই, নৌকোয় মাল রাখার জায়গা নেই। গুদামগুলোও ভর্তি। সাঁওতাল হাঙ্গামার ভয়ে কোনো মহাজনই এখন নৌকো ভাসাতে রাজি নয়। তার উপরে দেখ কেন, ঘাটের দিকে থানা পুলিশ পাহারাদারের নজর নেই। নজর এখন সবার গ্রামেব রাস্তার দিকে। সবারই ভয় কোন দিক দিয়ে কখন এসে জংলীরা ঝাঁপিযে পড়ে।

প্রথমে বালি একা, তারপরে ধন্দ, পরতাপ, জিল্লু ইত্যাদিরাও এসে যোগ দেয়। অন্ধকারের মধ্যে বোঝাই নৌকো থেকে মালের পেটি তুলে নিজের নৌকোয় তোল। তারপর ভাটির দিকে তরতর ক'রে বেযে যাও। মাইল দুযেক তফাতে বড বজরা অপেক্ষা ক'রে থাকে। সেখানে মাল ফেলে দিলেই ছুটি আর নগদ টাকা।

এভাবে চলছিল সেই গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত। পীতেম আফিঙের নেশা করত এবং ঝিমোত। নতুন ক'রে কিছু চিন্তা করার কথা আর তার মাথায় আসত না। হাজত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আস্তে আস্তে একেবারে গম্ভীর হযে যায়। জাগ্রত ও ঘুমন্ত দুই অবস্থাতেই তার কানে সারারাত ব্যাপী পেমার আর্তনাদ এসে আঘাত করত। সে ছটফট করত, তাঁবুর বাইরে সারারাত পায়চারি করত এবং একা বিড়বিড় করত। সে কারো সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ করত না এবং কথাও সারাদিনে মাত্র দু-একটা বলত। তাঁবুর সামনে একটা গাছের গোড়ায় সে প্রায় সারাক্ষণই বসে থাকত।

তারপর সালমা তাকে আফিং খাওয়ানো শুরু করে। আফিঙের নেশায় সে খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিল। দিনরাত একটা আচ্ছন্ন একাকিত্বে সে বিভোর হয়ে থাকত। তার চুল দাড়ি ক্রমশ বড এবং ঝাঁকড়া হয়ে তাকে ক্রমশ এক বিজ্ঞ প্রবীণ মানুষ বানিয়ে দেয়। আফিং খাওয়ার অনুষঙ্গ হিসাবে সে স্নানও করত না, ফলে তার গায়ের রঙে একটা সবুজ শ্যাওলার ভাব এসে পড়ে।

এরকম সময় একদিন দারোগা জানকিরাম ছাউনিতে এসে হাজির হয়। পীতেম অর্ধনিমীলিত চোখে তাকে দেখে। তার দৃষ্টিতে পরিচিতির কোনো লক্ষণ নেই। সুতরাং এগিয়ে এসে কথা বলতে হয় সালমাকেই।

বেশ কয়েকজন ইংরেজ সাহেব তখন শহরে ছিল। তাদের মধ্যে একজন মেজর বারোজ। সাঁওতালদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য লোকজন সংগ্রহ চলছে। সে কাজে বারোজ সাহেব নিজে তত্ত্বাবধান করছে। জানকিরামের আসার উদ্দেশ্য ঘোড়ার খিদমৎ করার জন্য শিক্ষিত লোক দরকার। বাজিকরদের থেকে সে কাজ আর ভালো কে জানে! সুতরাং লোক দিতে হবে।

সালমা বলতে চেষ্টা করেছিল কয়েকটা কথা। কিন্তু শোনে কে? দারোগা বলে, কথা বলার এবং শোনার আমার সময় নেই। এমনি যদি না যেতে চাও, বেঁধে নিয়ে যাব, তাও না যেতে চাও আগুন দিয়ে সমস্ত ছাউনি পুড়িয়ে দেব।

ধন্দু, বালি, পরতাপ, পিয়ারবক্স এবং জিল্লু এই পাঁচজন যুবক মনোনীত হয়। বারোজ তাদের নিজে পছন্দ করে। বাজিকরদের পাঁচ সেরা যুবক যুদ্ধে যায়।

তাঁবু ছেড়ে যাওয়ার আগে তারা সবাই গাছতলায় পীতেমের কাছে এসে দাঁড়ায়। পীতেমের সেই একই অনির্দিষ্ট অর্থহীন দৃষ্টি। যেন সে কানেও শোনে না এমনভাবে সালমা তার কানের কাছে চিৎকার করে, সাহেবরা ছেলেদের যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। পীতেম, শুনতে পাচ্ছিস। সাঁওতালদের সঙ্গে সাহেবদের যুদ্ধ হচ্ছে।

পীতেম মাথা নাড়ে, তার শরীর থেকে প্রাচীন রহস্যময় গন্ধ ছড়ায়, সে আবার ঝিমোয়, যেন কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না।

যুবকেরা একে একে তার পা স্পর্শ করে, পীতেম টেরই পায় না যেন। তারপর তারা বিদায় নেয়।

উত্তরে গঙ্গা এবং দক্ষিণে বনভূমি অঞ্চল। মাঝে মাঝে অনতিউচ্চ গিরিমালা। এমন জায়গায় গ্রীষ্মের আবহাওয়া বড অকরুণ হয়। ইংরেজ বাহিনী সাঁওতালদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য শিবির করেছে এমনই একটি জায়গায়। স্থানটির নাম পিয়ালাপুর। পিয়ালাপুরের পুবে রাজমহল এবং পশ্চিমে ভাগলপুর প্রায় সমান দূরত্বে। ভাগলপুরের কমিশনার চায় এখানে সাঁওতালদের একটা মারণ আঘাত হানতে। কারণ এখানে যদি বিদ্রোহীদের আটকানো না যায়, তাহলে ভাগলপুর রক্ষা করা যাবে না। বাহিনীর নেতৃত্ব করছে ছ'জন ইংরেজ অফিসার, তারা হল মেজর বারোজ, মেজর স্টুয়ার্ট, কর্নেল জোন্স, চার্লস ইজারটন, জেমস পণ্টেট এবং এডেন।

পিয়ালাপুরে অস্থায়ী ঘাঁটি হল। পথপ্রদর্শক হিসাবে এক বৃদ্ধ সাঁওতালকে বন্দী ক'রে আনা হয়েছিল। সংবাদ ছিল যে পীরপৈঁতি গিরিসংকটে সাঁওতালদের ঘাঁটি। ঘাঁটিতে রসদ ও খাবারদাবারসহ কিছু সৈন্যকে অপেক্ষায় রেখে ঠিক দুপুরবেলায় মেজর বারোজ গিরিসংকটে প্রবেশ ক'রে সৈন্যসমাবেশ করল। রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম, পাথর ও আগাছার জঙ্গলে ঢাকা। পাহাড়ের নিচে আছে একটা নালা। আশেপাশে কোথাও বৃষ্টি হলে তার যাবতীয় জল প্রবল বেগে বেরিয়ে যায় সেই নালা দিয়ে। পাহাড়ের উপর দিকে কোনোরকম চাঞ্চল্য নেই। যতটা সম্ভব অগ্রসর হয়ে মেজর বারোজ কামান পাতল স্থানে স্থানে।

পিয়ালাপুরের অস্থায়ী ঘাঁটিতে জিল্লু এবং পরতাপ তখন বৃদ্ধ বন্দীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। জিল্লু বলেছিল, বুড়ো, তুমি বেইমানী করলে? রাস্তা দেখিয়ে দিলে সাহেবদের? বৃদ্ধ এতক্ষণ দূরের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই হাসছিল। তার হাতপায়ের শৃঙ্খলকে সে যেন আমলেই আনছিল না।

জিল্লুর কথা শুনে সে বলে, হ্যাঁ, রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছি, একেবারে যমের দক্ষিণ দুয়ার।

বৃদ্ধের দড়ির মতো শীর্ণকায় চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা কয়েকটা মাত্র দাড়ি, অযত্নবর্ধিত চুল সারা মুখে ছড়ানো।

সে হঠাৎ জিল্লুর দিকে তীব্রভাবে তাকায়। তারপর বলে, ওখানে কে আছে, জানিস?

– কে?

– ওখানে যে আছে, তাকে দেখলে বাঘ রাস্তা ছেড়ে দেয়। তার নাম চাঁদ রাই।

আব পশ্চিমের ঘাটিতে আছে শ্যাম পারগানা, যার নাম তোর সাহেবরা গোরে যাওয়ার সময় পর্যন্ত মনে রাখবে। শ্যামের বাঁযে আছে ডুমকা সোরেন, যার ছোঁড়া তীরের ফলা যেখানেই বিঁধুক তা বাইরের আলো দেখবেই। বুঝলি ? যা এখন, কানের পিছনের ঘা তো শুকিয়েছে, এবার সাহেবদের কাছে বলে আয়।

বৃদ্ধের নাটকীয় কথাবার্তায় জিল্লু ও পরতাপ পা পর্যন্ত চমকায়। কে এ মানুষটা ? তারা দু'জনে কাছে এসে ভালো ক'বে দেখে। হায় বে, এই সেই মানুষ! এমন নাটক বুঝি যুদ্ধক্ষেত্রেই হয়।

সেই মানুষ, যার ধান ওজনের কাবচুপিতে জিল্লু প্রতিবাদ ক'বে মাথায় চোট খেয়েছিল। হ্যাঁ, এ সেই চেতন মাঝিই বটে।

জিল্লু, পরতাপ দু'জনে আশপাশ দেখে নিয়ে কাছে এসে হাঁটু ছোঁয় তার।

চেতন মাঝি শৃঙ্খলিত হাত দিযে ঝট্‌কা দেয, থাক্ থাক্, সাঁওতাল মারতে এসেছিস!

—নিজেদেব ইচ্ছায আসি নি মাঝি, জোর ক'রে নিয়ে এসেছে।

—জোর ক'বে আবার কি করে আনে বে ? মরদ নোস তোরা ?

মাঝি ভীষণ উত্তেজিত হয়। বালি বলে, এই ধরো যেমন তোমাকে এনেছে। জোর করেই তো এনেছে ? নিজের ইচ্ছায তো আর আস নি ?

চেতন মাঝি বালির দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়, তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে। বলে, এ কে দেকো, তার উপর বাজিকর। তোদের সাথে কথায় পারে কে ? তবে লড়াইতে পারবি না। সাঁওতালবা তোদের কচুকাটা করবে।

পরতাপ বলে, লড়াই থোরাই করব আমরা। তুমি সত্যি বলছ, কাকা, ওখানে ডুমকা আছে ?

—আছে না ?

—ডুমকা আর আমি বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলাম। মনে আছে ?

চেতন মাঝি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার দৃষ্টি পীরপৈঁতি পাহাড়ের দিকে। সে আর কথা বলে না।

ঠিক এই সময় প্রথমবার কামানের গম্ভীর গর্জন শোনা যায়। চেতন মাঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে। শিকল ঝনঝন ক'রে শব্দ করে। উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়ায়। পাঁচ বাজিকরের চোখে যুদ্ধের চেহারা পাল্টে যায়।

মেজর বারোজ চিন্তাই করতে পারে নি তার সমরসজ্জার এত কাছে সাঁওতালরা। প্রত্যেকটা পাথর, প্রত্যেকটা ঝোপ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে তীর। মেজর স্টুয়ার্ট তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে একেবারে ফাঁকা জায়গায়। দু'দিকে কাঁটাগাছের জঙ্গল। গাছের ও পাথরের আড়াল থেকে তীর আসছে বৃষ্টিধারার মতো।

দু'পক্ষের প্রবল রণহুংকার এবং আর্তনাদ বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ের

নিচে অপেক্ষমান ঘোড়াগুলো পা দাপাচ্ছে। নালার কাছের সৈন্যরা তীরবিদ্ধ হয়ে পালাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। ইংরেজদের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে সাঁওতালরা উন্মাদের মতো ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তীর-ধনুক আর টাঙ্গি-বল্লম নিয়ে।

চেতন মাঝি এবং পাঁচজন যুবক দূর থেকে দেখল পাহাড়ের মাথার উপরে মেঘ জমেছে ঘন কালো রঙের। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম হাওয়া প্রবল বেগে সেদিকে ধেয়ে চলল। চেতন তার ভারী শিকল নিয়ে নাচতে শুরু করল—নাম, নাম, আকাশ ভেঙে নাম!

কামানের গর্জনকে ছাপিয়ে মেঘের গর্জন উঠল। বাজ পড়তে লাগল মুহুর্মুহু। বারুদের ও গন্ধকের গন্ধ বাতাসকে ভারি ক'রে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। পীরপৈঁতির নালা দিয়ে প্রবলবেগে ঘোলা জল গর্জন ক'রে হতাহত ইংরেজ সৈন্যকে ভাসিয়ে ছুটে চলল। মেজর বারোজ এ অবস্থায় আর যুদ্ধ চালানো নিরাপদ মনে না ক'রে পিছু হটতে শুরু করে। এদিকে সাঁওতাল বাহিনী পিঁপড়ের সারির মতো পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। ইংরেজ সৈন্য দ্রুত পিছিয়ে এসে পিয়ালাপুরের রাস্তায় ওঠে। তারপর পলায়ন।

সাঁওতালরা কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবন ক'রে ফিরে গেল। কেননা পাহাড়ের উপরে আহত ও নিহতদের ব্যবস্থা করতে হবে। যার মধ্যে আছে বীর শ্যাম পারগানা।

পরাজিত ইংরেজ বাহিনী পিয়ালাপুরে এসে আর বিশ্রাম করতেও সাহস পেল না।

ভাগলপুর ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হল। আকাশে যেমন ঘনঘটা তেমনি অন্ধকার। ঝড় ও বৃষ্টিতে দিকনির্ণয় করা যায় না। তখন খোঁজ পড়ে চেতন মাঝি নামে সেই বন্দীর।

মশালের আলোয় অস্থায়ী আস্তাবলে দেখা যায় আরেক দৃশ্য। ছুরিবিদ্ধ চারজন সিপাই মৃত। একটু দূরে বন্দুকের গুলিতে নিহত ধন্দু বাজিকর। পাঁচটি ঘোড়া এবং বন্দীকে নিয়ে চার বাজিকর যুবক দুর্যোগ ও অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

যে গাছের নিচে পীতেম প্রতিদিন বসে, সে গাছটি তার তাঁবুর সামনেই। পীতেম সেখানে সারাদিন, এমন কি অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকে। বস্তুত সে সেখান থেকে উঠতেই চায় না। একসময় সালমা এসে তাকে হাত ধরে ওঠায় এবং সে আর আপত্তি করে না। কারণ সে কোনোদিনই সালমার কোনো আচরণের জন্য প্রশ্ন কিংবা বিরোধিতা করে না। তার ইচ্ছা অবশ্য সারা দিন-রাতই সে ঐখানে গাছের নিচে থাকে, কিন্তু সালমার জন্যই তা পারে না। কাজেই গভীর রাতে কখনো সুযোগ পেলে সে উঠে এসে গাছতলায় বসে থাকে।

এভাবে বসে থাকলে তাকে একজন সন্তের মতো দেখায়। অচেনা ভিনদেশী মানুষ অনেক সময় কৌতূহল প্রকাশ করে, অথবা কাছে এসে শ্রদ্ধা জানায়, প্রণাম করে। কখনো কখনো কেউ কোনো অভীপ্সা পূরণের জন্য তার কাছে কিছু প্রার্থনাও করে। পীতেম সবার মুখের দিকেই নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে এবং কারো কোনো কথারই উত্তর দেয় না। এসব সময়েও সালমাকে এসে ভিড় হঠাতে হয়।

এক চাঁদনী রাতে পীতেম তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে একেবারে হতবাক হয়ে যায়। এতকাল যে গাছটার নিচে সে একান্তে বসে কাটালো, সে গাছটা কই? গাছটা যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পীতেমের বাপ দমু। পীতেম তার কাছে যায়।

দমু বলে, পীতেম, পশ্চিমে যেও না, পুবে যাও।

পীতেম দমুর পায়ের কাছে বসে,যেমন সে গাছের নিচে বসত, তেমনি নিশ্চিন্তে।

দমু বলে, পীতেম, ঐ দেখ, রহু তোমায় দেখে।

পীতেম দূরে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বাতাসে অনেক ধরনের ছায়া দেখে। সঞ্চরণশীল ছায়া। পাতলা গভীর ঘন ছায়া। পীতেম দেখে আকৃতিবিশিষ্ট একটি বিষণ্ন ছায়া চাঁদের আলোয় চলমান।

দমু বলে, পীতেম, রহু সব বাজিকরকে দেখে।

পীতেম বলে, হ্যাঁ, বাপ।

দমু বলে, পীতেম, রহু দেখে, কবে বাজিকরের পথ চলা শেষ হয়।

পীতেম বলে, হ্যাঁ বাপ।

দমু বলে, পীতেম, কারণ কি, রহু তার হাড় দিয়েছিল বাজিকরকে, যেন সে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে।

পীতেম বলে, হ্যাঁ, বাপ।

দমু বলে, পীতেম, তেমন নদী কেউ দেখে নি যে নদীতে তোমার পিতৃপুরুষ

তৃষ্ণা মেটাত। তেমন দেশ কেউ দেখে নি যে দেশে তোমার পিতৃপুরুষ বাস করত তেমন জাত আর কোথাও নেই যে জাতে তোমার জন্ম। আর সেই জাতের মানুষ যে গান গাইত, যে সম্পদ উৎপাদন করত, যে জীবন যাপন করত, তার তুলনা আর কিছু নেই।

পীতেম বলে, হঁ্যা, বাপ।

দনু বলে, পীতেম, তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করত আর সন্ধ্যার পর গভীর রাত পর্যন্ত নাচত আর গাইত। কারণ কি, জীবন তখন ছিল এত অপর্যাপ্ত যে শরীর তার দাসত্ব করত। কাজেই মানুষের ছিল না ক্লান্তি।

পীতেম বলে, হঁ্যা, বাপ।

দনু বলে, পীতেম, রহু তার স্বজাতির জন্য এমন সুন্দর জীবন ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু সে জীবন তো স্থায়ী হল না।

পীতেম বলে, কেন, বাপ?

দনু বলে, সে তো এক বিরাট গল্প, পীতেম।

রহু তার মানুষ নিয়ে সেই ভূখণ্ডে থাকত, যেখানে জীবন ছিল নদীর মতো, নদীতে ছিল অফুরন্ত স্রোত, বনে অসংখ্য শিকারের পশু এবং মাঠে অজস্র শস্য। মানুষ ছিল স্বাধীন, সুখী।

তারপর সেই মানুষটা এল। তার চোখ স্থির, তাতে পলক পড়ে না। সে এসে প্রথমেই মাঠ থেকে রহুর সেরা ঘোড়াটি ধরে নেয়।

—এই ঘোড়া আমার।

কেউ কোনো প্রতিবাদ করে নি। সবাই তাকিয়ে দেখছিল তাকে। সে কিছু স্বতন্ত্র, রহুর মানুষদের সঙ্গে তার মিল নেই।

সে ঘোড়াটা ধরে নিল এবং তাতে সওয়ার হল। কিন্তু ঘোড়াটা তাকে সওয়ার করতে রাজি হল না। তাকে ছিটকে ফেলে দিল। সে ক্রুদ্ধ হল এবং আবার সওয়ার হল। ঘোড়া আবার তাকে ধুলোয় ফেলল।

ক্ষিপ্ত সেই মানুষটা তখন কোষ থেকে খড়্গ নিষ্কাসন করে। ঘোড়া তার সামনে ঘাড় সোজা ক'রে বেয়াড়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ মানুষটা এক কোপে সেই দুর্বিনীত স্বাধীন ঘোড়ার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করল।

সব মানুষ হতবাক হয়ে গেল। এমন পাশবিক হত্যা সেখানে কেউ কোনোদিন দেখে নি। সবাই স্তব্ধ।

তখন সেই মানুষটা হা-হা ক'রে হাসল। তাতে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো এবং তাকে শাস্তি দিতে চাইল।

অদ্ভুত! সেই মানুষটার চোখে মুখে কোনো আতংক নেই!

রহু তখন নিরস্ত করল তার মানুষদের। রহু সেই স্কন্ধহীন ঘোড়াটা দেখালো সবাইকে। সেই দুর্বিনীত ঘোড়াটা তখন সমস্ত মাঠ বৃত্তাকারে ঘুরছে। বৃত্ত ক্রমশ

বড় হয়, ক্রমশ আরো বড়। ঊর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত রক্ত সেই বৃত্ত তৈরি করে।

সব মানুষ সভয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল। রহু তখন সেই আগন্তুককে বলে, তুমি ওকে মারলে কেন ?

— ও আমার অবাধ্য হয়েছিল।

— কিন্তু ও তো তোমার পশু নয়।

সে হা-হা করে হাসে। সে বলে, আমি যা চাই, তাই পাই।

— তুমি পরিশ্রম ক'রে অর্জন কর না ?

সবাই অবাক হল তার উত্তর শুনে। সে বলে, আমি অর্জন করি আমার এই খড়্গের সাহায্যে।

তারপর সে চলে গেল। যুবকেরা তাদের ধনুকে শরসন্ধান করছিল তাকে বিদ্ধ করার জন্য। রহু তাদের নিষেধ করল। কেননা, সে এই অদ্ভুত মানুষটাকে বুঝতে চেষ্টা করছিল। সে অমঙ্গল আশংকা করছিল।

যুবকেরা বলেছিল, ওকে হত্যা করাই ঠিক ছিল। প্রবীণেরা বলেছিল, ওকে হত্যা করলে ওর স্বজাতির সৈনিকেরা এসে আমাদের সবাইকে হত্যা করত। রহু বলেছিল, ও এবার ওর স্বজাতীয়দের নিয়ে আসবে। ওকে হত্যা করা, না-করাতে কিছুই যায় আসে না। ওকে হত্যা করলে একটা ঘৃণিত মানুষকে হত্যার কদর্যতা আমাদের গায়ে লাগত।

রহু ঠিক বলেছিল। সে আবার এল। এবার অনেক লোক-লস্কর নিয়ে। এবার রহু তার পথ আটকাল।

সে বলে, চণ্ডাল, পথ ছেড়ে দাও।

— কোথায় যাবে তোমরা ?

— আমরা ঐ পবিত্র নদীর কাছে যাব।

রহু বলেছিল, ওই পবিত্র নদীর কাছে যাও, পবিত্র হও।

সে আবার হা-হা ক'রে হেসেছিল। তারপর তারা সেই নদীর পথে এগিয়ে গিয়েছিল।

তারা সেই নদীর তীরে তাদের দেবতার মন্দির নির্মাণ করেছিল, তারপর ফিরে গিয়েছিল। ফেরার পথে তারা রহুর জনপদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছিল, শস্য নষ্ট করেছিল, রমণীদের ধর্ষণ করেছিল এবং বাধাদানকারীদের হত্যা করেছিল। তারা ছিল মদমত্ত ও স্বেচ্ছাচারী।

তৃতীয়বার সে আসে আরো বলশালী হয়ে। এবার তার সঙ্গে ছিল তার পুরোহিতগণ। তারা সেই মন্দিরে তাদের দেবতা স্থাপন করল এবং তাদের বিচিত্র রীতিপদ্ধতির অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করল।

তারা তৃষ্ণার্ত রহুর স্বজাতিদের নদীর জল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারী করল। তখন রহু করল তার প্রতিবাদ।

—একি স্বেচ্ছাচার তোমার ?

—চণ্ডাল, এই পবিত্র নদী তোমরা স্পর্শ করতে পারবে না। এই মন্দিরের ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না।

—তোমার মন্দিরে আমাদের প্রযোজন নেই, কিন্তু এই নদী এতকাল আমাদের ছিল।

—এখন আর নেই। এখন এ নদী আমাদের, তোমাদের স্পর্শে অপবিত্র হবে।

এই বলশালীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ করার মতো শক্তি কিংবা আয়োজন কিছুই ছিল না। রহুর জনপদের যাবতীয় সম্পদ, শস্য, পশু, এমনকি স্ত্রীদেরও আগন্তুকরা বলপ্রয়োগে দখল করল। তারা ক্রমশ হীনবল হয়ে দখলকারীদের বিধি-নিষেধের মধ্যে অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে লাগল।

অবশেষে, রহু একসময় আবিষ্কার করে. বহিরাগতদের যাবতীয় ভ্রষ্টাচার তার নিজ গোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশ করছে। সে তখন গোষ্ঠীর সবাইকে নিজের কাছে ডাকে।

—আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি নি। আমি হিংসাকে নির্দিষ্ট করেছিলাম খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত পশু শিকারের মধ্যে। কিন্তু এই জনপদের বাইরেও পৃথিবী আছে, সেখানকার বিধিনিয়ম পরিবর্তিত হয়েছে, সে খবর আমি রাখি নি। সেখানে হিংসা শুধু পশু শিকারের জন্য নয়। আমি তোমাদের শিখিয়েছিলাম যে, মানুষ মাত্রই তোমাদের ভাই, কিন্তু এ শিক্ষা ভুল। এই নবাগত মানুষেরা কখনো আমাদের ভাই হতে পারে না। এরা আমাদের অন্ত্যজ করেছে, আমাদের পবিত্র নদীর স্পর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে, আমাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচারকে প্রবেশ করিয়েছে।

প্রবীণেরা বলল, রহু, কেন আমাদের এমন হল ?

রহু বলে, সমৃদ্ধি আমাদের বড় বেশি আত্মসন্তুষ্ট রেখেছিল। আমরা অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম। প্রাচীনদের অর্জিত জ্ঞানকে আমরা ধারাবাহিক করি নি। তাই আমাদের এ হেন দুর্গতি।

—রহু, এই অসম্মান এবং অধঃপতন থেকে রক্ষার উপায় কি ?

রহু বলে, এই অসম্মান এবং অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের প্রাচীন অধিকার এবং সমৃদ্ধিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তার জন্য আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অনেক রক্ত দিতে হবে আকাশের দেবতাকে।

গোষ্ঠীর মধ্যে তখন প্রবল আত্মকলহ শুরু হল। কেননা ভ্রষ্টাচারে নিমগ্ন জাতি রক্তদানের মতো পবিত্র কর্মে কখনো একমত হতে পারে না।

রহু বলে, যারা আমাকে অনুসরণ করবে না তারা চিরকাল এই বহিরাগতদের কাছে অন্ত্যজ এবং দাস হয়ে থাকবে। যারা আমাকে অনুসরণ করবে তারা অবশ্যই একদিন আবার পুরনো সমৃদ্ধি খুঁজে পাবে।

এই বলে রহু প্রবল শিঙাধ্বনি ক'রে এগিয়ে চলল। গোষ্ঠীর এক অংশ তাকে

অনুসরণ করল, অন্যেরা উপহাস করতে লাগল। কিন্তু রহু এগিয়ে চলে। নদীর কাছে এসে স্বজনদের সে বলে, আমি চিরকাল তোমাদের সহায় থাকব। এখন এস, এই নদীকে আমরা পুনরায় অধিকার করি।

কিন্তু বহিরাগতদের সৈনিকেরা তাদের পথ আটকাল। প্রথমদিনের সেই পুরুষ এসে প্রতিরোধ করে রহুকে। বলে, চণ্ডাল, এ নদী স্পর্শ করলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

রহু বলল, তোমার স্পর্ধা থাকে প্রতিহত কর আমাদের।

সেই ব্যক্তি প্রবল খড়্গাঘাত করল রহুর বক্ষদেশে। তার দেহ ছিটকে পড়ল সেই নদীতেই এবং প্রবল গর্জন ক'রে তার অনুগামীরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে তার দেহকে অধিকার করতে।

রহুর ক্ষত থেকে জলস্তম্ভের মতো উচ্ছ্রিত হতে লাগল রক্ত এবং সেই রক্তে প্রবল বন্যায় নদী উঠল ফেঁপে। সেই রক্তের নদী বহিরাগতদের নগরী, দলত্যাগীদের ভূখণ্ড সব গ্রাস ক'রে ধ্বংস করল। কেবল রহুর অনুগামীরা তার দেহকে আশ্রয় ক'রে ভেসে যেতে থাকে দূর দূরান্তে।

অবশেষে বন্যার বেগ মন্দীভূত হলে তারা তীরে আশ্রয় নেয় এবং রহুর দেহের অস্থি কয়খানি আশ্রয় ক'রে নতুন পথে পা বাড়ায়।

দনু বলে, পীতেম, রহু আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমাদের রক্ষা করেন, নতুন ভূখণ্ডে আমাদের সুস্থিতি না করিয়ে তাঁর তো মুক্তি নাই।

১৭

পরদিন গাছতলায় পীতেমের কাছে সালমা আসে।' তার হাতে নেকড়ায় জড়ানো ধন্দুর নবজাত পুত্র।

—ধন্দুর ছেলে, দেখ, পীতেম।

পীতেম হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, হাসে, তার চোখ চিকচিক কবে।

—রহু! রহু!

পীতেম আঙুল দিয়ে শিশুর অধব স্পর্শ করে। বিড়বিড় ক'রে বলে, রহু রহু!

পীতেম যেন তার গহ্বর থেকে আবার বেরিয়ে আসে। যদিও তার নিঃসঙ্গতা কাটে না তবুও সে দু-একটা কথা বলে অন্যদের সঙ্গে এবং মাঝে মধ্যে ধন্দুর ছেলেকে তাঁবুর ভিতরে গিয়ে দেখে এবং আদর করে। সে সালমার কাছে যায় ও অত্যন্ত আস্তে আস্তে বলে, নাতির দু'মাস বয়স হলে চলে যাব এখান থেকে, বুঝলি?

সালমা এখন আর তাকে ইঙ্গিত করে না। এব আগের স্থানত্যাগের সিদ্ধান্তগুলো বিফল হয়েছে, তার জন্য পীতেমকে দায়ী করা চলে না। একটার পর একটা বিপদ এসেছে। পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে।

পীতেম বলে, যাব পুবে, কিন্তু যাব কোন জায়গায় সেটা তুই স্থির করবি।

পীতেম যেন আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। ধন্দুব ছেলের জন্ম অবশ্যই এর প্রধান কারণ। জন্ম এমন একটি বিষয় যে মৃত্যুপথযাত্রীকেও অন্তত কিছু সময়ের জন্য উজ্জীবিত করতে পারে, আর পীতেম তো ছিল শুধু বিস্মরণের মধ্যে।

সালমা বলে, যাব তো, কিন্তু ছেলেরা?

আত্মবিস্মৃত পীতেম ছেলেদের কথা কিছুই মনে করতে পারে না।

—ছেলেরা?

—ছেলেদের তো দারোগা যুদ্ধে নিয়ে নিয়ে গেছে!

—যুদ্ধ?

—সাহেবদের সঙ্গে সাঁওতালদের যুদ্ধ হচ্ছে। ঘোড়ার খিদমৎ খাটার জন্য ছেলেদের নিয়ে গেছে দারোগা।

—তবে?

এ তবের উত্তর সালমার কাছেও নেই। সে শুধু কিছুদিন অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়। পীতেম মাথা নাড়ে।

কিন্তু অপেক্ষা বেশিদিন করতে হয় না। দিন চারেক পরে জানকীরাম সিপাই পাঠিয়ে পীতেমকে ধরে নিয়ে যায়।

পীতেম আবার বিহ্বল হয়ে যায়। আবার তার চোখে মুহূর্তের জন্য অনির্দিষ্ট দৃষ্টি ফিরে আসে।

—আবার কি কসুর, বড় হুজুর ?

যে পাঁচজন লোককে তোদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম, তারা কোথায় ?

সালমা বলে, এ সবের মানে কি ? তারা কোথায় তা তো তুমিই বলবে আমাদের।

—আমি বলব, না ? এই বাঁধ এই বুড়োকে। সালমা আতংকগ্রস্ত হয়। এগিয়ে এসে হাত তুলে দারোগাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। বলে, থামো, বড় হুজুর। ব্যাপার কি হয়েছে আগে জানতে দাও।

দারোগার এখন আর কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার দরকার ছিল না। এই মানুষ-গুলোর কারণে সে অপরিমেয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাঁচজন অশ্ব তদারককারী বাজিকর বন্দীকে মুক্ত করেছে, চারজন সৈনিককে হত্যা করেছে এবং পালিয়েছে। ব্যাপার কি হয়েছে, এ মুহূর্তে এ ব্যাখ্যা দেওয়া তার কাছে অবান্তর। ক্ষমতাশালী মানুষের ক্রোধ অনেক সময় রক্তদর্শন না ক'রে তৃপ্ত হয় না। যুক্তিতে হয় না, বুদ্ধিতে হয় না, ক্ষতিপূরণে হয় না, ক্ষমাতেও হয় না।

এ রকম বিধ্বংসী ক্রোধ এখন জানকীরামের মস্তিষ্কে। রক্তদর্শন করতে চায়। সে হুংকারে, দাপটে ক্রোধ বৃদ্ধি করে এবং প্রহারের উদ্যম ও শক্তি বাড়ায়।

—ব্যাপার কি হয়েছে, অ্যাঁ ? অ্যাই, এ মাগীকে হঠা এখান থেকে।

পীতেমকে বাঁধা হয়েছে একটা থামের সঙ্গে। সালমাকে একজন হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়।

সালমা ভুল করে। আকর্ষণকারী সেপাই-এর কাছ থেকে সে হাত ছাড়িয়ে নেয় আচমকা শক্তি প্রয়োগ ক'রে। একেবারে দারোগার মুখের কাছে হাত নাড়ায় সে। ক্রুদ্ধ সাপের মতো সশব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে।

—কি করবে একে ? মারবে ? মারো, তোমার ক্ষমতা দেখি ? দেখো, দারোগা-বাবু, আমরা বাদিয়া জাত, আসমানের দেবতা আমাদের সহায় থাকে। অন্যায় কিছু করবে, প্রতিফল মিলে যাবে হাতে হাতে। তোমার ব্যাটার মরার কথা ভেবেছ ? দয়ারাম ভকতের লাশে পিপঁড়ে ধরেছিল, মনে আছে ?

ফলে দারোগা আরো উত্তেজিত হয়। প্রতিপক্ষ যদি উষ্মা দেখায় প্রহারের যৌক্তিকতা জোরদার হয়। সে লাথি মারে সালমার গায়ে। এত দুঃসাহস, দারোগার মুখের সামনে হাত নাড়ায় !

সালমা ছিটকে পড়ে। একজন সিপাই তার কেশাকর্ষণ করে। সালমা উন্মাদ হয়ে যায়। যে করেই হোক বাঁচাতে হবে পীতেমকে। এই অসুস্থ মস্তিষ্ক মানুষটাকে যদি অত্যাচার সহ্য কবতে হয় পাগল হয়ে যাবে সে। তীক্ষ্ণ, অপরিচিত চিৎকার করে সে।

—খবরদার দারোগা, সাবধান ক'রে দিচ্ছি তোমাকে। সর্দারের গায়ে হাত দেবে না। সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমার।

এক থাবা ধুলো নিয়ে সালমা তাতে থুথু ছিটায় এবং বিড়বিড় করে। টানা-হেঁচড়াতে তার উড়নী খসে পড়েছে, চোলি ছিঁড়ে দৃশ্যমান তার দুই পীনস্তন। ভয়ংকর দেখাচ্ছে তাকে। সিপাইরা ভয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু দারোগা এত সহজে ভয় পায় না। সাহেবদের সঙ্গে ওঠাবসা তার। তার উপরে যথার্থই ক্ষিপ্ত সে। আব এইসব উত্তেজক নাটকে ক্ষিপ্ততা তার বেড়েছে আরো।

সে নিজে এবার উঠে এসে সালমাকে আঘাত করে। অনাবৃত স্ত্রীশরীরে আঘাত করতে একবার শুরু করলে থামা মুশকিল। দারোগা সেই নেশায় পড়ে। তাব ইচ্ছা ছিল এই অনাবশ্যক ঝামেলাটাকে একটা খুপরিতে আপাতত বন্ধ ক'রে রাখা। সেই উদ্দেশ্যেই সে সালমাকে আঘাত করতে কবতে পাশের একটা কুঠরির দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু কুঠরিতে ঢুকিয়েও সে তার হাতকে থামাতে পারে না। মারতেই থাকে।

সালমা শুধু তার মুখকে আঘাত থেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। তারপর যখন সে দেখে দারোগা তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করার প্রযাস পাচ্ছে, সে আর বাধা দেয় না। সে বুঝতে পারে, এবার জানকীরামের নেশা ধরে গেছে। পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা গভীর। সে এই ভেবে স্বস্তি পায় যে আপাতত এই ক্রুদ্ধ দানবীয় মানুষটাকে পীতেমের উপরে আঘাত করা থেকে নিরস্ত করতে পেরেছে।

সালমা এখন বুঝতে পারে, মানুষটা যতটা না পরিশ্রান্ত তার থেকে বেশি হাঁপাচ্ছে। মিশ্র উত্তেজনা তাকে ক্লান্ত করছে। ক্রমশ তার হাত শ্লথ হয়ে আসতে থাকে এবং একসময় থেমে যায়। ক্লান্ত, ক্রুদ্ধ, ঘর্মাক্ত জানকীরাম তখন আবিষ্কার করে তার সামনে এক অসামান্য রমণী শরীর, বয়স যাকে স্পর্শ করতে পারে নি, জীবনযাত্রার কঠোরতা যাকে কর্কশ করতে পারে নি। সে অসহায় বোধ করে নিজের অভ্যন্তরে এবং পা দিয়ে পিছনের দরজা ভেজিয়ে দেয়। সালমা আপত্তি করে না।

আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন, এই চার মাস সাঁওতাল বাহিনীর সঙ্গে পরতাপ, বালি, জিল্লু এবং পিয়ারবক্স এই চারজন বাজিকর যুবক পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। লোহার কাজে ছিল তাদের স্বাভাবিক দক্ষতা। সেই দক্ষতা এখন প্রয়োজনে লাগে। অস্থায়ী শিবির যেখানেই হয় প্রথমেই কামারের হাঁপর বসে সেখানে। তীরের ফলা, বল্লম, তরোয়াল ইত্যাদি লোহার অস্ত্র তৈরি হয় সেখানে। অস্ত্রের প্রয়োজন দিনদিন বাড়ছে। নিত্যনতুন সাঁওতাল দল গ্রাম ছেড়ে সেনা-বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে।

পীরপৈঁতি পাহাড়ে অনেক চমক হয়েছিল। ইংরেজদের অতবড় বাহিনীর পরাজয় এবং পলায়ন, ডুমকার সঙ্গে বাজিকর যুবকদের মিলন, তাদের সাহায্যে চেতন মাঝির উদ্ধার—এসব ঘটনায় শিবিরে সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও প্রাণবন্ত উৎসব চলে।

তারপর যুদ্ধ আর যুদ্ধ। গ্রামের পর গ্রামে সাঁওতাল বাহিনী জমিদার, পুলিশ, মহাজন এবং ঘাটোয়ালদের কচুকাটা করে 'ফারকাটি' অর্থাৎ সর্বস্ব শোধ দিল। মুক্ত হল তাদের সব ঋণ থেকে। শোষণে ও অত্যাচারে তারা নির্মম হয়েছিল। কোথাও কোথাও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও তারা রেহাই দেয় নি। নারায়ণপুরের জমিদারকে তারা হত্যা করেছিল নৃশংসভাবে।

সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দখলে এল। তারপর দানাপুরের সামরিক ঘাঁটি থেকে সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে ইংরেজরা সাঁওতাল গ্রামগুলোর উপর সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর যা শুরু হল তা যুদ্ধ নয়, নিতান্তই গণহত্যা। পাহাড়ে ও জঙ্গলে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে সাঁওতালরা অসহায়ের মতো মরছিল। মাথার উপরে ছিল না কোনো আচ্ছাদন, ছিল না খাদ্যের কোনো যোগান।

আশ্বিন মাসে সংগ্রামপুরের কাছে পাহাড়ে সাঁওতালরা শিবির স্থাপন করল। একটা মরিয়া ভাব সবার মধ্যেই তখন তীব্র হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহের নেতারা দিনেরাতে আলোচনায় বসছে, সভা করছে, সৈন্যদের মনোবল বাড়াচ্ছে। বন্দুক-কামানের বিরুদ্ধে তীরধনুক, বল্লম, তরোয়ালের যুদ্ধ। কাজেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অসাধারণ মানসিক শক্তি ছাড়া এরকম যুদ্ধের মোকাবিলা করা সাঁওতালদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

পরতাপ, বালি ইত্যাদি বাজিকরেরা ইতিমধ্যেই যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। বস্তুত, যে কারণে তারা পীরপৈঁতির ইংরেজ ঘাঁটি ত্যাগ ক'রে সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তার মধ্যে মহত্তর কিছু সেই মুহূর্তে ছিল না।

ডুমকা সোরেনের পরিবার ও অন্য সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে একটা আকর্ষণ তাদের জন্মেছিল। কিন্তু সাঁওতালরা যে শোষণে নিপীড়িত, সে ধরনের শোষণের সঙ্গে বাজিকরেরা অভ্যস্ত নয়। কাজেই এ ব্যাপারে কিছুটা সহানুভূতি ছাড়া তাদের ভিতরে অন্য কিছু ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, চতুর বাজিকরেরা সব সময়ই তাৎক্ষণিক লাভালাভকেই বেশি মূল্য দিতে অভ্যস্ত। পীরপৈঁতির ইংরেজদের আধুনিক রণসজ্জা ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখেও তাদের মনে হয়েছিল যে ইংরেজরা হারবে। এর সমর্থনে তারা ইংরেজ বাহিনীর মনোবল ও সাঁওতালদের তুলনায় তাদের সৈন্যসংখ্যার অপ্রতুলতার কথাই হিসাবের মধ্যে এনেছিল। এর সমর্থনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পীরপৈঁতিতে ইংরেজ বাহিনীর পরিণতি তারা তাদের হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। সুতরাং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে তারা সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দেয়।

তারপর ঘটনা যত এগোতে থাকে নানারকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। বহেরা গ্রামের রণকৌশলগত অবস্থান ইংরেজদের অনুকূলে ছিল। এই গ্রাম থেকে সন্নিহিত অনেকগুলো গিরিসংকট ও বিস্তীর্ণ জঙ্গলের উপর আধিপত্য সহজতর। ফলে ইংরেজবাহিনী আচমকা আঘাত ক'রে গ্রামটির দখল নেয় ও সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে।

বহেরার লক্ষ্মণ সোরেনের আর কোনো হদিস পাওয়া যায় নি। শোনা যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই মহেশপুর থানায় তাকে হত্যা করা হয়। বহেরা যখন ইংরেজদের দখলে আসে তখন সেখানে প্রতিরোধ করার মতো বিশেষ কেউ ছিল না। শিশু বৃদ্ধ ও মেয়েরা সেই গ্রামে অত্যন্ত আতংকের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিল। ইংরেজরা যেসব গ্রাম দখল করেছে, সেখানে নির্বিচারে হত্যা এবং ধর্ষণ চালিয়েছে। কিন্তু বহেরার সৌভাগ্য, সেখানে পিয়ারসন নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট সেনানায়ক হিসাবে আসে। পিয়ারসন তার বাহিনীর উচ্ছৃঙ্খলতা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। ফলে বহেরাতে হত্যা ও ধর্ষণ একেবারেই হয় নি। বরং পিয়ারসন বৃদ্ধ ও রমণীদের অভয় দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে না যেতে অনুরোধ করছিল। সুতরাং একটা চাপা ভীতি ছাড়া বহেরাতে সাঁওতালদের অন্য কোনোরকম অস্বস্তি ছিল না।

বহেরা দখল হয়েছে শুনে ডুমকা তিন হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহী নিয়ে ঝটিকা আক্রমণে পিয়ারসনের ঘাঁটি বিধ্বস্ত করে। পিয়ারসন বন্দী হয়। বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করা তখন দুই বাহিনীর কাছেই অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। ডুমকা তার সহকারীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ঠিক করে পিয়ারসন-সহ ধৃত পাঁচজন অফিসারকে পরদিন হত্যা করা হবে।

এ খবরে বহেরার সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। ডুমকার মা পীথা মুর্মু এবং আরো চার-পাঁচজন রমণী সেইদিনই ডুমকা ও তার সহকারীদের কাছে এ

ধবনেব সিদ্ধান্তেব কারণ জানতে চায়।

ডুমকা বলে, এসব ব্যাপাবে নেতাদেব যা নির্দেশ আছে তাব অন্যথা করা যাবে না।

— কিন্তু পিযারসন সাহেব এখানে কোনো অত্যাচাব কবে নি। ববং তাব যেসব বদমাইস সৈন্য সেবকম কবাব চেষ্টা কবেছিল, সাহেব তাদেব শাস্তি দিযেছে।

— তবুও বিছু কবাব নেই। অন্যান্য জাযগায যেসব ঘটনা হযেছে তাব বদলা হিসাবে পিয়াবসনকেও মবতে হবে।

পীথা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয। সে চিৎকাব ক'বে বলে, যতবড বীবই হোস না কেন, মনে বাখিস, এখনো ধুতি-পাঞ্চি তুলে পানটিব বাবি মাবতে পাবি, কেননা, আমবা মা।

নেতাবা বিবক্ত হয, ডুমকা সেখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যায।

পীথা আহত ও অপমানিত বোধ কবে। উপস্থিত সকলকে শুনিযে সে বলে, তোদেব সর্বনাশ হবে। তোবা কোনো নিয়মকান্নন মানছিস না। সাঁওতালদেব বীতি-নীতি এমন নয। আমি দেখতে চাই আমাদেব নিষেধ সত্ত্বেও এই ডুমকা সোনে কিভাবে পিযাব সাহেবকে খুন কবে।

গ্রামেব কাছে টিলাব নিচে বধ্যভূমি স্থিব হয। পিয়াবসন সহ চাবজন সাহেবকে সেখানে পিছনে হাত বেঁধে নিযে আসা হয়। পিয়ারসনেব মুখ ভাবলেশশূন্য, অন্যবা কাঁদছিল, দযা ভিক্ষা চাচ্ছিল।

পীথা ভাবতে পাবে নি ডুমকা তাব নির্দেশ অমান্য কববে। কিন্তু ডুমকা তাব পিতৃ-হন্তাদেব ক্ষমা কবতে পাবে না। যুদ্ধে এ-ধবনেব দয়াবও কোনো দাম নেই। আব পীথা ভাবছিল সে মানুষটা থাকলে এমন কখনোই হতে পাবত না।

বহেবায় পিয়ারসন-সহ চারজন সহেবকে হত্যা করা হয় কুড়াল দিয়ে মাথায় আঘাত ক'বে। চারজন পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসেছিল পাহাড়েব দিকে মুখ ক'রে। ঘাতক পিছন থেকে সোজাসুজি কুড়াল দিয়ে মাথায় আঘাত কবে।

মানুষ দেখছিল এই হত্যাদৃশ্য। যাবা স্বজন হারিয়েছিল তারা প্রতিশোধেব আনন্দে চিৎকাব করছিল। উল্লাস অনেকক্ষণ ধবে গ্রামটাকে গমগম ধ্বনিতে পূর্ণ রেখেছিল। পীথা উচ্চস্বরে অভিশাপ দিচ্ছিল ডুমকা ও তাব সহকাবীদেব।

অনেকক্ষণ ধবে পাহাড়েব উপর থেকে প্রহবীবা নাকাড়া বাজাচ্ছিল। শুনতে পায় নি কেউ সেই বিপদ-সংকেত। যখন সকলেব খেযাল হয় তখন অনেক দেবি হয়ে গেছে।

ইংরেজ বাহিনীর কামানেব প্রথম গোলাটা এসে পড়ে বধ্যভূমির জমায়েতেব উপর। ফাঁকা জায়গায় কামান ও বন্দুক নিয়ে আক্রমণ। সুতরাং ব্যাপক ও নির্বিচার হত্যা।

সাঁওতাল বাহিনী জঙ্গল ও পাহাড়ের আড়ালের জন্য প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল।

সঙ্গে গ্রামের অবশিষ্ট মানুষ। পিছনে পড়ে রইল পঞ্চাশ-ষাটজনের মৃত ও অর্ধমৃত দেহ। তার মধ্যে ডুমকা সোরেন একজন।

সংগ্রামপুরের ঘাটিতে ডুমকা ছিল না। সংগ্রামপুরে সাঁওতালরা বিশাল বাহিনীর সমাবেশ করেছিল। সংগ্রামপুরে সর্বাধিনায়ক ছিল কানু মুর্মু এবং সিদু মুর্মু, চাঁদ-রাই ছিল দ্বিতীয় সারির নেতা।

পরতাপ, জিল্লু, ইত্যাদি তখন গভীরভাবে যুদ্ধের প্রকৃতি এবং পরিণতি বুঝবার চেষ্টা করছে, এই মানুষগুলোকে আরো ভালোভাবে বুঝবার চেষ্টা করছে।

কেননা অনেক ঘটনা ঘটছিল যা তাদের হিসাবের মধ্যে ছিল না। পীথা মুর্মুর মৃত্যু তার মধ্যে একটি। তাছাড়া সাঁওতাল বাহিনীতে তাদের থাকার প্রধান আকর্ষণ ডুমকা আর ছিল না। সেটা একটা চিন্তার বিষয়। এই মানুষগুলোকে যে তারা সম্পূর্ণ চেনে না, এ বোধ এতদিনে তাদের হয়েছিল।

ডুমকার মৃত্যুর পর বহেরার মানুষেরা পীথা ও অন্য তিনজন স্ত্রীলোককে ডাকিনী মনে করেছিল।

কাজেই গুণিনের বিচারে তারা 'ডান' সাব্যস্ত হয়। যাবতীয় দুর্ভাগ্যের জন্য উন্মত্ত মানুষ তাদেরই দায়ী করে এবং হাত-পা বেঁধে এই চার রমণীকে কুপিয়ে মারে।

বাজিকরেরা এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'রে নিজেদের ভবিষ্যৎ গোপনে স্থির করে। তারা বুঝেছিল এমন কোনো জায়গায় পালাতে হবে যেখানে এ আগুনের ছোঁয়া লাগে নি। একজন বিশ্বস্ত লোহারকে তারা গোপেনে রাজমহলের খবর আনতে পাঠিয়েছিল। নির্দেশমতো সেই লোহার সালমার সঙ্গে দেখা করেছিল। ধন্দুর মৃত্যু তখন বাজিকর ছাউনিতে কারোই অজানা ছিল না। শুধু এই চারজনের কথা চিন্তা ক'রেই সালমা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। পীতেম আগের মতো আবার নির্বাক হয়ে গেছে, কাজেই দলের সম্বন্ধে সামান্য যেটুকু চিন্তা করার তা সালমাকেই এখন করতে হয়।

সালমা সেই লোহারকে বলেছিল, দল কার্তিকের গোড়াতেই এখানকার ছাউনি তুলবে। গঙ্গা পার হয়ে প্রথমে যাবে মালদা। সেখানে কিছুদিন শহরের কাছাকাছি থাকবে, তারপর আরো পুবে সরে যাবে।

সুতরাং ঝিল্লু, পরতাপ, বালি, পিয়ারবক্স দলের গতিপথ সম্বন্ধে আগাম একটা ধারণা করতে পেরেছিল। আর গঙ্গার ওপারে সাঁওতাল বসতি খুবই কম, সেখানে ঝামেলাও নেই। সালমার সিদ্ধান্তে তারা খুশি হয় এবং ঠিক করে প্রথম সুযোগেই সাঁওতাল দল ছেড়ে পালাতে হবে।

সংগ্রামপুরের যুদ্ধের পর তাদের হাতে সেই সুযোগ এসে যায়। কৌশলে

ইংরেজরা পাহাড় ও জঙ্গলের ভেতর থেকে সাঁওতাল বাহিনীকে ফাঁকা মাঠে নামিয়ে আনে। তারপর কামান-বন্দুকের সঙ্গে তীরধনুকের বেমানান লড়াই।

সংগ্রামপুরের যুদ্ধে নেতাদের মধ্যে প্রথমে নিহত হয় চাঁদরাই। চাঁদরাইয়ের মৃত্যুর পর আহত বাঘের মতো সাঁওতাল বাহিনী পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে আসে। সেদিন ইংরেজ বাহিনী একটা কালো জঙ্গলকে সচল হয়ে নেমে আসতে দেখেছিল। নাকাড়ার শব্দ হয়েছিল মেঘগর্জনের মতো। উন্মাদ লড়াইতে শ'য়ে শ'য়ে সাঁওতাল মাটি নিচ্ছে, তবুও এগিয়ে আসা দীর্ঘক্ষণ অব্যাহত ছিল।

তারপর সিহু মুর্মু এবং কানু মুর্মু দু'জনেই আহত হতে সাঁওতালরা পিছোতে শুরু করে। নাকাড়া ধামসায় অন্য শব্দ বাহিনীকে পিছিয়ে আসতে ইঙ্গিত করে। ছিন্নভিন্ন সাঁওতাল বাহিনী গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যেতে থাকে দুই আহত নেতাকে বহন ক'রে। জয়ের আশা তখন আর তাদের ছিল না। সুতরাং মানুষ দল ছেড়েও পালাতে থাকে।

এই সুযোগ বাজিকরেরা ছাড়ে না। প্রথম সুযোগেই এই যুদ্ধে দ্বিতীয় বারের মতো তারা পালায়। চারটি ঘোড়ার পায়ে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে গভীর রাত্রে তারা উত্তর মুখে যাত্রা শুরু করে। উত্তরে গঙ্গাকে পাওয়া যাবে এটুকু ভৌগোলিক জ্ঞান তাদের ছিল, কেননা মানুষের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা, এমনকি মানুষের কাছাকাছি আসাও তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। ধরা পড়লে ইংরেজ কিংবা সাঁওতাল কোনো পক্ষই তাদের খাতির করত না।

পাঁচ-ছ' রাত্রি চলার পর তারা গঙ্গার দেখা পায়। সাহেবগঞ্জের থেকে পাঁচ-সাত ক্রোশ পুবে তারা গঙ্গা পার হয় এবং অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব পূর্ণিয়া জেলায় প্রবেশ করে।

এইভাবে চার যুবক কখনো ভিক্ষা ক'রে, কখনো চুরি ক'রে, কখনো লোক ঠকিয়ে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। যুদ্ধের পর পথশ্রম ও অনাহারে এই চার অশ্বারোহী কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে পড়ল। আরোহীদের থেকেও ঘোড়াগুলোর অবস্থা হল আরো করুণ। শেষ পর্যন্ত তারা আর সওয়ার বহন করতে পারছিল না।

এই ভাবে মণিহারিঘাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি এবং গাজোল হয়ে তারা মালদা আসে। তারপর বাদিয়ার মধ্যযুগীয় ছেঁড়া তাঁবু খুঁজে নিতে তাদের অবশ্য আর অসুবিধা হয় না।

হাঁ শারিবা, তোর নানার নানা পীতেম, তার বাপ দনু, তো সি কহিল, পীতেম, তুমু পচ্ছিমেৎ লয়, পুবেৎ যাবা। কেন কি, পুবেৎ তর্‌ক' উঠে আর পচ্ছিমেৎ ডুবে যায়। বাউদিয়া বাজিকর যতদিন দিশাহারা, ততদিন তারা তর্‌ক'কে পাছুতে রাখে, ততদিন তারা খালি পচ্ছিমেৎ যায়। তয় দনু কলেন, পীতেম হে, পীতেম, তুমু পুবেৎ যাও, বাপ। রহু তুমার সহায় হবেন।

শারিবা বলে, তো পুবের দেশেৎ সুখ কই, নানি? রাজমহলেৎ সুখ জুটে নাই, সুখ জুটে নাই এই তাবৎ পুবের দেশেৎ ঘুর্যে।

—হাঁ, শারিবা, সুখ জুটে নাই। শ' বছর পার হই গেল, তাও তো সুখ জুটে না। নাকি, সুখ বলে কিছু নাই, নাকি খালি দুখের পাথারে সাঁতার খায় বেবাক মানুষ!

—সুখ না থাকুক নানি, সোয়াস্তি আছে। তো বাজিকরের কপালেৎ কি তাও রহু লিখে নাই?

লুবিনি কাঁপা কাঁপা হাতে শারিবার মুখ চাপা দেয়। ওলা কথা কহে না, শারিবা। ওলা কথা পাপ।

শারিবা বলে, পাপ! নানি, যার সমাজ নাই, তার পাপ নাই। রহু কি মোরাদের ভগবান?

—আঃ হা?

—হিন্দুর ভগবান আছে, মোছলমামের আছে আল্লা, খিস্টানের যেশু। তো হামারার বাজিকরের রহুই সি ভগবান, কি আল্লা, কি যেশু। লয়?

শারিবা যেন পরখ করে তার নানিকে। যেন শুনতে চায়, বৃদ্ধা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

নানি এ কথার উত্তর খুঁজে পায় না। প্রশ্নটা তার নিজের কাছেই। চতুস্পার্শ্বের সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে এটা কোনো সমস্যাই নয়। সর্বশক্তিমান এক বা একাধিক অস্তিত্বের উপস্থিতি যেখানে জন্মের পরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো সাধারণ বিষয়, সেখানে বাজিকর নামক সম্প্রদায়ের এ ধরনের কোনো আশ্রয় নেই—একথা অন্য কারো বোধগম্য নয়। অন্য কারো সমস্যাও নয়।

সমস্যা ছিল পীতেমের, সমস্যা ছিল জামিরের, সমস্যা লুবিনির, শারিবার, সমস্যা কিছু বাজিকরের। রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। সে এক প্রাচীন দলপতি। সে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণ করত তার জীবদ্দশায়। কিন্তু লুবিনি কিংবা কোনো বাজিকর তাকে ভগবান, আল্লা ইত্যাদির সমগোত্রীয় ভাবতে পারে না। এই অমোঘ শক্তিধরদের যে পরিচয় বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে সে পায়, রহুকে তার

সমগোত্রীয় ভাবতে তার শুধু ভয় নয়, অনিচ্ছাও বটে। কাজেই তার বোধের মধ্যেও রহু বেঁচে থাকে এক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দলপতির মতো। তার উপরে সে দেবত্ব আরোপ করতে পারে না, কারণ দেবত্ব আরোপ করতে পারার সামাজিক স্থিতি তার নেই। সে সমাজচ্যুত। সে ভ্রাম্যমাণও। পথই তার যাবতীয় নীতিনির্ধারক।

লুবিনি বলে, না শারিবা, রহু রহুই। সি হামরার মঙ্গল চায়। সি চায় বাজিকর সুখে থাকুক, থিতু হোক সে।

শারিবার কাছে তবু বিষয়টার জট খোলে না। লুবিনি যত বৃদ্ধ হচ্ছে ততই সে সারাজীবনের অভিজ্ঞতার, শোনা কথার সারসংকলন করছে। পার্শ্ববর্তী সমাজের কোনো বৃদ্ধার সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তার কাছে নেই এমন একখানা আধার যায় নাম ঈশ্বর, যার উপরে সে তার অভিজ্ঞতা, বোধবুদ্ধি সঁপে দিয়ে নিজেকে নিমিত্ত মাত্র করতে পারে।

তাই শারিবা, সি বাজিকর রাজমহল ছাড়ি আবার রাস্তাৎ ঘুরবা বারালো। পথে পথে ফির বাজিকরের কুত্তা ডুকে, জানোয়ার চিল্লায়। পুরইণা, কাটিহার, কিষণগঞ্জ দিনাজপুর, রঙপুর, ফির মালদা, রহুর ঘোড়ার অক্কের দাগ, ঘুর্, ঘুর্, ঘুররে বাজিকর, দেখ, খুঁজি দেখ, কুথায় তোর থিতু, কুথায় তুর সোয়াস্তি। আর মাথার উপর তব্ক জ্বলে, শীতের হিম, বর্ষার জল। বাজিকরের গেঁহুর পারা অঙ তামার বন্ন হোই গিল।

এক সময় যে মানুষগুলোর দেহের রঙ ছিল গমের মতো, এখন তা হল শ্যাওলাধরা তামার মতো। পুরুষদের ঘাড় পর্যন্ত কেশরের মতো চুল এক সময় ছিল অহংকারের প্রতীক, এখন দীর্ঘ দুর্বিপাকের পর শুধু পাটের ফেঁসোর মতো ম্রিয়মাণ। মাথায় রুমাল কিংবা উড়নি বাঁধা মেয়েরা একসময় কলহাস্যে রাজপথ মুখরিত করত, এখন ক্ষুধায় কাতর ধূর্ত দৃষ্টি তাদের, চোখে নেই সেই তীব্র সম্মোহনী দৃষ্টি। অনেকের দেহেই আর তাদের প্রাচীন ঘুগরু, কুর্তি, ঘাগরা নেই, নেই কাচের কাজকরা বস্ত্র, গলার পাথর। সেখানে স্থান নিয়েছে ধুতি, লুঙ্গি, এইসব এদেশীয় বস্ত্র। গলার মালাকরা মুর্শিদাবাদী সিক্কাগুলো এখন শ্যাওলা ধরা। কেউ আর সেগুলো ঘষে চাকচিক্য করে না। শুধু রাস্তা দিয়ে যখন তারা চলে অথবা থামে, মনে হয় এক হাজার বছরের ধূসরতা তাদের দেহে, তাদের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

এক শতাব্দী ধরে তারা তাদের রক্তে জেনেছিল যে তারা ক্লান্ত হয়ে গেছে। পথ চলায় ক্লান্ত হলে থামতে হয়। কিন্তু সে নিয়ম সাধারণ পথিকের। বাজিকরের নয়। যার পথের শেষ আছে, সে ক্লান্তিকে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু বাজিকরের পথের শেষ নেই। তাই ক্লান্তির বোঝা তার কাছে একসময় বড় বেশি ভারী হয়ে ওঠে।

পীতেম স্থিতি চেয়েছিল। রাজমহলের দীর্ঘদিনের উপস্থিতি তার অভিজ্ঞতায়

একটা চলমান স্থিতি। তবুও দাঁতে দাঁত কামড়ে তাকে থাকতে হয়েছিল। যদিও সেজন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, তবুও।

লুবিনি পাতালু নদীর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ঘরের দাওয়ায় জমাট অন্ধকার, বাইরে স্বচ্ছ চাঁদের আলো। আকাশে হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে, তার ছায়া পড়ছে নিচে গাছের পাতায়। এ দৃশ্যে সব কিছুই কেমন আদিম দেখাচ্ছে।

লুবিনি বলে, শারিবা, তুই এমন তরতাজা যুঁয়ান পুরুষ, তুই ক্যান্ নাচগান হাল্লা করিস না?

—ভালো লাগে না।

—তুই তোর নানার থিকাও বুঢ়া, য্যান তোর নানার নানা সিই পীতেম বুঢ়ার মতো। এমন জন্মবুঢা হওয়া ঠিক লয়রে।

মালদা শহরে মহানন্দা নদীর তীরে বাজিকররা তাদের অস্থায়ী গেরস্থালি শুরু করে নতুন ক'রে। গঙ্গার ওপারের উপদ্রবের কোনো আভাস এদিকে নেই। কিন্তু তাতেও কোনো স্বস্তি নেই। ভগ্ন জীর্ণ সহায়হীন মানুষগুলো এখন আরো ধূর্ত ও ঠগ হয়। ঢোলকের ডুগডুগ শব্দ শোনা যায় ঠিকই। কিন্তু তার সঙ্গে সমান তালে থাকে চুরি, বেশ্যাবৃত্তি, হাত দেখা ও ভবিষ্যৎবাণী। কেননা রাজমহল তাদের সবই কেড়ে রেখে দিয়েছে। দলের কাছে এখন পশু বলতে কিছু নেই, সঞ্চিত অর্থও অনেক আগেই নিঃশেষ। তবুও এখানেই থাকতে হবে। কেননা চারজন নিরুদ্দিষ্ট যুবকের প্রতি নির্দেশ ছিল এখানে আসার। এখানেই তারা মিলিত হবে, লোকমুখে এমন সংবাদই সালমা পাঠিয়েছিল।

মাঘ মাসের প্রথম দিকে পরতাপ, জিল্লু, বালি এবং পিয়ারবক্স ফিরে আসে। ক্রমান্বয়ে পলায়নে ক্লান্ত চার যুবক এবং তাদের শীর্ণকায় ঘোড়া।

বাজিকর ছাউনিতে উল্লাস ওঠে না, আবার শোকও তেমন চোখে পড়ে না। গিয়েছিল তারা পাঁচজন, এসেছে চারজন। শব্দ ক'রে একজনই কাঁদে কিছু সময়, সে ধন্দুর বউ রোহীন। যদিও ছ'মাস আগেই ধন্দুর মৃত্যুর খবর সবাই জানতে পেরেছিল এবং এখন বিষয়টা পুরনো হয়ে গেছে, তবুও এই মুহূর্তে সবাই ধন্দুর কথা ভাবছে। রোহীন শব্দ ক'রে কাঁদে, এর মধ্যে কেউ আতিশয্য কিছু দেখে না। এখন তার কোলে ধন্দুর ছেলে এবং রাত্রে তার শয্যায় দ্বিতীয় একজন পুরুষ শোয়। এসব কথা কারো অজানা নয়। এসব সত্ত্বেও তার কান্না অস্বাভাবিক লাগে না কারো কাছে। রোহীন কিছু সময় কাঁদে, পরতাপ তার ছেলেকে কোলে নিয়ে কিছু সময় বসে তার কাছে।

দিন তিনেক পরে পীতেম চারজনকে তার কাছে ডাকে। চার যুবক নিঃশব্দে তার কাছে বসে থাকে অনেক সময়। পীতেম কিছু বলতে চায়, অথচ পারছে না, এটা সবাই বোঝে। তারা অপেক্ষা করে। শীতের শীর্ণ গাছের মতো পীতেমের চেহারা রিক্ত।

অনেক সময় পরে পীতেম বলে, দুনিয়ার অনেক কিছু দেখে এলে তোমরা। বয়সের থেকেও অভিজ্ঞতা তোমাদের অনেক বেশি হয়েছে। যা গেছে তার জন্য কেঁদে লাভ নেই। এখন বোধহয় আমাদের গেরস্থ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

চার যুবক মাথা নাড়ে। পীতেম বলে, রহু তেমনই চান। তবে আমার শরীর আর মন দুইই ভেঙে গেছে। আমাকে দিয়ে আর নতুন ক'রে কিছু হওয়ার নয়। তোমরা দলের সেরা ছেলে। তোমরাই এবার চেষ্টা কর।

বালির নেতৃত্বে তারপর দল আবার নতুন ক'রে বাঁচার চেষ্টা করে। চারটি ঘোড়াকে যথাসম্ভব যত্ন নেওয়া হয়। বাজিকর এ কাজে অভ্যস্ত। মাসদুয়েকের মধ্যেই তাদের চেহারাতে আবার চিক্কণতা আসে। তৈরি হয় চারটি টাঙ্গা।

মালদা শহরে টাঙ্গার প্রচলন আছে। মুসলমানদেরই এই কাজ প্রায় একচেটিয়া। বাজিকরেরা এবার তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে নামে। বালি আগেই সাবধান ক'রে দেয়, টাঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে ঝামেলা বাধাতে যেও না কেউ। মনে রেখো, আমাদের এখানে বেঁচে থাকতে হবে।

এক মাসের মধ্যে বাজিকর যুবকেরা টাঙ্গা চালাবার পেশাদারি হাঁকডাক, নিয়ম-কানুন শিখে যায়। দীর্ঘ রাস্তা পরিক্রমা ক'রে মাল ও যাত্রী আনে। মানিকচক, কালিয়াচক, খেজুরিয়া ঘাটের দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দেয়, পথচারীকে সচকিত করে চাকার গায়ে চাবুকের হাতল ঢুকিয়ে খর্‌র্‌র্‌র্‌—শব্দে। রাস্তায় ধুলো ওড়ে, টাঙ্গাওয়ালা ছুঁড়ে দেয় বিদ্রূপ রসিকতা কিংবা নিতান্তই খিস্তি।

বালি নিজে টাঙ্গা চালায় না। বাজারের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সে তার মেরামতির সরঞ্জাম আর হাপর নিয়ে বসে। কর্মকারের কাজে সে খুবই সিদ্ধহস্ত। এ ছাড়া ঘোড়ার পায়ে কিংবা গরু মোষের পায়ে নাল পরাবার জন্য দরকার হয় তাকে। জানোয়ারকে খাসি-বলদ করানোর জন্যও ডাক পড়ে তার।

পীতেম আফিং-এর পরিমাণ বাড়ায় এবং রাজমহলের গাছটির অনুরূপ আরেকটি গাছ খুঁজে বের করে। সেখানে সারাদিনরাত বসে ঝিমায় সে এবং দনুর নির্দেশের আরো কোনো গূঢ় নিহিতার্থ খুঁজে বের করবার প্রয়াস পায়।

সালমা ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় পড়ায়। মালদার মুসলমান সমাজ বর্ধিষ্ণু। সালমা তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলাপ জমায়। নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যাকে কাজে লাগায় সে। মধ্যবয়সী পুরুষ ও রমণী এই দুই জাতই তাকে সমাদর করে। কেননা এই উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে তার আকর্ষণ। তার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার শরীর মধ্যবয়সী পুরুষকে উত্তেজনা যোগায় আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে ঈর্ষার বীজ বপন করে। তবুও কেউই তার আকর্ষণ এড়াতে পারে না।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ে তারা। আটজন দশজনের দল হয়। বড় দল করতে হলে সামর্থ্যের জোর চাই, জানোয়ার চাই। সে সব এখন কিছুই নেই।

ছোট ছোট দল এখন যায় রাজশাহী, রঙপুর, দিনাজপুর, আবার কখনো কখনো পূর্ণিয়া, কাটিহার, বারাউনি পর্যন্ত। কিন্তু পশ্চিমে তার বেশি আর যায় না। পশ্চিমের ভীতি এখনো তাদের মারাত্মক। কারণ পশ্চিমে একসময় ধ্বংস এসেছিল, জলস্তম্ভ হয়েছিল যা রহুকে ভাসিয়ে নিয়েছিল। পশ্চিমে গোরখপুরে ভূমিকম্পে বিশাল ভূ-খণ্ড মাটিতে বসে গিয়েছিল।

পনেরো বছর মালদা শহরকে কেন্দ্র ক'রে বাজিকরেরা থাকল। মহানন্দায় প্রতি-বছর বর্ষার সময় জল উপচে পড়ত। কোনো কোনো বছর বন্যা আসত। উত্তরের সমস্ত জল নিয়ে গঙ্গা আসত উঁচু হয়ে। মহানন্দার জল ঢালার জায়গা থাকত না, কাজেই সে দু'কূল ভাসাত। শহরও তা থেকে নিস্তার পেত না। বাজিকরেরা দলবল নিয়ে পিছিয়ে আসত।

এভাবে প্রতিবছর তারা পরের জমিতে অস্থায়ী বাসা বাঁধত। ক্রমে জীর্ণ তাঁবু-গুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর নতুন ক'রে তৈরি হল না। তখন তারা থাকত খোলা মাঠে অথবা খড় এবং তালপাতার ছাউনির নিচে।

যারা টাঙ্গা চালাত তারা দেখেছিল গঙ্গা পার হয়ে অনর্গল মানুষ আসছে। কালো রঙের মানুষ, তারা সাঁওতাল; তামার মতো রঙের মানুষ, তারা ওরাওঁ; আসত আরো নানান জাতের মানুষ, যাদের পরিচয় কেউ জনত না। তাদের নিয়ে আসত সাহেবদের আড়কাঠিরা। তারা যেত উত্তরের জেলাগুলোতে। সবাই জানত, ভীষণ খাটিয়ে মানুষ তারা। তারা জঙ্গল পরিষ্কার করত, পাথর চটাত, নদীর পাড়ের বাঁধ বানাত, চা-বাগানের নতুন পত্তনিতে কুলি হতো। সবাই জানত তারা বড় অল্পে সন্তুষ্ট। সবাই জানত র'াচী, হাজারীবাগ, দামিন-ই-কোতে সাহেবরা তাদের মাজা ভেঙে দিয়েছে। তাই তারা ঘরছাড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে যে কোনো মূল্যে।

জিল্লু, পরতাপ, বালি এবং পিয়ার, এই চার বাজিকর দূরের থেকে সারিবদ্ধভাবে চলা এই সব কালো মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকত। কখনো চকিতে মনে হতো, আরে, এই মানুষটা তো চেনা! হায়রে, এই সেই মানুষ? হায়রে!

শহরে জমিদার বদিউল ইসলামের বিরাট বড় বাড়ি। তার আস্তাবলে বেশ কয়েকটি ভাল জাতের ঘোড়া ছিল। ভালো জাতের ঘোড়া বাজিকরের চোখে পড়বেই। তারা সবাই জানত বদিউল ইসলামের ঘোড়াগুলো ভালো। কিন্তু বালি বলে, ভালো তো কি? ওগুলো তো মাঠে চরে না।

আর মাঠে চরলেই বা কি? কোথায় যাবে বাজিকর? আর কোথায় যাবে?

কিন্তু বদিউলের ঘোড়াগুলো ভালো, একথা বাজিকর জানত। তার মধ্যেও সবচেয়ে সেরা সাদা রঙের একটা আরবী মাদী ঘোড়া। এ ঘোড়ার জন্য বদিউলের সবই পৃথক বন্দোবস্ত ছিল। খাওয়ার জন্য বাছাই চানা আর বাদাম, থাকার জন্য আলাদা আস্তাবল, এমন কি মশা-ডাঁস যাতে জ্বালাতন না করতে পারে তার জন্য মশারির ব্যবস্থাও ছিল। ঘোড়ার নাম দুলদুলি।

কেউ চড়ত না এ ঘোড়ায়, এমনকি বাদিউল নিজেও নয়। গাড়িও টানত না সুন্দরী এই ঘোড়া। তবে কেন তাকে এত আদর, এসব প্রথম প্রথম ভেবে অবাক হতো বাজিকর। এখন আর হয় না। এটি বদিউলের সৌভাগ্যদায়ী জিনিস

মাদার। জিন তুষ্ট থাকে এই ঘোড়ার আশ্রয়ে। অথবা, ঘোড়া তো স্বয়ং জিন। তাই তার এমন বন্দোবস্ত।

অবশ্য এত সমাদরের কারণ আছে। বদিউল অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান। দোষের মধ্যে আমোদ-প্রমোদে একটু বেশি মগ্ন থাকত। খবর রাখত না নায়েব শোভারাম মজুমদার কিভাবে জমিদারী চালাচ্ছে।

শোভারাম ছিল শিক্ষিত, কিন্তু বদিউল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। শোভারামের গোপন উচ্চাভিলাষ ছিল স্বয়ং জমিদার হওয়ার। এটা এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়। নায়েবরা জমিদার হামেশাই হয়।

ফলে রাজস্ব বাকি পড়তে থাকে, যদিও বদিউল ছিল অত্যন্ত রাজভক্ত। শোভারাম সাহেবদের খুশি রাখত প্রচুর খানাপিনা এবং উৎকোচ দিয়ে।

কিস্তির তাগিদ এলে শোভারাম আর্জি জানাতো অত্যন্ত বিনীতভাবে। হুজুরের এখন বড় দুর্দিন চলছে, আরো কিছুদিন সময় দিতে সরকারের আজ্ঞা হয়। এভাবে একজন কালেকটর পার ক'রে দিল শোভারাম।

কিন্তু দ্বিতীয় কালেকটরের বেলায় বিষয়টা এত সহজ হল না। রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশে বদিউলের জমিদারী খাসে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল কালেকটরকে।

কিন্তু কালেকটর বদল হলেও সহকারীরা বদল হয় নি। তারা অনেক পয়সা খেয়েছে শোভারামের। তাদের পরামর্শে কালেকটর রাজস্ব-বোর্ডের কাছে বদিউলকে অন্তত একবারের মতো ক্ষমা করবার জন্য আবেদন করা হল। কালেকটরের কথামতো বদিউল নিজে খাজনার টাকা সংগ্রহ ক'রে রাজসরকারে জমা করল। তাছাড়াও, শোভারামকে মৃদু তিরস্কার ক'রে এবারের মতো ক্ষমা ক'রে দিল বদিউল।

কিন্তু শোভারাম তখন তিরস্কার কেন গাল খেতেও রাজি ছিল। জমিদারীর তছরুপ করা টাকায় পূর্ণিয়ায় তার ছোটখাটো একখানা জমিদারী তখন কেনা হয়ে গেছে। বদিউলকে খুব বেশি আমল দেওয়া এখন আর তার দরকারও ছিল না। ফলে পরের বছরই আবার কিস্তির টাকা বাকি পড়ল।

কালেকটরের সহকারীরা এবারও টাকা খেয়ে শোভারামকে সাহায্য করছিল। কিন্তু রাজস্ব-বোর্ডের উত্তপ্ত চিঠি পেয়ে কালেকটর এবার আর কারো কথায় কর্ণপাত করল না। শোভারাম ও বদিউল দু'জনকেই কারারুদ্ধ করল সে।

এই অপমানকর বন্দীত্ব বদিউলের কাছে মৃত্যুসম হয়েছিল। ক'দিন আগেই ছেলেকে বদিউল খাগড়ার মেলায় পাঠিয়েছিল ঘোড়া আর একটা উট কিনতে। ঘোড়া জিনকে তুষ্ট করার জন্য, আর উট কুরবানীর জন্য। গ্রেপ্তারের সময় ছেলের সঙ্গে দেখা হল না। বদিউল একেবারে ভেঙে পড়ল।

এসব ঘটনার আগেই অবশ্য বদিউলের বৈঠকখানায় সালমার যাতায়াত শুরু হয়েছিল। বদিউলের ইয়ারেরা এ আশ্চর্য রমণীর খোঁজ পেয়েছিল যথাসময়েই।

তাদের আবদারে শোভারাম সালমাকে ডেকে এনেছিল। মাঝেমধ্যেই বদিউলের বৈঠকখানায় সালমার ডাক পড়ত।

বয়স্ক ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষগুলোর মাঝখানে সালমা যেন ইন্দ্রাণী। বদিউলের ইয়ারেরা তার সঙ্গে নানা গোপন বিষয়ে আলোচনা করত, পরামর্শ নিত, ভাগ্য গণনা করাত এবং যৌবনকে ধরে রাখার পদ্ধতি-প্রক্রিয়া জানতে চাইত। এইসব সময় বদিউল ফারসির নল নিয়ে চুপচাপ বসে মৃদু মৃদু হাসত। নিজে কখনো ইয়ারদের সমক্ষে এসব লঘু বিষয় নিয়ে আলোচনায় যেত না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সালমার আলাপ করার ভঙ্গি, প্রতিপক্ষকে বোকা বানাবার কৌশল সে মনে মনে খুবই তারিফ করত।

ক্রমে সালমার সঙ্গে বদিউলের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। বদিউল সালমার সাহচর্য ভালোবাসত এবং দু'জনে নিরালায় গল্পগুজব ক'রে দীর্ঘ সময় কাটাত। এ ছিল নিতান্তই দু'জন বয়স্ক মানুষের আলাপ।

যেমন বদিউল বলত, কি আক্ষেপ বিবি, বয়সের সময় তোমার দেখা পেলাম না!

সালমা বলত, কেমন, মিয়া, বয়সের সময় দেখা পেলে কি সাদি করতে আমাকে?

—সাদি বড় ছোট কথা বিবি, তাতে মন ভরত না।

—বয়সটা কি এমন বেশি হয়েছে মিয়া? দেখই না একবার চেষ্টা ক'রে এ বয়সেও প্রেম জমে কিনা।

—হ্যাঁ, সেকথা তুমিই বলতে পার, সালমা বিবি। বয়স তোমার পোষা পাখি, তুমি ডাক না দিলে আসবে না। নাকি, যৌবন তোমার পোষা পাখি, সদাই তোমার অঙ্গে লেপ্টে আছে?

—কি কথাই শোনাও, মিয়া। ধর, একটু পান খাও।

এ অভ্যাসটি বদিউলের দান। বদিউল সালমাকে পানে তাম্বূলে জড়িয়েছে।

সালমা বলে, দেখ সাহেব, যৌবন বুড়োতেও চায়, যৌবন শিশুতেও চায়। কিন্তু সব বয়স্ক মানুষ যদি পিছন ফিরে নিজের যৌবনের দিকে তাকায় তো কি দেখে?

—কি দেখে?

—দেখে, সেথায় খালি ভুল আর চুক। খালি দুঃখ। সে দুঃখের আসান হওয়ার আগেই বয়সে টান ধরে ভাটির। সে ভুল শোধরাবার আগেই দেখ বয়স তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে এমন জায়গায় যেখানে শোধরাও আর না শোধরাও তো বয়েই গেল।

—আরে সেই তো মজা। সেই তো যৌবনের আসল জিনিস।

—কি জানি, তোমরা সোনার পালংকে শুয়ে মানিকের দানা খাও। তোমাদের কাছে বয়স বোধহয় এমনই মজার ছিল।

—কি আক্ষেপ বিবি, বয়সের কালে তোমায় পেলাম না।

—এই তো পেয়েছ মিয়া, নেও না লুটে॥

—হাঃ হা, ভালো বলেছ, এই তো পেয়েছি, নিই না লুটে, না? আরে এখন লুটবে কে? সে লুটেরার হদিশ পাই না বহুকাল।

এরকম সম্পর্ক হয় বদিউলের সঙ্গে। বালি বলেছিল, পিসি, এই সুযোগে বুড়োকে বলে কিছু জমিজমার সুরাহা ক'রে নাও না আমাদের জন্যে। তোমার কথা তো শোনে বলে শুনেছি।

সালমা সম্পূর্ণ নিরাসক্তের মতো বলেছিল, বলে দেখব।

পরের দিন নিরালায় বদিউলকে সে বলেছিল, সাহেব, কিছু কাজের কথা আছে।

—কাজের কথা? কি ভীষণ! সালমা বিবি—তুমি যে কাজের লোক একথা জানা ছিল না।

—ঠাট্টা রাখ, সাহেব। সত্যিই কাজের কথা আছে।

কাজের কথা শুনে বদিউল গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। শেষে বলেছিল, দেখ তুমি আমাকে ভাবালে। কাজের কথা আর কাজের লোক এই দুই ব্যাপার থেকে আমি সব সময় দূরে থাকি। সেজন্যই তো শোভারামের মতো কাজের লোক নায়েব রেখেছি। এখন তুমি যে সমস্যায় ফেললে এ নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে, শোভারামের কাছে খোঁজখবর নিতে হবে, ভালোমন্দ বিচার করতে হবে, এত সব ব্যাপার। তার থেকে তোমার যদি কিছু টাকা পেলে চলে তো বল, এক্ষুণি তার বন্দোবস্ত করছি।

সালমা বলেছিল, আমার কিছু দরকার নেই, মিয়া। আমি যেমন আছি তেমনই থাকতে চাই। দরকার বাজিকরদের। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, সারা দুনিয়ায় দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই।

বদিউল তারপরে সায় দিয়েছিল। বলেছিল, ঠিক আছে, শোভারামের সঙ্গে কথা বলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করব।

কিন্তু এসব কিছু করার আগেই বদিউল গ্রেপ্তার হয়ে যায় শোভারামের সঙ্গে। তার দিনকতক পরে খাগড়ার মেলা থেকে ঘোড়া আর উট নিয়ে ফেরে তার ছেলে। তিনটি সুদর্শন ঘোড়ার মধ্যে একটি এই দুলদুলি, ভারি লক্ষ্মীমন্ত এবং তেজী চেহারা।

ছেলে জামাল ফিরে এসে ভালো মুরুব্বি দিয়ে কলকাতায় বদিউলের মামলার তদ্বির শুরু করল ভালোভাবে। রাজস্ব-বোর্ড কালেকটরের কাজ অনুমোদন করল না। কেননা বদিউলের ভদ্রলোক হিসাবে খ্যাতি ছিল। বদিউল জামানের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে লাটসাহেবের বিরক্তিজ্ঞাপক চিঠি পেল কালেকটর। বদিউল মুক্তি পেল সসম্মানে, কিন্তু শোভারাম মুক্তি পেল না। তার নিজস্ব সম্পত্তি নিলাম ক'রে কালেকটর বদিউলের বকেয়া কিস্তি পরিশোধ ক'রে নিল।

জেল থেকে ফিরে আসার পর বদিউল কয়েকদিন বিশেষ কারো সঙ্গেই দেখা করল না। তার বন্ধুবান্ধবরাও এসে ঘুরে যেতে থাকল। কিন্তু সালমা আসে প্রতিদিন।

সামান্য দু'চারটে কথা বলে বদিউল, অধিকাংশ সময়টাই দু'জনে চুপচাপ বসে থাকে।

সালমা বলে, সাহেব, নতুন সাদা ঘোড়াটা খুব পয়মন্ত ঘোড়া।

বদিউল তার বিশ্বাস মতো কথাটা ধরে নেয়। বলে, হ্যাঁ, সেটা আমিও ভেবেছি। দেখ, ঘোড়াটা বাড়ি আসল, আর আমার উপর থেকে জিনের কুদৃষ্টি কেটে গেল। ও ঘোড়ার ইজ্জৎ দিতে হবে।

তারপর তুলতুলির জন্য সমস্ত রাজকীয় ব্যবস্থা হয়।

বদিউল বলে, বাজিকরদের জমির ব্যাপারটা আমার মনে আছে। দু-একদিনের মধ্যেই নতুন নায়েবের সাথে কথা বলব ও নিয়ে।

সালমা বাধা দেয় তাকে। বলে, ওসব এখন থাক, মিয়া। আগে সামলে ওঠো. তারপরে দেখা যাবে।

২১

মালদা শহর থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল তফাতে পুনর্ভবা ও টাঙ্গন নদী দু'টি এক জায়গায় মিলেছে। বলা ভালো টাঙ্গন এসে পুনর্ভবায় পড়েছে। এই সঙ্গমের উত্তর অংশে দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বর্তমানে আগাছার জঙ্গলে পূর্ণ, বসতিহীন পৃথিবী সেখানে এখনো আদিম। বর্ষার সময় থেকে শীতের শুরু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল থাকে জলমগ্ন। উত্তরের বিশাল অঞ্চলের জল নামে এই দুই নদী দিয়ে এবং সেই জলের একটা বড অংশ এই ব-দ্বীপ সদৃশ অঞ্চলে বছরের কয়েকমাস জমে থেকে এই ভূখণ্ডকে আদিম ক'রে রেখেছিল। উত্তরের বালি মিশ্রিত পলি ক্রমশ জমে জমে এই জলাভূমির মধ্যে অসংখ্য ঢিবি তৈরি করেছে। জল যখন সরে যায় তখন প্রথমে মাথা তুলে দাঁড়ায় এই ঢিবিগুলি। শীতের প্রারম্ভে জল যখন সরতে থাকে তখন মনে হয় সারিবদ্ধ জলজন্তু রোদ পোহাচ্ছে পিঠ উঁচু ক'রে।

লবণ ব্যবসায়ী সাহেবদের এক সাহেব গোমস্তা নদীপথে চলার সময় কোনো এক দিন এই জঙ্গলাকীর্ণ জলার মধ্যে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল। যে সব জায়গায় জল জমে না সেই সব উঁচু জায়গায় একধরনের ঋজু গাছের প্রাচুর্য দেখেছিল সে। অভিজ্ঞ মানুষটা দু-এক নজর দেখেই বুঝেছিল এ গাছগুলো শাল, যদিও পরিচিত শালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি। খর্বাকৃতি, সেই কারণেই বোধ হয় আরো বলিষ্ঠ এবং স্থূল।

চারদিকে তখন রেলের লাইন বসছে নতুন উদ্যমে। রেল মানেই সাহেবদের সমৃদ্ধি, রেল মানেই শাসক আরো সুরক্ষিত। রেল লাইন বসছে সাহেবগঞ্জ-ভাগলপুরে, রেল লাইন বসছে শান্তাহার থেকে পার্বতীপুর, পার্বতীপুর থেকে কাটিহার। আর রেলের জন্য তো দরকার প্রচুর কাঠের এবং অবশ্যই শাল কাঠের।

আশেপাশে শালের প্রাচুর্য কোথাও নেই। লবণের গোমস্তা সাহেব রাতারাতি সরবরাহকারী ঠিকাদার হয়ে গেল। কে যাবে ঐ অজগর জঙ্গলে নদী নালার গোলোকধাঁধায় গাছ কাটতে? মানুষের কি অভাব আছে? লক্ষ সাঁওতাল ছিন্নমূল হয়েছে না? আর গাছ কাটতে, জমি উদ্ধার করতে তাদের সমতুল্য কে?

সেই তখন সাঁওতালরা প্রথম প্রবেশ করে রাজশাহীতে, দিনাজপুরে। তাদের দেখাদেখি এল মুণ্ডা এবং ওরাওঁরা এবং তাদের লেজুর ধরে ভূঁইয়া, তুরি, মাল, মাহালি, লোহার, কোলকামার আদি ছুট্‌কো খেটে-খাওয়া মানুষের দল।

বদিউল ইসলাম সেইখানে জমি দিয়েছে বাজিকরদের। প্রথম তিনবছর কোনো খাজনা নেই, তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে। বাজিরা চার যুবক একদিন এল সেই জমি দেখতে। এর নাম জমি? হায় কপাল!

কেন কি এমন খারাপ জমি ? পাথর তো নেই, কাঁকর তো নেই। তার. উপরে দেখ, কেমন জলের আয় আছে।

এ কথা বলে সাঁওতালরা। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ঘর সাঁওতালের বসত এর মধ্যেই হয়ে গেছে জায়গাটায়। পনেরো-বিশ ঘর ওরাওঁ-ও আছে।

তারা বলে, হাসিল জমি, তৈরি জমি কে দেবে তোমাকে ? আমরা জমি হাসিল করি, চালাক লোকে পরে তার দখল নেয়। যতদিন না নেয়, ততদিন তো জমি তোমার। ততদিনই আবাদ কর, ফসল কর, খাও। নিয়ে যদি নেয়, আবার খালাস করবে জমি। জমির কিছু অভাব আছে পৃথিবীতে ?

বালির মুখে এসব কথা শুনে পীতেম ধন্দুর ছেলেকে বলে, দে তো বাপ, কোমরের পিছনে দু'টো তামাচার ঠোকা দে তো। আস্তে দিস, তুই বড জলদিই যোয়ান হয়ে যাচ্ছিস। তবে যোয়ান জলদিই হওয়া দরকার, কেন কি, আজ পৃথিবীতে জমির অভাব নেই, তবে কাল হবে।

তারপর সে বালির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, সাঁওতালরা আছে ? ওরাওঁরা আছে ?

– আছে।

– তবে বাজিকরও থাকবে, থাকতে তাকে হবে।

– তবে ব্যবস্থা করি।

– হ্যাঁ, করো।

বালি তারপরে দলের পরিবার এবং লোকগণনা করে। রাজমহলে এসেছিল কুড়ি ঘর বাজিকর, থানাদারকে হিসাব দিয়েছিল একশো পাঁচজন মানুষের। এখন তার থেকে বেড়ে-কমে দাঁড়িয়েছে ষোল ঘর মানুষ। মানুষের সংখ্যা পঁচাশিজন। প্রতি সমর্থ পুরুষ পাঁচ বিঘা ক'রে জমি পেয়েছে বদিউলের কাছ থেকে। সবই জংলা জমি, অর্থাৎ শুরুতে একেবারেই ঝাড়া হাত-পা।

কিন্তু 'ব্যবস্থা করি' বললেও ব্যবস্থা এত সহজে হয় না। ষোল ঘর মানুষের পাঁচ ঘর এই শহর ছেড়ে এখন আরেকটি অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে যেতে চায় না। পীতেম যে স্থিতির রসে দলের মানুষকে নিষিক্ত করতে চেয়েছিল এখন তা আবার কিছু অন্য রকম প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করল। মুক্ত পৃথিবীর এবং অজ্ঞাত রাস্তার ভয়াবহতা কি পরিমাণ বেড়েছে, সেকথা যাযাবরের থেকে ভালো কে বোঝে ? তাছাড়া বাজিকরের নিজস্ব রোজগারের পথও ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। কাজেই প্রথমে রাজমহল, তারপরে এই মালদার নতুন বৃত্তিসমূহ যে সামান্য স্থায়িত্বের জন্ম দিয়েছে, আর এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে গিয়ে সেটুকুকে হারাতে অনেকেই রাজি নয়। তাছাড়া আরো সমস্যা আছে। বাজিকর জানে না, পাঁচ বিঘা জমি মানে কতখানি

মাটি। বাজিকর জানে না, এই জমি কি ক'রে চাষোপযোগী করতে হয়। বাজিকর জানে না, বছরের কোন সময় বীজ বপন করতে হয়, কখন কাটতে হয়।

বালি বলে, শিখে নেব সব। বাজিকর তো বোকা নয়!

কিন্তু তার গলায় যতটা আহ্বানের আন্তরিকতা থাকে লড়াই করার জোর ততটা থাকে না, কেননা জমি নিয়ে যে জীবন, তার সঙ্গে বাজিকরের কত পুরুষের সংস্রব নেই!

বিরোধের কথা শুনে পীতেম প্রথমে কিছুটা দমে যায়। এরকম সে ভাবে নি। তার দলের মানুষেরা তার ইচ্ছা এবং পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যাবে, একথা তার পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরে চিন্তা করে, দলের সত্যিকার কর্তৃত্ব সে বহুকালই করছে না, অথবা কর্তৃত্ব করার মতো বিশেষ কিছু নেইও আর। গত বিশ বছরে যেসব বড় বড় ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো এত শক্তিশালী যে পীতেমের আয়ত্তের বাইরেই তা ছিল। তাছাড়া, গোরখপুরে তিনশো ঘর বাজিকর ছিল। কোথায় গেছে তারা? পৃথিবীর কোন প্রত্যন্তে? আর কোথায় এসেছে পীতেম? যেদিন রন্থ তার দল নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়েছিল সেদিনের মানুষেরা কে কোথায় গেছে, তা কি কেউ জানে? কী নামে এখন তারা পৃথিবীতে পরিচিত? তারা কি রন্থর নাম পর্যন্ত মনে রেখেছে? কে দিল তাদের নাম বাজিকর? সে তো রাস্তার নাম! এমন হোক না তার নাম বালি কর্মকার, জিল্লু টাঙ্গাওয়ালা, কি বিষেণ ঠাটারি? পীতেম কি তাই চাইছে না?

তাই পীতেম বালিকে ডেকে বলে, যারা যেতে চাইছে না, তাদের বলো, আমি চাই যে আমরা একসঙ্গে থাকি। তবুও যদি তারা একত্রে না থাকে, তবে থাকুক তারা এখানে। দূরের দেশে তো মানুষের কুটুমও থাকে। তারা আমাদের কুটুম হয়ে থাক। আমরা চল আরেকবার আমাদের কপাল ঠুকে দেখি।

পিছনে পড়ে রইল চার ঘর বাজিকরের সতেরো জন মানুষ। আরেক ঘরকে বালি শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পেরেছিল। পিছনে পড়ে রইল সালমা। পীতেমকে এ ব্যবস্থাও মানতে হল। বদিউল এরকম শর্তই করেছিল। ক্রমশ বদিউলের সঙ্গে সালমার সম্পর্ক এমনই এক পর্যায়ে এসেছিল যে অন্যান্য বন্ধুবান্ধব বদিউলের কাছে একেবারেই পরিত্যজ্য হয়েছিল। সালমা ভেবেছিল, এও এক বড়লোকি খেয়াল, একসময় খেয়াল কেটে গেলে সে নিষ্কৃতি পাবে। বদিউল অবশ্যই সেভাবে সালমাকে আটকায় নি। সে বলেছিল, এ বয়সে তুমি আর ওদের সঙ্গে গিয়ে করবে কি? তার থেকে যে ক'দিন বেঁচে থাকি, এসো বুড়োবুড়িতে এক নতুন খেলা খেলি। লোকে দেখুক প্রেমের খেলা শুধু যুবকদেরই একচেটিয়া নয়।

সালমা বলেছিল, মানুষ হাসবে না?

—হাসুক।

বদিউল থোড়াই পরোয়া করে মানুষের কথার।

কিন্তু সালমা ভেবেছিল পীতেমের কথা। ধন্দুর বউ নতুন মানুষের সঙ্গে ঘর করছে। ধন্দুর ছেলে জামির, যে সবে যোয়ান হয়ে উঠেছে, সে তো সালমার কাছেই মানুষ। তাছাড়া, এতদিনের অভ্যাস।

তবুও বদিউলের আবদারের মধ্যে কোথাও যেন সুপ্ত ছিল একটু দাবি অথবা বাজিকরদের জমির বিনিময়ে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা।

কাজেই কাতর পীতেমকে সে বলেছিল, পীতেম, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়।

—তাই বলে তোকে দিয়ে যাব?

—আমাকে কি আর দরকার আছে তোর?

—নেই?

পীতেম আঁতকে উঠেছিল। সালমা বোঝে, দীর্ঘদিনের মৌনতার সময়ে পীতেম শিশুর মতো তার উপরে নির্ভর করত। এখন অনেকটা স্বাভাবিক হলেও পীতেম একাকিত্বের কথা ভাবতে পারছে না।

কিন্তু সে নিজে তো তেমন পীড়িত বোধ করছে না! হয়ত, এই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সারাজীবনে কোনোকিছুই তাকে তেমনভাবে আটকে রাখল না। বয়স স্বাভাবিক নিয়মে না হলেও মন্থরভাবেও তাকে ভেঙেছে। বয়সের বার্ধক্য, শরীরে প্রৌঢ়ত্বের ক্লান্তি। পৃথিবীর রঙ এখন তার কাছেও বিবর্ণ। তবুও কোনো কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারছে না কেন! এই যে ছেলেটাকে সে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করল, যা সে সারাজীবনে এই একবারই করেছে, সেই জামিরও কেন তাকে

আটকে রখেতে পারছে না! অবশ্যই বদিউলকে প্রতিদান দিতে হবে। কিন্তু সে কি এইভাবে! সর্বস্ব খুইয়ে!

এখন যেন এভাবেই সে কাতর হতে চায়, অথচ সর্বস্ব খোয়াবার যন্ত্রণা সে তার অভ্যন্তরে টের পায় না। বয়স স্বাভাবিকভাবে যেসব দুঃস্বপ্ন আনে, তার তাড়নায় এখন সে নিজেকে অত্যন্ত সংগোপনে নিতান্ত দুর্ভাগাই মনে করে। কিন্তু স্বভাবের মধ্যে যে দম্ভ দীর্ঘকাল ধরে লালন করেছে, সেই দম্ভই তাকে এখনো পরিচালিত করে এবং এসব দুর্বলতর চিন্তা পীতেমের কাছেও প্রকাশ করতে পারে না।

কাজেই পীতেমকে সে সান্ত্বনা দেয় ঐভাবেই। বলে, পীতেম, কিছু পেলে কিছু দিতে হয়। বদিউল অমনি তোদের জমি দেবে কেন?

যদিও পীতেমকে সে ভালো করেই চেনে, তবুও কোথায় যেন এক কাঙাল, যাকে সে ধরতে চিনতে পারে না, আশা করে, পীতেম বলুক, চাই না জমি, তবু তুই থাক আমার কাছে।

পীতেম একথা বলে না। সালমা জানে পীতেম এ কথা বলতে পারে না। পীতেম বলে, তবে তাই হোক। রহুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বাজিকর গেরস্থ হোক।

সালমা থেকে যায়। বদিউল তার জন্য নতুন ঘর তুলে দেয়, মাসোহারার বন্দোবস্ত করে। গাই-মোষ কেনে কয়েকটা। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ দুধ-ঘির বন্দোবস্ত নিয়ে দিন কেটে যায় তার। বিকেলে বদিউলের কাছে যেতে হয় তাকে। মানুষটাকে খারাপ লাগে না তার। তার কাছে সারাজীবন ধরে যেসব মানুষ এসেছে বদিউল তাদের থেকে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক। বদিউল শুধু বৃদ্ধ বয়সের একাকিত্বের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য সালমার সাহচর্য চায়।

সালমা কাটায় এক নিরুপদ্রব জীবন। তার গরু-মোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে ক্রমশ। অঢেল দুধ দেয় তারা। পশুবিক্রির ব্যবসাও সে তারপর শুরু করল। এজন্য তাকে লোক রাখতে হয়। খরচ করার কোনো দরকার তার ছিল না, কাজেই পয়সা নিজস্ব নিয়ম অনুসারে বাড়ে এবং সালমা নেশাগ্রস্ত হয় সেই বাড়ানোর প্রক্রিয়াতে। উদ্বৃত্ত পয়সা দিয়ে সে কেনে সোনা। গলার পুঁতির মালা সরিয়ে রেখে সে পরে এক ছড়া মোটা বিছাহার। অন্য কোনো গহনা সে পরে না। কারণ সে বোঝে গহনা পরার বয়স তার নেই এবং সে আকাঙ্ক্ষাও তার হয় না। গলায় ভারী বিছাহার পরে এই কারণে যে, তার যে পয়সা কাছে, এটা অন্যের বোঝা দরকার। পয়সা মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষমতা আশপাশের মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দেয়।

কি করবে সালমা এত পয়সা দিয়ে? বাজিকরদের দিয়ে দেবে? কেন দেবে? দিলে কি তাদের অভাব মিটবে? অভাব মিটবে না, একথা সালমা বোঝে। আর দেওয়ার আগ্রহও সে বোধ করে না। মালদা ও জামিলাবাদ, যে দুই জায়গায় বজিকরেরা স্থায়ী হয়েছে, তারা দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, একথা

সালমা জানে। কখনো কখনো কেউ কেউ আসে তার কাছে, আসে সাহায্যের জন্য। সালমা দু-পাঁচ টাকা দিয়ে বিদায় করে তাদের, তার বেশি কিছু করে না।

উদ্বৃত্ত পয়সা দিয়ে সে নতুন ব্যবসা শুরু করে। বন্ধকী এবং সুদের ব্যবসায়ের এক বিচিত্র উত্তেজক নেশা আছে। সালমা সেই নেশায় আচ্ছন্ন হয়।

বদিউল বলে, বিবি, শুনতে পাই অনেক পয়সা কামাচ্ছ, খাবে কে এতসব পয়সা ?

— সে কথা আমিও ভেবেছি।

— কি ভেবেছ ?

— মিয়া, তোমার বাপ-ঠাকুরদা সম্পত্তি রেখে গেছে, তুমি সারাজীবন খরচা করলে। হিসাবও রাখলে না কিসের থেকে কি হয়। তোমার নেশা খরচা করা। আর দেখ, বুড়ো বয়সে আমার নেশা হল পয়সা করা। ভোগ করার বয়স নেই, ইচ্ছাও নেই, অথচ পয়সা ক'রে যাচ্ছি।

— প্রশ্নটা তো আমার তাই। করছ কেন ?

— নেশায় করছি। তুমি যেমন নেশায় খরচ করছ, আমি তেমনি নেশায় পয়সা বানাচ্ছি। পয়সা তো মানুষ শুধু ভোগ করার জন্য করে না।

— কি জানি ? ভোগ ছাড়া পয়সা আর কোন কাজে লাগে কে জানে ?

কয়েক বছর এইভাবে কেটে যাওয়ার পর সালমা পীতেম ও জামিরের কথাও ভুলে যায়। পয়সার টান তাকে এমন এক স্বার্থপর জগতে নিক্ষেপ করে যেখানে অন্য সব সম্পর্ক মূল্যহীন হয়ে যায়। সমস্ত দিন তার কেটে যায় নানা ব্যবসাপাতির কাজে। পীতেম জামিলাবাদ চলে যাওয়ার পর আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি সালমার। পীতেমের পক্ষে এই দূর রাস্তা হেঁটে বা ঘোড়ায় আসা আর এই বয়সে সম্ভব নয়। চেষ্টা করলে সালমা হয়ত যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু তা সে করে না।

উত্তরে শেষ ভূখণ্ড জামিলাবাদ। তারপর উত্তর ও উত্তর-পূর্ব কোণে যতদূর চোখ যায় শুধু জলা আর জঙ্গল। মানুষ সেদিকে যায় না। এতকাল এমন নিয়মই ছিল।

কিন্তু সেই নিয়ম প্রথমে ভাঙে সেই গোমস্তা সাহেব, যে পরে ঠিকাদার হয়েছিল। কিন্তু সাহেব সেখানে বসতি স্থাপন করে নি বা কাউকে বসতি করায়ও নি। সেসবের দরকার তার ছিল না। কিন্তু যাদের নিয়ে এসে সে গাছ কাটিয়েছিল তাদের স্থানাভাব ছিল। সাহেব চলে যাবার পর তারা জামিলাবাদের দুই ক্রোশ উত্তরে আরেকটি গ্রাম পত্তন ক'রে মানুষের ভৌগোলিক দূরত্বকে আরেকটু বিস্তৃত করেছিল।

সাঁওতালদের নতুন পত্তনি সেই গ্রামের নাম এখন নমনকুড়ি। পরে পনেরো-বিশ ঘর ওরাওঁ এসে সাঁওতালদের কাছ থেকে স্থান চেয়ে নিয়ে তাদেব আলাদা পাড়া তৈরি করেছিল।

পীতেম তার দলবল নিয়ে জামিলাবাদ আসে আশ্বিনের শেষে। তারা জানত বর্ষায় সে অঞ্চল জলমগ্ন থাকে, কাজেই আগে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। পত্তনি করতে হলে খরার সময় করতে হবে। আশ্বিনের লঘু মেঘ দেখে পীতেম বলেছিল, চলো জামিলাবাদ।

চার ঘর বাদ দিয়ে আর সবাই জামিলাবাদ আসে। বদিউলের কাছারি-বাড়ি আছে সেখানে। বালি সেখানে ম্যানেজারের চিঠি দেখায়। কাছারির গোমস্তা অবশ্য খবর আগেই পেয়েছিল। বাজিকরদের মাতব্বরদের সে কতকগুলো অনির্দিষ্ট দিক দেখায়। বলে, ঐ যে দেখ গ্রাম, ও হল সাঁওতালদের নতুন পত্তনি নমনকুড়ি। এখান থেকে কাছে মনে হচ্ছে, নয়? কাছেই, তবে ক্রোশ দুয়েক হবে। নমনকুড়ির বাঁয়ে ঐ যে ঢিপিগুলো সবে মাথা তুলছে, ওখানেই তোমাদের জমি। মাপ-জোখের দরকার নেই, আগে খালাস তো কর, ভিটা তোল. মাটি কেটে, তারপরে ওসব দেখা যাবে।

পীতেম দূরে তাকিয়ে শুধু জলা আর জঙ্গল দেখে। আশ্বিন শেষ হতে চলল, এর পরে আর জল নামবে কবে। নিজের ভেতরে হতাশার ফাঁপা শূন্যতা টের পায় সে। জামিরের কাঁধের উপর হাত দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে পীতেম। সব ক'জন মানুষ তাকিয়ে আছে সামনের দিগন্তবিস্তৃত আদিম ভূমিখণ্ডের দিকে।

পীতেম চেষ্টা করেও ঝাপসা চোখের দৃষ্টি দিয়ে সেখানে মাটি ও খড়ের সারিবদ্ধ বাড়ি ও ফসলের খেতের স্বপ্নলোক তৈরি করতে পারে না। আচ্ছা, পাড়াটা যদি এদিক থেকে শুরু করা যায়, তাহলে ঐ বড় ঢিপিটা কেটে সমতল করতে হবে। তারপরে আরো মাটি তুলে পাশের ডোবা নালা ভরাট করতে হবে। এপাশের এই আগাছার জঙ্গলটা কম ক'রে আধামাইল তো হবেই। আগাছার জঙ্গল যখন

আছে, ওর নিচে মাটিও নিশ্চয়ই শক্ত। ঐ জঙ্গলটাকে উৎখাৎ করতে হবে। তাহলে সব মিলিয়ে অন্তত না হোক বিশ-পঁচিশ বিঘা জমি ঐ টিপিটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাবে। তা যদি হয় – কিন্তু এই তিরিশ চল্লিশ বিঘা জমি হাসিল করা কতজন মানুষের কতদিনের কাজ ? এ কি সম্ভব !

পীতেম বালির দিকে তাকায়, তাকায় পরতাপের চোখে। যুবকরা কি ভাবছে ? যুবকরা কি তাকে অপদার্থ ভাবছে ? এই ব্যবস্থা তো কোনো মানুষকেই খুশি করতে পারে না। আর জল ! কোন যাযাবর জলের কাছে থাকতে চায় ?

গোমস্তা লোকটি এদের ভাবভঙ্গি দেখে এবং বোঝে। বলে, ভয়ের কিছু নেই বাজিকর। ভয় একমাত্র সাপকে। তা সাপ এখানে কিছু আছে বটে। তা ধর যত জোঁক আর তত সাপ।

সাপ ! বাজিকর ভানুমতি দেখায় বটে – কবজ, তাবিজ, মাদুলি দেয় বটে, কিন্তু সাপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক কোনোকালেই নেই।

– কেন সাপে ভয় কি ? সাপও আছে, মানুষও আছে। সাপও মরে, মানুষও মরে। তা-বাদে সাপ বেশি মরে, মানুষ কম মরে। সবশেষে সাপ মানুষের থেকে তফাত থাকতে চেষ্টা করে, না, কিরে, আছলাম ?

গোমস্তার সঙ্গী হেসে সায় দেয়।

গোমস্তা বলে, এই যে জামিলাবাদ, এও তো নয়া আবাদই। ক'বছর হল হল আছলাম ?

—ক' বছর আর, এই তো বছর পনেরো হবে। এই তো সিদিনের কথা। মনে নাই তোমার চাচা, গঙ্গার পানি সেবার যেন আছমান ছোঁবে, চরের জমি বেবাক ডুবল ? বাপ বললে আর চরে থাকব না।

—হাঁ, বছর পনেরো হবে। তা দেখ, বাজিকর, এখন কেমন জমজমা। তবু বলি, আছলাম। চর ছেড়ে বড় ভাই ভালো কাম করে নি। সেই বানের পরে না ভূতনির দিয়াড়া অত বডটা হল ? আমরা ছেড়ে আসলাম, তাবাদে বাদিয়ারা এসে দখল নিল। আমরা যদি থামি দিয়ে থাকতাম, কোন শালার ক্ষমতা ছিল ভূতনির দখল নেয় ? আমরা, না দিয়াড়া মোছলমান ?

– তা যা বলেছ, চাচা, চরের জমি আর খেয়ারের জমি, কোনো তুলনা হয় ?

গোমস্তা আর তার ভাতিজা তাদের পুরনো কথাতে ঢুকে যায়। তারা গঙ্গার দিয়াড়া অঞ্চলের মুসলমান। চিরকাল সংলগ্ন ভাগলপুর ও পুর্ণিয়ার বাদিয়া মুসলমান-দের সঙ্গে তাদের বিরোধ চরের জমি নিয়ে। লড়াইয়ে কোনো পক্ষই কম যেতনা, কিন্তু শেষপর্যন্ত যেন বাদিয়ারাই জিততে থাকে। এখন শামসি, রতুয়া, মানিকচক, ভোলাহাটের গঙ্গা সংলগ্ন জমি অধিকাংশ বাদিয়াদেরই হাতে। স্থানীয় চাষীদের পিছিয়ে আসার কারণ শুধু বড় বানই নয়, বাদিয়াদের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারে নি।

বাজিকরদের কানে এসব কথা ঢোকে না। তারা এখনো সামনের দিকেই তাকিয়ে আছে। তাদের কারো কারো চোখেমুখে আতংক, কারো বিরক্তি। পীতেমের মুখের ভঙ্গি ভেঙে পড়ার মতো। বালি, পরতাপ, জিল্লুর কপালে দুশ্চিন্তার কুঞ্চন। কেউ কোনো কথা বলে না।

হঠাৎ একসময় বালক জামির চিৎকার ক'রে ওঠে, ঐ যে, মানুষ ?

তার কণ্ঠস্বরে আগ্রহ এবং আবেগ ছিল। সবাই তাকিয়ে দেখল, আধা ক্রোশ দূরে একটা খাড়ির মুখে একখানা ডিঙ্গি এসে লাগল। দু'জন মানুষ সেই জল-জঙ্গলের ভেতর থেকে জামিলাবাদের দিকে আসছে।

বাজিকরেরা খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে, যেন তারা আশ্চর্যজনক কিছু দেখছে।

সেই দু'জন মানুষ কখনো জঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে যায়, আবার কোনো বাঁকে দেখা যায় তাদের। দু'জন কৃষ্ণকায় মানুষ।

—হাঁ, মানুষই তো!

আছলাম বলে, মানুষ নয় তো কি জিন বেরোবে এই সকাল বেলা! দেখ চাচা, কেমন আটাশ যাচ্ছে সব!

—আরে, ও তো হাড়মা আর গান্দু। একজন হল সাঁওতাল পাড়ার, আর জন হোল ওরাওঁ পাড়ার। সওদা নিতে আসছে।

সেই যে জামিরের আগ্রহের চিৎকার 'ঐ যে, মানুষ!' —এই দু'টি কথা পীতেমের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার উল্লাস। বালি, পরতাপ আর জিল্লুর কপালের চামড়া অনেকটা সরল হয়েছিল এই শব্দ দু'টি শুনে।

গোমস্তা বলেছিল, দু-চার দিন থাক এই কাছারির মাঠে। তারপর নিজেরা দেখা-ভাল ক'রে বাঁশ কাঠ পোঁতো, ভিটের পত্তন কর। এমনি করেই হয়।

বালি, পরতাপ, জিল্লু হাড়মা আর গান্দুর সঙ্গে আলাপ করেছিল। তারা যখন ফিরে যায়, তখন যেচে তাদের সঙ্গে অতিথি হয়ে তাদের গ্রামে গিয়েছিল।

দূরের থেকে যতটা ভয়াবহ মনে হয়েছিল, নমনকুড়িতে এসে ততটা খারাপ লাগে নি তাদের। পলি জমি, কাদা তেমন নেই। এটা যেমন একদিকে ভালো, আবার অন্য কোনো একদিকে খারাপও। বাড়ি তৈরি করার আঠালো শক্ত মাটি পাওয়া মুশকিল। তবে সাঁওতালরা সে সমস্যার সমাধানও করেছে। পলির মধ্যেও এঁটেল মাটির চাঙর দু-চারটা পাওয়া যায়। সেখানে খুঁজলে শক্ত মাটি পাওয়া যায়। কষ্টসাধ্য কাজ, কিন্তু এমন কষ্ট তো করতে হবেই রে, ভাই। কেউ কি আর তোমাকে হাতে তুলে খাওয়াবে, শোওয়ার জন্য ঘর গেরস্থালি গুছিয়ে রাখবে?

হাড়মা বলে, কষ্টে আছি, তবে শান্তিতে আছি। এতদূর ঠেলে কেউ ঝামেলা করতে আসে না।

সব পরিবারই দু-এক বিঘা ক'রে জমি খালাস ক'রে নিয়েছে। তার বেশি জমি খালাস করা এখনো সম্ভব হয় নি। এখন পর্যন্ত এসব জমি অকৃপণ ফসল দেয়। অবশ্য এখানে একটা 'কিন্তু' আছে, 'যদি' আছে। জল যদি তেমন বেশি নামে এই নাবাল জমিতে, তবে কিছুই করার নেই। সবই ডোবে। কাজেই ভিটার জমি প্রতি বছরই, প্রতি বছর কেন, সময় পেলেই উঁচু করতে হয়। ভিটাতে তরকারির আবাদ হয় ভারি চমৎকার। তরকারীর আবাদের সময় জল থাকে নামার মুখে, কাজেই সেটা মার যায় না। তাছাড়া গাই আছে প্রতি ঘরে দু একটা, মুরগি আছে একপাল ক'রে, আছে শুয়োর। এইসব জানোয়ারের খাবারেরও অভাব নেই। জঙ্গল এখনো যা আছে তাতেও কিছু আয় হয়। জামিলাবাদের হাটে দুই ক্রোশ রাস্তা পায় হেঁটে সাঁওতাল, ওরাওঁরা তরকারী, মুরগি, ডিম, জ্বালানি কাঠ, নানা ধরনের ফলফলাদি নিয়ে যায়।

বিপদ? প্রধান বিপদ একটাই, জল। টাঙ্গান আর পুনর্ভবা দুইই সারা বছর মরা নদী। কিন্তু বর্ষার সময় কত জল, কত জল। অসাগর জল।

আছলাম বলেছিল, তবেো কেন, পদ্মায় যদি পানির টান থাকে তবেই বাঁচোয়া। টাঙ্গান এসে পানি ঢালছেন পুনর্ভবায়, আবার তেনার তো নিজেরই তখন বহর ভারি। সেই পানি তিনি নিয়ে ফেলবেন মহানন্দায়, আর মহানন্দা নিয়ে সোজা নিচমুখি হয়ে ঢালবেন সেই নবাবগঞ্জ পেরিয়ে পদ্মায়। এখন পদ্মা যদি আগেই ভারভারিক্কি হয়ে থাকেন, তো হল কাম। তখন নমনকুড়ির পাথার একাই ভাসে না, জামিলাবাদও ভাসে। ভয় কি? আমরা তো এমনি করেই আছি।

বালি দেখে সবাইই অভয় দেয়। সাঁওতালরা তো সোল্লাসে গ্রহণ করে তাদের। অর্থাৎ সবাইই চায় মানুষ বাড়ুক এখানে। কিন্তু কিছুতেই সে হদিশ করতে পারে না কোথায় খুঁটি গাড়বে সে প্রথম?

এ সমস্যারও সমাধান করে নমনকুড়ির মানুষ। নমনকুড়িতে ঘর বাঁধার মতো প্রশস্ত জায়গা এখন কিছু অবশ্যই বাড়তি হয়েছে। বাজিকরদের সমর্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সাঁওতালদের কাছ থেকে ধার ক'রে কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে অচিরে মাটি কাটতে শুরু করে। সাঁওতাল, ওরাওঁরা তাদের যোগায় সাহস আর পরামর্শ। নতুন ভিটায় মাটি পড়তে থাকে ঝপাঝপ।

জামিলাবাদে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ ছিল। বস্তুত হিন্দুরাই এখানকার পুরনো বাসিন্দা। মুসলমানরা এখানে পরে এসেছে। তবে হিন্দুদের সংখ্যা এখনো বেশি। এরা গোপ সম্প্রদায়ের লোক। জামিলাবাদ থেকে তিন ক্রোশ পশ্চিমে হিঙ্গল নামক গ্রামে তাদের আদি বাস। নিকট অতীতে এইসব গোপেরা অন্য জায়গার স্বজনদের দেখাদেখি নিজেদের সমাজের মধ্যে কিছু কিছু বিভেদ উপস্থিত করে। যদিও বেশ কিছুকাল ধরেই তারা পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কৃষির মধ্যেও নিযুক্ত করেছিল, তবুও হিঙ্গলের গোপেদের মূল জীবিকা ছিল পশুপালনই।

আঠারো শতকের শেষদিকে ও উনিশ শতকের গেড়ায় দেশে ঘনঘন খাদ্যসংকটে সরাসরি সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য কেনার ব্যবস্থায় কৃষিজাত পণ্যের দাম দ্রুত বাড়তে শুরু করে। অ-কৃষিজীবী মানুষ এ কারণেও বেশি বেশি ক'রে কৃষিকর্মের দিকে মন দিতে থাকে।

হিঙ্গলে এই নিয়ে নতুন সমাজ সদগোপ ও যারা স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী নয় এমন পশুপালক স্বজনদের মধ্যে তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। হয়ত এর মধ্যে কিছু স্থানীয় কারণ ছিল এবং সেই কারণই একই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সংঘর্ষমূলক ভাঙন ত্বরান্বিত করে। গোপ ও সোদগোপ, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপেরাই বা কিসে নিকৃষ্ট, এই প্রশ্ন তুলে হিঙ্গল ছেড়ে জামিলাবাদে এসে নতুন বসত করে। ক্রমে এই বিভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সবরকম সামাজিক ক্রিয়াকর্মও বন্ধ হয়।

জামিলাবাদের গোপেরা কৃষিকর্ম করত বটে, কিন্তু তাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুপালন। আশপাশের মেলা ও হাটগুলোতে তাদের ঘরের গরু ও মোষের কদর ছিল। জামিলাবাদ ও তার আশপাশে পশুচারণের অফুরন্ত জায়গা থাকাতে এইসব গোপেরা পশুপালনই অধিকতর লাভজনক মনে করত।

নয়নজুড়ির নতুন পত্তনির বাজিকরেরা জামিলাবাদের ঘোষেদের এই পশুপালন ব্যবস্থাটার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল। কেননা, পশুপালন বিষয়টা তাদের জানা বিষয়ের মধ্যে ছিল। কৃষিকর্ম বাজিকরেরা কোনোদিন করে নি। তাছাড়া কৃষিকর্মের মূল বিষয় ধৈর্য ও অপেক্ষা। সেটা তাদের স্বভাবের মধ্যে ছিল না। চন্দ্র, সূর্য, তিথি ও নক্ষত্র বিচারের জটিলতা আর কৃষিসম্বন্ধীয় অনুধাবন, কৃষিজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে অবশ্যম্ভাবী। বাজিকরের ভ্রাম্যমাণ প্রবৃত্তি করা স্বভাবের সঙ্গে এটা সহজে খাপ খেতে চাইল না। প্রথম বছরের সামান্য প্রচেষ্টা দিয়েই পীতেম বুঝল, এ একটি এমন বিদ্যা যা বংশানুক্রমিক শিক্ষা দ্বারা অর্জন

করতে হয়। যেনতেন ভাবে কৃষিকর্ম করা যায় না এবং যদি কৃষিকর্মেই বাজিকরকে স্থায়ী হতে হয়, তাহলে তার জন্য আরো অনেক মূল্য দিতে হবে।

তাই পীতেম যখন দেখল বালি ইত্যাদি বাজিকরেরা জামিলাবাদের ঘোষদের সঙ্গে বেশি সখ্যতা করছে এবং এদিক ওদিক থেকে গরু মোষ নিয়ে আসছে, সে আপত্তি করার কোনো কারণ দেখে নি। প্রথমত, দনু পৃথিবীর যাবতীয় মাঠে চরা জানোয়ারের মালিকানা বাজিকরকে দান করেছিল। সুতরাং বাজিকরেরা এই দুঃস্থ অবস্থাতেও কোথা থেকে এতসব ভালো ভালো জানোয়ার নিয়ে আসছে, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তার মনে ওঠে নি। আর, দ্বিতীয়ত, পশুপালন ও কৃষি, এই দুইএর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাত্রাজ্ঞান তখনো বাজিকরের মধ্যে আসে নি।

এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পরতাপ। সে সাঁওতালদের সঙ্গে সমান তালে জমি খালাসের কাজ ক'রে যাচ্ছিল এবং খালাসী জমিতে শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করছিল।

হাডমা বলেছিল, গত দু'বছরে নমনকুড়ি ছেড়ে বর্ষার সময় অন্যত্র যেতে হয় নি। এ লক্ষণ অত্যন্ত ভালো। এর আগে প্রতিবছরই বর্ষা ঘন হয়ে নামলেই নমনকুড়ির সমস্ত মানুষকে জামিলাবাদে উঠে আসতে হতো। এই দু'বছর প্রকৃতি কিছুটা সহায় আছে এবং সামান্য কিছু হলেও আমন মরশুমে মানুষ চাষ কিছু করতে পারছে।

বাজিকরেরা আসার পরবর্তী দু'বছরেও বন্যা নমনকুড়িকে ডোবাল না, বরং জল যেন ক্রমশই কম জমছে। ফলে সাঁওতাল ওরাওঁরা প্রতিবছরই আরো বেশি ক'রে আমন চাষ করতে শুরু করে।

পরতাপ আদিবাসীদের সমান তালে চাষের কাজে আত্মনিয়োগ করে। তার সঙ্গে থাকে তার ভাইপো জামির। পরতাপের পশুপালন এবং পশুপ্রজননেও সমান উৎসাহ।

পশু বিক্রি করতে গিয়ে পরতাপ একবার রাজসাহীতে চলনবিল অঞ্চলে এক বিচিত্র ধানের চাষ দেখে আসে। রাজসাহী নমনকুড়ির বিল অঞ্চল ছাড়িয়ে শুরু হয়েছে। পরতাপ দেখেছিল জলের মধ্যে ধানের গাছ। চলনবিল অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল নমনকুড়ির মতোই জলা অঞ্চল। সেখানে মোটা দানার একধরনের ধান হয়। বর্ষায় জল যেমন বাড়ে ধানের গাছও তেমনই বাড়ে। দেখেছিল অন্য বাজিকরেরাও, কিন্তু পরতাপ ছাড়া কেউ উৎসাহ দেখায় নি। পরতাপের উৎসাহ ছিল, তাই সে খোঁজখবর নেয়।

ধানের নাম বুনো ধান। বিল অঞ্চলে জল যখন কম থাকে বীজ ছিটিয়ে দেয় চাষী। দু-একটা চাষ দিয়ে আউশের মতোই ছড়াতে হয় বীজ। তারপর ধানের চারা জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে। জলের সঙ্গে এ এক বিচিত্র প্রতিযোগিতা। ধান পাকার সময় জল কিছু কমে বটে, কিন্তু কাটতে হয় নৌকা ক'রে। শীষের নিচ থেকে এক হাত খড় পেল তো যথেষ্ট। ফলন হয় অজস্র।

পরতাপ এসব খোঁজখবর নেয় গভীর অধ্যবসায়সহ। তারপর ফেরার পথে এক মণ বীজধান সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে। ভিতরে সে খুব উত্তেজনা বোধ করে. নমনকুড়ির সাঁওতালরা জানে না, এমন আবাদ করবে সে এবার। আর আর বাজিকরেরা তার বাড়িতে ধানের পোয়ালের স্তূপ দেখে, নতুন মাটির ভিটায় কলাগাছের ঝোপ দেখে, দেখে বেগুন আর ঢেঁড়সের চাষের অফুরন্ত ফলন। এতে প্রত্যেকেই কিছুটা ঈর্ষা বোধ করে। কিন্তু এর জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয় বাজিকরেরা তাতে রাজি নয়। পীতেম লক্ষ করে পরতাপের ভিতরে সেই বিচিত্র নেশার জন্ম হয়েছে, যার কথা লক্ষ্মণ সোরেন তাকে বলেছিল। ধানের গাছ যখন গাভর হয়, কলার গাছে যখন মোচা আসে, সবজিতে যখন ফুল আসে, পীতেম লক্ষ করে পরতাপের ভাবভঙ্গি অন্যরকম হয়ে যায়, যেন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে সে।

তারপর বুনোধানের চাষ ক'রে সমস্ত অঞ্চলে পরতাপ একটা সাড়া তুলে দেয়. জামিলাবাদের ওস্তাদ মুসলমান চাষীরাও বিস্মিত হয় এই চাষ দেখে। তারা দিয়াড়া অঞ্চলের মানুষ, বিল অঞ্চলের চাষ তাদের জানা নেই। কাজেই পরতাপ এখন সবার পথপ্রদর্শক হয়।

পীতেম পরতাপকে দেখে স্বস্তি পায় এখন। স্থায়ী মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সে এখন যেন আয়ত্তের মধ্যে দেখে। বয়স তাকে এখন প্রায় সম্পূর্ণই অক্ষম ক'রে ফেলেছে। তবু তার ইচ্ছা হয় কাস্তে কিংবা নিড়ানি হাতে নিয়ে পরতাপের মাঠে গিয়ে সে একবার নামে। শীতের সকালে পরতাপ ও জামির যখন মাথায় ক'রে পাকা ফসলের ভার এনে উঠোনে ফেলে, সে দু'হাত দিয়ে তাদের স্পর্শ নেয়, গন্ধ শোঁকে এবং নতুন ধান শীষ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটে। জামির তাকে ধরে নিয়ে এসে ধানের স্তূপের পাশে বসিয়ে দেয়। সে লাঠি দিয়ে শুয়োর আর মুরগি তাড়ায়। এভাবে সে একাত্ম বোধ করে এই নতুন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে।

জামিলাবাদ-নমনকুড়িতে শীত বড় বেশি পড়ে। পরতাপ আশা করে নি পীতেম এই শীত পার করতে পারবে। কিন্তু পীতেম শীত পার করে। সম্ভবত পাকা ফসলের ঘন সান্নিধ্য তাকে সঞ্জীবনী দান করেছিল। এতকাল ধরে মনের অভ্যন্তরে সে সযত্নে যে আকাঙ্ক্ষা লালন করেছিল, পরতাপ তাকে সেই অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে। ধান ও তা থেকে রূপান্তরিত চাল, যাকে বাজিকর 'সোঁকা' বলে, এমন বিহ্বল ভাব সৃষ্টি করতে পারে, তা পীতেম কেন, পরতাপই কি জানত? তাই পীতেম বেঁচে থাকে অন্তত সেই শীত ও বসন্ত, যখন মাঠ থেকে পরতাপ ও জামির ফসল কেটে আনে, যখন পাগড়ি বাঁধা পরতাপকে পুরোপুরি চাষী গেরস্থের মতো দেখায়, জামিরের তরুণ পেশীগুলো সূর্যের আলোয় যৌবনের ইঙ্গিত দেয়, যখন পরতাপের বউ ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে আঁচল ঠিক করে।

পীতেম এইভাবে পরতাপের সুস্থ শ্রমার্জিত গরম ভাত খায় মাঘ ফাল্গুন চৈত্র.

বৈশাখ মাস। তারপর একসময় গরম ভাত তার মুখে বিস্বাদ লাগতে শুরু করে, তেতো লাগে। প্রথমে সে ভেবেছিল এসব সাময়িক শারীরিক ক্লেশ, কিন্তু পরে তার ভুল ভাঙে। সে তখন ঘন ঘন দমুকে দেখতে শুরু করে, অথচ দমুর মুখ প্রশান্ত। সে রহুকেও দেখে। তাদের ঘরের উত্তর দিক দিয়ে যে নালাটা গিয়ে পুনর্ভবায় মিশেছে, সেখানে জ্যোৎস্নালোকে কিংবা আলোআঁধারি নির্জনতায় সে রহুকে ঘুরে বেড়াতে দেখে। রহুকে তার প্রফুল্ল মনে হয়। দমু তাকে বলে, পীতেম, রহু তোমাকে ডাকেন।

পীতেম বলে, বাপ হে বাপ, দাঁড়াও, আমি যাই, আমি যাই।

সে বার বার আবেগের আর্তনাদ করে এবং পরতাপ ও জামিরের ঘুম ভাঙায়। তারা উঠে এসে তাকে স্পর্শ করে। ঘামে পীতেমের সারা শরীর ভেজা, তার চোখে পরিচিতির কোনো লক্ষণ নেই। সে পরতাপকে বলে, কে তুই?

পরতাপ তার মুখের কাছে ঝুঁকে বলে, আমি পরতাপ, বাপ। মুখে জল দিই, বাপ?

— পরতাপকে কে? আমি তো তোকে চিনি না!

— আমি তোমার বেটা, বাপ।

— কি করিস তুই, পরতাপ?

— আমি আবাদ করি, ফসল করি, বাপ।

— তুই ভিখ মাঙ্গিস না?

— না, বাপ।

— হাত পেতে গেহু আর সোঁকা নিয়ে ঝোলায় রাখিস না?

— না, বাপ।

— বাঁশবাজি, দড়িবাজি, বাঁদরনাচ করিস না?

— না, বাপ।

— আঃ, আমার মুখে জল দে।

পরতাপ জল দেয়, জামির তাকে দু'হাতে ধরে থাকে।

রাত কেটে গেলে পীতেম একটু স্বাভাবিক হয়। সে ঘোলাটে চোখে জামিরের মুখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, তুই কে?

— আমি জামির নানা, তোমার পোতা।

— তুই কি করিস?

— আমি কাকার সাথে হাল-জিরাতের কাম করি।

— তোর বাপ কে?

— আমার বাপ ধন্দু বাজিকর।

— ধন্দু বাজিকর কে?

— ধন্দু বাজিকর তোমার বড় বেটা, নানা।

—ধন্নুকে ডাক।

জামির চুপ ক'রে থাকে। পীতেম বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়। বলে, ডাক তোর বাপকে।

জামির চুপ ক'রে থাকে।

পীতেম আবার প্রসঙ্গ ভুলে যায়। বলে, বিগামাই, হারুবানে যাই।

পীতেম দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং তার গলার মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ ওঠে। তারপর সেটা বাড়তে থাকে।

জামিরের তখন নিজের গলার মধ্যেই যেন অস্বস্তি শুরু হয়। 'বিগামাই, হারুবানে যাই'—পীতেম বাজিকরের এই অন্তিম ইচ্ছা বা ভীতি কোন অজ্ঞাত দেবীর কাছে অর্ঘ্য, জামির তা পরিষ্কার বোঝে না। সে তার নানার গলার ভিতরের অস্বস্তিকর শব্দটার নিবৃত্তির জন্য নিজের অজান্তেই নিজে গলাখাকারি দেয়।

কিন্তু পীতেমের গলার ভেতরের শব্দ ক্রমান্বয়ে একঘেয়ে গোঙানিতে পরিণত হয় ও তার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করতে থাকে।

জামির দ্রুত উঠে বাইরে গিয়ে পরতাপ ও অন্যান্যদের ডাকে। সব ধরের বাজিকরেরা আসে। সবাই বোঝে পীতেম ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, তার বাক্শক্তি রহিত হয়েছে।

সবাই পীতেমের শয্যা ঘিরে দাঁড়ায়। যদিও কথা বলতে পারছে না, তবুও পীতেমের চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ এখন। সে চোখের মণি ঘুরিয়ে শেষবারের মতো তার স্বজনদের দেখে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

বালি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ও কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, সালমা পিসিকে খবর দেব, কাকা?

পীতেম তার দিকে চোখের মণি ঘোরায়, তার দৃষ্টি অত্যন্ত করুণ এবং সেই চোখ দেখে বালি কিংবা অন্যান্যরা তার ইচ্ছা বুঝতে পারে না।

পীতেম এই অবস্থায় দু'দিন থাকে ও তৃতীয় দিন ভোর রাত্রে সকলের অজান্তে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে।

সালমাকে খবর দেওয়ার জন্য বালি কিংবা পরতাপ কাউকে পাঠায় নি। কেননা এই দূরের রাস্তায় সালমার যদি আসার মতো অবস্থাও থাকে তবুও পীতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আশা ছিল না।

লুবিনির স্মৃতিতে সালমা ধূসর, কেননা তার জন্ম হয়েছিল মালদা শহরে এবং সেখানে যখন তার বছর পাঁচেক বয়স তখন দল চলে আসে নমনকুড়িতে। নমনকুড়িতে পীতেম বেঁচেছিল সাত বছর। এই সাত বছরের শেষ দু'বছর লুবিনির প্রতিপালনের দায়িত্ব পীতেম নিয়েছিল। সতেরো বছরের নবযুবক জামিরের দশ বছরের কনে লুবিনি। সুতরাং লুবিনির ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ পীতেমকেই করতে হতো।

জামির ও লুবিনি এইসময় পরস্পরের কাছাকাছি থাকত একটা সময়ই, যখন পীতেম বাজিকরদের পুরনো কথা ও দেশদেশান্তরের অভিজ্ঞতার গল্প বলত। এইসব গল্প ও কাহিনীতে জামিরের তো উৎসাহ ছিলই, লুবিনিও একাগ্রতার সঙ্গে এসব বুঝবার চেষ্টা করত। এইসময় ছাড়া জামিরের সঙ্গে লুবিনির বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হতো না। জামিরের মনোভাব বোধ্য। লুবিনি জামিরকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে ও বুঝতে শুরু করে এর অনেক পরে।

পনেরো জোড়া ছেলেমেয়ের সঙ্গে জামির আর লুবিনিরও বিয়ে হয়েছিল। সে সময় হরদম গুজব রটত, আর অধিকাংশ গুজবের বিষয়বস্তুতে সাহেবদের জড়ানো হতো। সাহেব যুক্ত থাকলে গুজব হতো জোরদার ও বিশ্বাসযোগ্য।

মহারানীর রাজত্বে ষোল বছরের ঊর্ধ্বের ছেলেমেয়েদের আর বিয়ে দেওয়া যাবে না, এরকম গুজব রটেছিল। সাহেবরা কলের গাড়ি লোহার রেলের উপর দিয়ে চালায়, সুতরাং সবই সম্ভব। সাহেবরা সব জমি দখল ক'রে নেবে নীল, তুঁত আর আফিং চাষ করবার জন্য—একসময় এরকম কথা অনেকেই বিশ্বাস করে নি, কিন্তু তারপর বহু জায়গায় জবরদস্তি এসব চাষ করার ব্যবস্থা সাহেবরা করেছিল, এ সবাই দেখেছে।

সুতরাং একদিনে তাড়াহুড়ো ক'রে ষোল জোড়া বাজিকর বালক-বালিকার বিয়ে দেয় পীতেম। লাল সুতোয় ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে সম্পূর্ণ বাজিকর রীতিতে বিয়ে। মেয়েরা গান গেয়েছিল 'লাল পাড়াজি রেশকি ডোরি—', 'দেও আওয়ে তো দেও রে, ভাই'—এইসব প্রাচীন গান।

পীতেম মারা যাবার পর লুবিনি খুব নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। পরতাপের বউ হায়া যদিও তাকে কাছে টেনে নেয়, তবুও তার মনমরা ভাব কাটে না। বাপের ঘরে তার কেউই ছিল না। বাপ-মা আগেই মারা গেছে। থাকার মধ্যে আছে এক নানা, এখন তাকে দেখারই লোক দরকার। সুতরাং হায়া লুবিনিকে কাছে টানে।

হায়ার নিজের ছটি সন্তান, তারা সবাই এখনো ছোট। কাজেই এতদিন লুবিনির

অবলম্বন হিসেবে পীতেম ছিল বলেই সে এদিকে মনোযোগ না দিয়েও পেরেছে। এখন তো অন্য কোনো উপায় নেই। তাছাড়া আরো একটি কারণে সে লুবিনিকে আড়াল রাখার ব্যবস্থা করে। যে কাজটা ছিল পীতেমের, এখন হায়াকেই তা করতে হয়। লুবিনি সবেমাত্র বারোয় পা দিয়েছে, কিন্তু জামিরের চঞ্চল চাউনি এখন তাকে অনুসরণ করে। ব্যাপারটায় হায়া ভীত হয়, কারণ জামিরের দৈহিক আকৃতি যে-কোনো রমণীর উদ্বেগের কারণ। এটা হায়া সভয়ে খেয়াল রাখে। অন্তত আরো বছর তিনেক না গেলে লুবিনিকে জামিরের কাছে পাঠানো আদৌ নিরাপদ নয়। জামির পীতেমের মতো শরীর পেয়েছে, দীর্ঘ সবল গাছের মতো চেহারা তার, লম্বা লম্বা হাত-পা।

এদিকে সে ছিল সহনশীল মানুষ। সে বুঝতে চাইত সবকিছু ও অপেক্ষা করত। কিন্তু এই উনিশ বছর বয়সে জামির কিছু চঞ্চল হয়েছিল, কেননা যৌবন এসেছিল প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। পীতেম তাকেও কিছুটা নিঃসঙ্গ ক'রে গিয়েছে। হায়া যে তাকে লক্ষ রাখে এবং লুবিনিকে সামলায় এ ব্যাপারটা বুঝে সে লজ্জা পায়। সে চেষ্টা করে আড়ালে থাকতে। সে চেষ্টা করে কাজকর্ম নিয়ে থাকতে। পীতেম তার ভিতরে গৃহস্থ হবার বাসনা অংকুরিত করেছিল, পরতাপ প্রত্যক্ষে তাকে কার্যকর করার রাস্তা দেখাচ্ছিল। আর জামির আরো একধাপ এগিয়ে হিঙ্গলের পতাকি ঘোষের মতো গৃহস্থ হওয়ার স্বপ্ন দেখত।

গৃহস্থ বটে পতাকি ঘোষ। এই না হলে গৃহস্থ! চারখানা মোষের ও চারখানা বলদের হাল পতাকির। যেমন মোষের চেহারা, তেমনি বলদের চেহারা। ধানের মরাই দশটা। তার পাঁচটা গাই-মোষ এবং ছ'-সাতটা গাই দুধ দিত অঢেল। ভীষণ বলশালী পতাকির যেমন দাপট তেমনি উদারতা। নিজে খাটত অসুরের মতো, চাকর-পাটকেও বসে থাকতে দিত না। আশ্চর্য মানুষ পতাকি তার চাকর-পাট-মুনিষ-মাহিন্দরের সঙ্গে প্রায় একত্রই থাকত এবং কারো মনোকষ্টের কারণ হতো না। পতাকিই প্রথম ব্যক্তি যে বলেছিল, 'আমি সদগোপ কিসের জন্য হতে যাব, আমার অভাবটাই বা কি আর আমি কমই বা কিসে?' আবার পতাকিই সেই ব্যক্তি যে গোপও থেকে গেল কিন্তু হিঙ্গল ছাড়ল না।

জামিলাবাদের গোপেদের সঙ্গে হিঙ্গলের সদগোপদের বিরোধ এখন একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়েছিল। কে কার ঘরের মেয়ে-বউকে ফুসলে বের ক'রে আনতে পারে এখন তারই প্রতিযোগিতা চলছে। ফলে এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে মাঝে-মধ্যে অশান্তি ও দাঙ্গা জমে উঠত। এ বিষয়েও পতাকির বৈশিষ্ট্য ছিল। সে বলত, কারো ঘরের মেয়ে-বউকে টেনে আনব না, যদি কেউ আসে ছেড়েও দেব না।

এই পতাকির সঙ্গে জামিরের আলাপ হয়েছিল হঠাৎই। পতাকির একটা মোষ পড়ে গিয়েছিল ছোট একটা নালার মধ্যে। চার-পাঁচজন মানুষ নিয়ে পতাকি দু'ঘণ্টা চেষ্টা করেও মোষটাকে তুলতে পারে নি। জামির সেই রাস্তা দিয়ে তখন ফিরছিল।

কিছু সময় দাঁড়িয়ে দেখে সেও হাত লাগিয়েছিল।

কিন্তু হাত লাগালে হবে কি? বাঁশ দিয়ে বুকের নিচে ঠেসে চাপ দিতে পতাকি আর্তনাদ ক'রে ওঠে, যেন তার বুকেই বাঁশডলা হচ্ছে।

জামির বুঝেছিল এভাবে হবে না। সে পতাকিকে বলেছিল, ঘোষমশায়, মোষ পড়েছে খন্দে, কাজটা হল এখন ওঠানো। না যদি ওঠাতে পারেন তাড়াতাড়ি খাম হয়ে যাবে জানোয়ারটা, কোনো কাজে আর লাগবে না। হায় হায় করলে চলবে?

পতাকি বলে, তুমি কি বুঝবে বাজিকরের পো, ঘর-গেরস্থালি কর না। কলজায় লাগে যে!

— কিন্তু ওঠাতে তো হবে?

— হাঁ, তা তো ঠিক। কিন্তু--

— বাস, আর কথা না। যান তো আপনি ঐ গাছতলায় পুবমুখা হয়ে দাঁড়ান, এদিকে দেখবেন না।

অনিচ্ছুক পতাকিকে হাত ধরে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দেয় জামির। অন্য লোকদের বলে, আসো ভাই, হাত লাগাও ঠিক মতো। বুকের নিচে আমি ধরব ঠেলে, তোমরা তিনজনে পেটের নিচে বাঁশের চাপ রাখো আর তোমরা কোমরের জড়ানো দড়ি ধরে টেনে পগারের উপরে ওঠাবে। দেখো, সবার দম যেন একসঙ্গে ধরে।

তারপর সে নতুন শেখা বোল ধরে— হিঃ— মারো— জোয়ান—

— হহঃ—

— হিঃ— আউর— থোরাসি—

— হহঃ—

— হিঃ তোমার বলে—

— হহঃ—

— হিঃ পর্বত টলে—

— হহঃ—

— হিঃ— বাপ ভাতারি—

প্রচণ্ড আওয়াজে অন্যেরা "হহঃ" বলে এবং মোষটি আর-র্‌-র্‌-র্‌ শব্দে মরণ আর্তনাদ ক'রে ওঠে। পতাকি আর পুবমুখো তাকিয়ে থাকতে পারে না। হাউ-মাউ ক'রে ছুটে আসে, মেরে ফেললে রে— মেরে ফেললে রে—

কিন্তু জামিরের বোল তখন সপ্তমে ঘোষের গুষ্টি-উদ্ধার করছে। ঘাড়ের উপরে বাঁশ ঠেলে নালার এক কোণে সে থামের মতো কোণাকুনি দাঁড়িয়েছে। হাত পা পিঠ বুকের পেশি ক্রুদ্ধ বাঘের মতো ফুলে উঠেছে। পতাকি হতবাক্‌ হয়ে যায়, হ্যাঁ জোয়ান বটে ছোকরা। অন্যেরা যদি সামান্য ঢিল দেয়, মুহূর্তে ঐ ঠেসে ধরা বাঁশ পিছলে গিয়ে পাঁজরের হাড় গুঁড়ো ক'রে দিতে পারে।

পতাকি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উঠেছে, উঠেছে। কোমরের বাঁধন ধরে যারা উপর দিকে টানছিল তারা এবার থামি দিয়ে দাঁড়ায়। জামির যেমন ছিল তেমন দাঁড়িয়ে থাকে, শুধু নিচের দিকে যারা বাঁশ দিয়ে ঠেলছিল তারা দ্রুত উঠে এসে সামনের দু'পায়ের নিচে মোষের ঘাড় ঘুরিয়ে দড়ি জড়ায়। ঘাড়ের থেকে বাঁশ সন্তর্পণে হাতে নিয়ে জামির চাড় দেয়, দড়ির টানে মোষ নালার উপরে উঠে আসে।

পতাকি বলে, সাবাস জোয়ান, বাহাদুর বটে তুমি বাজিকরের পুত!

এইভাবে পতাকির সঙ্গে আলাপ হয় জামিরের। সেদিন পতাকি তাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। দই কলা চিঁড়া দিয়ে যে ফলার খাইয়েছিল তাতে পরদিন পর্যন্ত জামিরের আর খাওয়ার কথা মনে হয় নি। জামির চারদিক তাকিয়ে দেখছিল গৃহস্থরা কাকে লক্ষ্মী বলে।

দ্বিতীয়বার পতাকির বাড়ি গিয়েছিল সে গাইকে পাল খাওয়াতে। পতাকির ষাঁড়টিও তার গর্বের বস্তু ছিল। এই ষাঁড় নিয়েও সদগোপদের সঙ্গে তার একটি রসিকতার সম্পর্ক ছিল। সদগোপদের কাছ থেকে সে ষাঁড় দেখাবার জন্য পয়সা নিত না।

—না ভাই, উঁচা জাতের কাছ থেকে পয়সা নিতে পারব না।

—কেন? বিনিপয়সায় আমরাই বা গাইকে পাল খাওয়াব কেন?

—না খাওয়াও না খাওয়াবে, তবে আমরা আমাদের ষাঁড়গুলোকে মাগনাই দিয়ে রেখেছি তোমাদের জন্য।

এতে সদগোপেরা অপমানিত বোধ করত এবং প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করত এবারে যে করেই হোক সদগোপ পাড়ায় ভালো ষাঁড়ের বন্দোবস্ত করতেই হবে। কিন্তু কার্যকালে তাদের আসতেই হতো পতাকির বাড়ি এবং অপমানও হজম করতে হতো।

জামিরও গাই নিয়ে দ্বিতীয়বার পতাকির বাড়ি ঢোকে। গভীর রাতে গাইটা ডাকতে শুরু করেছিল। গাইয়ের ডাকে তার ঘুম ভেঙে যায় ও ঘুম ভেঙে ডাক শুনে তার প্রথমে খুব আনন্দ হয়। শুয়ে শুয়ে সে ডাক শোনে, কী গভীর আকাঙ্ক্ষার ডাক—আঁ—আঁ—আঁ!

কিছুক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় গাইয়ের ডাক শুনতে শুনতে তার হঠাৎ অস্বস্তি বোধ হতে শুরু করে। খাদশী নুবিনি এখনো তার ভেতরে কোনো মানসিক আন্দোলন তৈরি করতে পারে নি।

শুয়ে শুয়ে পাশের ঘরে পরতাপকে হায়ার সঙ্গে কথা বলতে শোনে সে। গাই ডাকতে তারা দু'জনেই উৎফুল্ল। গাইটার এই প্রথম বারের ডাক, সুতরাং পরতাপ ও হায়া অনর্গল কথা বলতে থাকে। তারপর হঠাৎ তাদের কথা বলা বন্ধ হয়।

জামির আরো বিমর্ষ এবং বিরক্ত হয়ে যায়। চেষ্টা করেও সে আর ঘুমোতে পারে না। বাকি রাতটুকু এপাশ-ওপাশ ক'রে অন্ধকার থাকতেই সে ওঠে পড়ে।

পরতাপ ওঠার আগেই সে হিঙ্গল যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় গাই নিয়ে। গরুটাকে গোয়াল-জল খাওয়াবার বৃথা চেষ্টা ক'রে সে হাল ছেড়ে দেয়। নতুন ডাকা গাই ছটফট করছে, চমকে চমকে উঠছে, চাডিতে মুখও দিল না। জামির পরতাপের ঘরের সামনে গিয়ে একবার জানান দিয়ে গরুর দড়ি হাতে নিল।

শেষরাতে পরতাপ ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে বলল, হাঁ৷ বাপ, তাড়াতাড়ি যা, নতুন ডাকা গাই, ডাক বন্ধ কবলে আবাব কবে ডাকে। দেরি ক'রে লাভ নেই, যা বাপ।

জামির এক হাতে একটা বাঁশের লাঠি ও অন্য হাতে গরুর দড়ি ধরে বেরিয়ে পড়ে। লাঠি নেয় এই কারণে যেপথে উটকো ষাঁড় ঝামেলা করতে পারে। আড়াআড়ি গেলে হিঙ্গল জামিলাবাদের থেকে কাছে হয়। তবুও মাঠ ভেঙে দুই ক্রোশ রাস্তা কম নয়। তার উপরে হাতের দড়িতে বাঁধা ডাকা গাই। জামিরের মতো যোয়ানও গাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে হাঁফিয়ে যাচ্ছে। গাই তো হাঁটছে না, যেন ধেয়ে চলেছে, সঙ্গে জামিরকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জামির বলে, ব', ব', সবুর কর্।

সে হাসে আপনমনে। তার শরীরে উত্তেজনা ও পুলক জমে। গাইটার অসহায় অবস্থা সে মনে মনে উপভোগ করে। হায় রে, জানোয়ার, ডাকলে সাড়া পায়। আবার দেখ, তার মালিকও সমান উতলা হয়। আঃ হাহা, বায়, বায়, পথ কেন ভুল করিস?

না, জানোযারের পথ ভুল হয় না। বাতাস তার কাছে বার্তা নিয়ে আসে। কে যে তাকে পথ দেখায়, কে জানে। গাই ঠিক পথেই চলে। যেন গাইটাই জামিরকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথটা চিনিয়ে দেয়। জামির তার পিছনে পিছনে ছোটে। মাঝে মাঝে জানান দেয় গাইটা—আঁ—আঁ—আঁ। আবার কোনো দ্বিধা-বিভক্ত মোড়ে মুহূর্তখানেক থমকে থামে, আবার নিমেষে ঠিক রাস্তায় চলতে শুরু করে। জামির মজা দেখে। দেখ, জানোয়ার কেমন! কেমন চতুর এই গাই।

হিঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গাই আর কোনো বাধা মানতে চায় না। জামির বলে, দাঁড়া রে দাঁড়া, মালিকের অনুমতি নিই আগে। এমন অধীর হলে চলে!

পতাকি ঘোষের সীমানায় ঢুকে সে আচমকা একটা গাছকে ঘুরে এসে দড়ি বেড় দিয়ে গাইকে আটকে ফেলে। হঠাৎ বাধা পাওয়াতে গাই ক্ষিপ্ত হযে যায় যেন। জামিরকেই শত্রু মনে ক'রে অথবা বিরক্ত হয়ে শিং নাড়ে সক্রোধে। জামির তার শিং ধরে গলায়, পিঠে হাত বুলায়। বলে, ছিঃ! এমন অধীর হয়? মালিকের মত নিতে হবে না? গাই ঘাড় দিয়ে তাকে ঠেলে, যেন তাকে ব্যস্ততা দেখাতে বলে, আবদারের মতো, ভারী সলজ্জ তার ভঙ্গি এখন।

জামির হেসে ফেলে শব্দ ক'রে ও তার সঙ্গে অন্য কেউ হাসে পিছন থেকে। সে দড়ি বেঁধে পিছনে তাকায়।

পিছনে তাকিয়ে জামির যাকে দেখে সে নিশ্চিত রাধা, একথা জামির নিমেষেই যেন বুঝে ফেলে। এই রাধার কথা সে কেন, এ অঞ্চলের সব যুবকই শুনেছে। পতাকির বৈমাত্রেয় বোন রাধাকে নিয়ে গোয়ালা ঘোষ ও সদগোপ ঘোষদের মধ্যে ইতিমধ্যেই গোটাচারেক দাঙ্গা এবং একটা খুন হয়েছে।

হ্যাঁ, সে রাধাই বটে। বয়সে জামিরের থেকে বছর তিন-চারেব বড়ই হবে। সে যুবতী হাসছিল, এখন জামিরকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে সে জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে।

জামির তার দিক থেকে চোখ সরায় না, সরাতে পারেও না সে।

রাধা বলে, সবুর কি আর সবাই সইতে পারে, বাজিকর?

জামির এই নির্লজ্জতায়ও চমকে ওঠে না, তাকিয়েই থাকে। রাধাকে দেখার মতোই বটে।

রাধা আবার বলে, তুমি তো বাহাদুর বাজিকর বটে, না কি ভুল বললাম? সেদিন এক ঝলক দেখেছিলাম তো কেমন এক পালি দই চিড়া সাপটে দিলে?

জামির এবার মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, এ সেই বাজিকর বটে।

রাধা দাঙ্গার উপযুক্তই বটে। এমন নির্লজ্জ এবং রসিকা এ অঞ্চলে আর একটিও নেই। পতাকি তাকে সময়মতো বিয়েও দিয়েছিল, কিন্তু বদ্ধ জীবনে রাধা থাকতে পারল না। স্বামীকে ছেড়ে বছর না ঘুরতেই পালিয়ে এসেছে, আর যায় নি।

গাইটা শিং দিয়ে ধাক্কা দিতে জামিরের চমক ভাঙে। রাধা আবার হেসে ওঠে। জামির তার দিক থেকে চোখ নামায়। জিজ্ঞেস করে, ঘোষ উঠেছে?

—ওঠে নি! কখন মাঠে চলে গেছে।

—তবে তো মুশকিল হল। কার সঙ্গে কথা বলি?

—কথা বলার অবস্থা তো তোমার গাইয়ের নেই। পিছনের বাগানে নিয়ে যাও, আমি খামারু কাকাকে বলছি ষাঁড় ছেড়ে দিতে। দাদা এসে যাবে।

রাধা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসে ও ভিতরের দিকে যায়। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হয় যে জামির তাকে দেখছে, আবার হাসে।

জামির খুব ধৈর্যশীল মানুষ হলেও এই মেয়েটার মোহিনী এড়াতে পারে না। গাছ থেকে দড়ি খুলতে গিয়ে সে টের পায় তার হাত কাঁপছে। দড়ি খুলে গাই নিয়ে সে পিছনের বাগানে চলে যায়।

নির্দিষ্ট খুঁটোয় গাই বেঁধে জামির কিছুদূরে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসে থাকে। এখন বেশ কিছু সময় এভাবে তাকে বসে থাকতে হবে, ব্যাপারটা দেখতে হবে এবং নিঃসন্দেহ হতে হবে যে কাজ হয়েছে।

ছাড়া পেয়ে ষাঁড় ঠিক জায়গাতেই এসে হাজির হয়। জামির এখন নিশ্চিন্ত। সে গামছা দিয়ে ঘাড় গলা মোছে। এখন চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

অনেকক্ষণ বসে থাকে জামির। নতুন গাই, ত্রাস আছে মনে। জামির বিরক্ত বোধ করতে শুরু করে। হঠাৎ একটা ঢিলের টুকরো এসে তার পায়ের কাছে পড়ে, তার পর আরেকটা।

জামির দিকনির্ণয় ক'রে ঘন ঝোপের আড়ালে রাধাকে দেখল। রাধা একটা গাছে হেলান দিয়ে অন্যদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি খুবই মনোরম। একটা পা ভাঁজ ক'রে পিছনের গাছে ঠেকা দেওয়া, অন্য পা মাটিতে, সমস্ত দেহকাণ্ড তির্যকভাবে গাছে হেলান দেওয়া।

জামির প্রথমে ভয় পেল, তারপর নিজের মনেই হাসল, কিন্তু উঠল না জায়গা ছেড়ে। রাধা এবার পাশ ফিরে তাকাল তার দিকে। তার দৃষ্টিতে আহ্বান ছিল স্পষ্ট।

জামির কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। শুধু সম্মোহিতের মতো রাধাকে দেখছিল। রাধা কখনো আঙুলে আঁচল জড়াচ্ছিল, কখনো দাঁতে পাতা কাটছিল।

এইসময় জামির সামনের দিকে দূরে পতাকিকে মাঠ থেকে ফিরতে দেখল। একটা দীর্ঘ স্বস্তির প্রশ্বাস তার বুক হালকা ক'রে দেয়। বোঝে ভীষণ ভয় পেয়েছিল সে।

উঠে এসে জামির পতাকির রাস্তায় অপেক্ষা করে। সে আর পিছন ফিরে তাকায় না। ওঃ, কি ভীষণ মেয়েমানুষ! অথচ কি সুন্দর!

হিঙ্গল থেকে ষাঁড় দেখিয়ে আসার পর পঞ্চম দিনে গাই আবার অস্থির হয়ে ওঠে। গাইকে অস্থির হতে দেখে জামিরের হৃৎপিণ্ড আচমকা একটা লাফ দেয়। সে তাতে এমন চমকে ওঠে যে দ্রুত আশপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নেয় তার এই ভাবান্তর কেউ দেখে ফেলল কিনা।

রাতে শুয়ে তার ঘুম আসে না, সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তারপর গাই যখন তারস্বরে ডাকতে শুরু করে সে উত্তেজনায় শয্যার উপর উঠে বসে। হ্যাঁ, গাই ডাকছে, অর্থাৎ পাল ঝেড়ে ফেলেছে গাই, আর এর পরম্পরা কি তা ভাবতেই জামিরের এই উত্তেজনা।

ভোর না হতেই জামির গাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ চেনা পথে জানোয়ারটা এবার আরো দ্রুত চলতে থাকে।

আগের দিন পতাকিকে দেখে তার ধড়ে যেন প্রাণ এসেছিল। সে যে রাধার প্ররোচনায় যথার্থই ভয় পেয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি! অথচ তেঁতুল গাছের তলা থেকে উঠে রাধার কাছে যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। তার ভিতরে অনেক রকমের ভয়ের বীজ তখন অংকুরিত হচ্ছিল। তার মধ্যে অপরাধ-ভীতি থেকেও জাতের ভয় আরো বেশি ছিল। সে বুঝতে পারছিল রাধা তার আয়ত্তের মধ্যে, অথচ—! তখন তার একবারও লুবিনির কথা মনে হয় নি।

আর ঠিক সেই সময় সে পতাকিকে আসতে দেখেছিল। পতাকিকে তখন তার একমাত্র বিকল্প মনে হয়েছিল। পতাকির সঙ্গে কথাবার্তা বলে, জলটল খেয়ে আবার যখন সে এসে তেঁতুল গাছটার তলায় বসেছিল, তখন সে অনেকটা ধাতস্থ। তখন সেখানে অবশ্যই রাধা ছিল না। অথচ তার মনে হয়েছিল, রাধা যদি এখন একেবারে সামনে এসেও দাঁড়ায় তাহলেও সে আর অত ভয় পাবে না।

আচ্ছা, ব্যাপারটা কি এরকমই হয় নাকি? যেহেতু আশৈশব সে পীতেমের সান্নিধ্য বেশি করেছে এবং যেহেতু পীতেম তার বোধবুদ্ধিমতো তাকে অন্যরকম মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করেছে, স্বশ্রেণীর আর দশজন যুবকের মতো জামির এইসব অত্যন্ত স্বাভাবিক সম্পর্কগুলোয় তেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে নি।

কাজেই হঠাৎ তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, রাধার কি তার কাছে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল? এমনও তো হতে পারে, রাধা তাকে অন্য কোনো কথা বলতে চেয়েছিল। হয়ত, শুধু আলাপ করতেই চেয়েছিল? আর সে তার নির্ঘুম তপ্ত মস্তিষ্কে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছিল?

আবার শেষপর্যন্ত সে ভেবেছিল, সত্যিই কি রাধাকে ঐ ঝোপের মধ্যে পাচ্ছে

হেলান দেওয়া অবস্থায় সে দেখেছিল, না তার দৃষ্টিবিভ্রম? শেষে সে সিদ্ধান্ত নেয়, সে যাই হোক, রাধাকে এত ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু ফেরার পথে এ সবই ভুল প্রমাণিত হয়। মাঠে নামার আগে একটা বাঁশ-বাগানের ভেতর দিয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করতে হয়। রাধা যেন ওদিক থেকেই আসছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে বলে, খুব ধকল গেল আজ সারাদিন, না বাজিকর?

জামির কোনো উত্তরই দিতে পারে না। সে কোনোমতে একটু হাসতে চেষ্টা করে। সে শুধু চোখ তুলে একবার দেখে, রাধা তার সর্বাঙ্গ যেন চোখ দিয়ে জরিপ করছে। তার অনাবৃত দেহকাণ্ডে সে হঠাৎ অনুভব করে এক অস্বাভাবিক জড়তা। সে শুধু বলতে পারে, না, ধকল আর কি!

—ধকল নয়! নতুন বাছুরটাকে বাগানে খুঁজতে গিয়ে তোমায় দেখলাম তেঁতুল গাছের নিচে। ওঃ, সে খুব কঠিন অবস্থা তোমার!

রাধা আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে হাসে।

জামির হঠাৎ বুঝতে শুরু করে। সে বোঝে, রাধা কথা বানাচ্ছে এবং তাকে নিয়ে খেলা করছে। ধীরস্থির মানুষ সে, একটু একটু ক'রে নিজেকে ফিরে পায় এবার। বস্তুত রাধার কথার মধ্যে তাকে অপমানজনকভাবে নিগ্রহ করার একটা প্রচেষ্টা সে ধরতে পারে। জামির একটু উত্তেজিত হয় এবং বোঝে না রাধা এমনই চায়। সে এবার একটু গুছিয়েই বলে, তা হবে। তবে আমাদের ঘরের বাছুর আড়ালে গেলে তার মা ই তাকে ডেকে নেয়। ঘোষেদের ব্যাপার বুঝিবা আলাদা।

কারণ যাই হোক, রাধা উপেক্ষিত হয়েছে আজ এবং উপেক্ষা ঢাকবার জন্য একটা মনগড়া ব্যাখ্যা সে তৈরি করেছিল বাছুর হারানো নিয়ে। কেননা, উপেক্ষা কোনো রমণীই সহ্য করে না, আর সে যদি রাধা হয়, তাহলে তো প্রশ্নই নেই।

কথার ভঙ্গি আগের মতো রেখেই সে প্রত্যাঘাত করে। বলে, তা যা বলেছ বাজিকর, ঘোষেদের নিয়মকানুন বাজিকরদের থেকে একটু আলাদাই বটে। এই যেমন ধরো না, আমাদের মাঝে বেটাবিটির মাকেই তার মুতের কাঁথা ধোওয়া-শুকা করতে হয়। তোমাদের শুনি বিটির বে হয়ে গেলে সোয়ামীকেও সে কাজ করতে হয়?

ইঙ্গিতটা হঠাৎ ধরতে পারে না জামির, তবু এটা যে একটা মারাত্মক খোঁটা সেটা রাধার তৃপ্ত উজ্জ্বল চোখ দেখে বোঝে।

সে দ্রুত বলে, কেমন? এবং সঙ্গে সঙ্গেই রাধার নিক্ষিপ্ত তীরের গতিমুখ ধরতে পারে। তার চোখ নিমেষে নেমে আসে এবং সারামুখে এক ঝলক রক্ত ছড়িয়ে পড়ে তার ফর্সা সুদর্শন মুখমণ্ডলকে রক্তিম ক'রে। আচ্ছা, এ মেয়েটা তাহলে তার সম্বন্ধে খোঁজখবরও নিয়েছে? আচ্ছা! ওঃ, রাধা লুবিনির ইঙ্গিত করল!

রাধা খিলখিল ক'রে হাসে। যেন জামির তার ফাঁদে পড়া শিকার এমনভাবে বলে আঃ বাজিকর, বদনে তোমার কেমন রঙ ধরে গেল!

সে জামিরের আরো কাছে আসে, এত কাছে যে জামির তার নিঃশ্বাসের শব্দ এবং গায়ের ঘ্রাণ টের পাচ্ছিল। রাধা আবার বলে, তবে বিবির কথায় যে পুরুষের বদনে রঙ লাগে, বিবির জন্য তার মনে রঙ নাই—এ কথা আমি জানি।

জামিরের হাতের দড়িতে বাঁধা গাইটা এখন নিরুপদ্রব অস্তিত্ব। সে দড়ির গণ্ডিব মধ্যে ঘাস পাতা টেনে খাচ্ছিল, কেননা সারাদিনের উন্মত্ততায় তার খাওয়ার কথা মনে হয় নি, অথবা খাওয়ার ব্যাপারটাই অবান্তর ছিল।

জামির গাইয়ের দড়িতে টান দেয। তারপর বলে, কি জানি, শুনেছি অনেক পুরুষই তোমার দেখা আছে। তুমিই ভালো জানবে।

হাতের বাঁশ দিয়ে গাইকে তাড়িয়ে সে চলবার উদ্যোগ করে এবং সত্যিসত্যিই রাধার পাশ কাটিয়ে মাঠের দিকে এগোয়।

রাধা হঠাৎ চুপ ক'রে যায়। তার চোখের সামনে যে পুরুষ মানুটা এতক্ষণ ছিল তার নাভিদেশ থেকে কণ্ঠা পযন্ত দেহকাণ্ডটা বড দীর্ঘ এবং ভীষণ সবল। সেই মানুষ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাকে উপেক্ষা করল। সে চেষ্টাকৃত নিষ্ঠায় নিজেকে স্থিব বেখে তীব্রভাবে বলে, বান মারলাম, বাজিকর; গাই তোমার দশদিনের মধ্যে পাল ঝেড়ে ফেলবে। তোমাকে আবার আসতে হবে এখানে।

জামির ফিরে তাকায় না। তার মনে হয়, এক বিশেষ ধবনের উত্তেজক খেলায় সে জিতেছে, অথচ জেতাব পবেও তার আক্ষেপ থেকে যাচ্ছে।

সেদিনের ঘটনা এমনই হয়েছিল। কিন্তু নমনকুড়িতে ফিরে আসতে আসতে তাব সারা শরীরে জ্বলুনি শুরু হযেছিল। গাই নিয়ে যখন বাড়িতে ঢুকেছে তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নিজে হাত-পা ধোওয়ার আগে গাইটাকে গোয়ালে ঢুকিয়ে ঘাস জল দিচ্ছিল জামির এবং হায়াকে ডাক দিয়ে একটা লম্ফ চেয়েছিল।

সে সময় সে ছিল একটা ঘোরের মধ্যে। অথচ হাত-পা চালাচ্ছিল নিতান্ত অভ্যাস বশে। আর তখন লুবিনি লম্ফ নিয়ে গোয়ালে ঢুকেছিল। লম্ফটা একটা উঁচু জায়গায় রেখে সে জিজ্ঞেস করে, ষাঁড় দেখিয়ে আনলে?

জামির হঠাৎ ঘুরে লুবিনির দুই বাহুসন্ধি শক্ত ক'রে ধরে সামনে টেনে আনে। তার চোখ রক্তাভ, সমস্ত শরীরে ঘাম, মুখ বেয়েও ঘাম নামছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

লুবিনি ভীষণ ভয় পায়। তার চোখে আতংক চিৎকারে মূর্ত হওয়ার আগেই সম্বিৎ ফিরে পায় জামির। সে তার মুখ চেপে ধরে এবং নিজের চোখ বন্ধ ক'রে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তারপর বাঁ হাতখানা আস্তে ক'রে লুবিনির মাথায় রাখে।

লুবিনির মাথা তার বুক পর্যন্ত ওঠে নি। লম্ফের আলোতে তাকে একটা দৈত্যের সামনে পুতুলের মতো দেখায়। চোখ খুলে জামির হাত ধরে লুবিনিকে গোয়ালঘরের

বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। জামির খুব লজ্জা পেয়েছিল তখন।

তারপর রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে তার নানার কথা ভেবেছিল, সে ভেবেছিল তার না দেখা বাপের কথা, সে আরো ভেবেছিল তাদের গোটা বাজিকর জাতটার কথা।

তার নানা তাকে বলেছিল, বাজিকরকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সহ্য করতে হবে, দাম দিতে হবে। কোনো বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবি না, জামির—না নিজের, না পরের। এমন সব কথা বলত তার নানা।

কিন্তু দ্বিতীয়বার গাইটা যখন অস্থির হয়ে উঠল, তখন তার শরীরে রক্ত আবার ছলকে উঠেছিল। এবং কাল সারারাত সে ভেবেছে যে রাধা তার নিয়তি। আর এখন গাই নিয়ে যখন সে মাঠ ভাঙছে, তখন সে ভাবছে অন্য কথা। সে ভাবছে যে, আসলে সে আগাগোড়াই বিশ্বাস করতে চাইছিল যে রাধার বাপমারা কথাটা সত্য হোক। তাই সত্য হল এবং সে জানে না এখন কি হবে। তবে সে তার রক্তেই টের পাচ্ছিল যে রাধা যদি আজকে তাকে উসকাতে আসে, তাহলে একভাবে সে ফেরত যাবে না।

তারপর সে নির্দিষ্ট খুঁটোয় গাই বেঁধে সেই একই তেতুল গাছের তলায় বসেছিল। তারপর নিয়মমতো ষাঁড় এসেছিল গাই দেখতে। তারপর তার পায়ের উপর ঢিল পড়েছিল। তারপর সে ফিরে তাকিয়ে সেই একই ভঙ্গিমায় রাধাকে দেখেছিল অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে।

তখন সে খুব আশ্বস্ত হয়ে বুঝেছিল যে রাধা বাণ মেরেছে তাকেই। তখন সে উঠে রাধার গাছ পর্যন্ত যেতে রাধা সে গাছ ছেড়ে অধিকতর ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে যায় এবং জামির তাকে অনুসরণ ক'রে তার অপরিচিত এক অরণ্যে নিজেকে রাধার মুখোমুখি দেখে।

২৭

মালদা শহরের জৌলুশ বাড়ছিল দিনদিন। লোকও বাড়াছিল মেলা। বদিউল আরো অথর্ব হয়ে শেষমেশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পুরোপুরি বিছানা নিল। সালমা তাকে দেখতে আসত প্রায়ই, কিন্তু আগের মতো আর প্রতিদিনই আসতে পারত না। একে তার ব্যবসার সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃত হয়েছিল, তার উপর তার বয়সও হয়েছিল কম নয়।

পিছনে পড়ে থাকা মালদার চার ঘর বাজিকর নির্ঘাৎ শহুরে বদমাশ হয়ে উঠেছিল। অন্তত, সালমার এ রকমই ধারণা হয়। প্রথম প্রথম তারা আশা করত, সালমা তার ঐশ্বর্যের কিছু অংশ অন্তত তাদের জন্য ব্যয় করবে। কিন্তু সালমা তা করত না। তার যুক্তি ছিল পরিষ্কার। কি সম্পর্ক এদের সঙ্গে তার? কতকগুলো অকর্মণ্য চোর!

এই চার ঘর বাজিকর প্রথম প্রথম তার কাছে এসে অনুনয় বিনয় করত, পরে কৌশল পাল্টে দাবি করত। কিন্তু সম্পদবৃদ্ধি সালমাকে তার জীবনের এক পরমার্থ এনে দিয়েছে। সারা জীবনে সে বুঝতে পারে নি এ জীবনটা কেন। এখন এই সম্পদ-বৃদ্ধির ভিতরে নিজেকে নিরন্তর যুক্ত রেখে অস্তিত্বের একটা অর্থ খুঁজে পায় সে।

ফলে বিত্তবানদের নিয়ম অনুযায়ী সে পশ্চিমা দারোয়ান রাখে। তারা বাজিকর ও অন্যান্য সুযোগ-সন্ধানী ও কৃপাপ্রার্থীকে সামলায়।

শহরের আয়তন যত বাড়ে টাঙ্গাওয়ালা বাজিকর ও সমগোত্রীয় অন্যান্য শ্রমদায়ী মানুষের রোজগার তত বাড়ে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বাড়ে তার দ্বিগুণ হারে। কাজেই সাধারণ মানুষের জীবন আরো কষ্টকর হয়। বাজিকরেরা তাদের পুরনো অভ্যাস-গুলোকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝালিয়ে নেয়। কেউ ভানুহমতির ঝুলি বের করে, কেউ পশু চুরি ক'রে রাতের অন্ধকারে অন্যত্র চালান করে।

এইভাবে তুলতুলি লোপাট হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এটি বাজিকরদের কাজ। এর মধ্যে নিছক চুরি ছাড়া সালমাকে এক হাত নেওয়াও থাকে। পশু চুরিতে বাজিকরের কোনো বিবেকের বালাই থাকে না।

যে রাতে তুলতুলি চুরি হয় সে রাতেই বদিউল মারা যায়। তুলতুলির জিন মাহাত্ম্য তাতে আরো বাড়ে। সালমা বদিউলের মৃত্যুসংবাদ শুনে সে বাড়িতে গিয়ে তুলতুলির চুরি যাওয়ার খবরও শোনে। যদিও সে এখন শহরের সম্ভ্রান্তদের একজন, তবুও কিছু বিরূপ মন্তব্য তাকে হজম করতে হয়। কেননা, শহরে পশুচোর হিসাবে বাজিকর-দের তখন খ্যাতি বেশ ভালোই ছিল। তাছাড়া, এ বাড়িতে যে ব্যক্তি তাকে সম্মান দিত, তার মৃত্যুর পর সালমা দেখে সে কি পরিমাণ অবাঞ্ছিত এখানে। কেউ কি

একথা বলেছিল, 'জামাল, দেখিস ও বাউদিয়া মাগী যেন কাফেনের ঘরে না যাবার পারে!' একথা কি সালমা সত্যিই শুনেছিল? এ রকম কোনো রমণীকণ্ঠ?

এবং অবশ্যই সালমাকে সে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। সালমা জানলায় দাঁড়িয়ে বদিউলের শব দেখেছিল। যদিও তার ইচ্ছা ছিল, তবুও সে শবানুগমন করতে পারে-নি। সে প্রতি মুহূর্তে অপমানের আশংকা করছিল এবং প্রতিক্ষেত্রেই নিষেধাজ্ঞা অনুমান ও আশংকা করছিল। বদিউলের বাড়ি থেকে ফেরার পর সে যথার্থই বুঝতে পারে এ শহরে সে আদৌ সম্রান্ত নয়। সে নিতান্তই এক কুসীদজীবী, পশুপালিকা বৃদ্ধা। বদিউল জীবিত থাকাতে বহুকাল যা বুঝতে পারে নি এখন মুহূর্তে তা বোঝে। সে নিজেকে দেখে একেবারে একা।

সালমা গোপনে খবর নিয়ে জানতে পারে, চেতা নামে এক চতুর বাজিকর ডুলডুলিকে চুরি ক'রে একরাতে বিশ-পঁচিশ ক্রোশ রাস্তা ঘোড়া ছুটিয়ে ধলদিঘির মেলায় ঘোড়া বিক্রি ক'রে আবার তার পরদিনই ফিরে আসে। বদিউলের বাড়িতে তার অপমানের ক্রোধ গিয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত এই চার ঘর বাজিকরের উপর। কোতোয়ালিতে জামাল ঘোড়া চুরি বিষয়ে তার বাজিকরদেরই সন্দেহের কথা বলে-ছিল। তিন চারজন যুবক ও বৃদ্ধ বাজিকরকে এ ব্যাপারে যখন গ্রেপ্তার ক'রে এনে মারধর করা হয়, সে খবরে সালমা সুখী হয়।

তারপর যখন চার ঘর বাজিকরের রমণীরা একত্রে এসে তার কাছে টাকা চায়, সে ক্ষিপ্তের মতো বলে, কিসের টাকা?

— কোতোয়ালিতে দিতে হবে, মানুষগুলো বেবাক আটকে আছে।

— আমি দেবো কেন?

— তোমার টাকা আছে, তাই দেবে।

— আবদার! যা যা, যত সব চোরের দল!

— পীতেম বুড়া থাকলে এমন কথা বলত না।

— খবরদার! পীতেমের নাম করবি না। পীতেমের কথা তোরা শুনিস নি।

— তারাও তো সুখে নাই।

— নাই তো নাই, আমার কি? আমি কি বাজিকর? আমার সাথে কারো কোনো সম্পর্ক নাই।

অথচ এই সালমা বুক খুলে দিয়েছিল, বস্ত্র খুলে দিয়েছিল রাজমহলের কোতোয়ালিতে পীতেমকে বাঁচাবার জন্য। সে এমন কথা বলে।

কিন্তু তারাও বাজিকরের মেয়ে। বলে, জমিদারনি হবে ভেবেছিলে? টাকা আমাদের দেবে না, একদিন গলায় পা দিয়ে অন্য কেউ নিয়ে নেবে, সেদিন আটকাবে কে? মরলে পরে মুদ্দফরাসে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে, কারণ তোমার মরা হিন্দুতেও ছোঁবে না, মোছলমানেও ছোঁবে না। আর আমরা বাজিকরেরা? মাটি দেওয়া দূরে থাক, গোরে লাথি মারতেও আসব না।

সালমা দারোয়ান দিয়ে তাদের বের ক'রে দিয়েছিল। বদিউল মরে যাওয়ার পর চতুর্দিক থেকে নানাধরনের অস্থিরতা ও অশান্তি তাকে ঘিরে ধরছিল। সে তখন পীতেমের কথা ভাবছিল। নমনকুড়িতে চলে যাওয়ার কথাও দু-একবার ভেবেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হয় নি। আরাম ও সাবলীল জীবনে এখন দীর্ঘকাল ধরে অভ্যস্ত সালমা এই বয়সে আর কোনো ঝুঁকি নিতে পারে না। তারপর ভেবেছিল জামিরকে এখানে নিয়ে এসে রাখবে, কেননা পীতেম আসবে না সে ঠিকই জানত।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে জামিরকে নিয়ে এলে তার এই সঞ্চিত অর্থ ও এই বিশাল পশুশালা, এও তো জামিরকে দিয়ে যেতে হবে! কেন জামিরকে দেবে? জামির তার কে?

সালমা টের পায় না কি অস্থির বিকৃতি তাকে গ্রাস করেছে। এক এক সময় তার মনে হয়, সে বোধ হয় মরবে না। কেননা মরলে পরে তাব এতসব সম্পত্তির কি হবে? তার ধারণা হয়, মৃত্যুটা একমাত্র দরিদ্র বাজিকরদেরই নিয়তি, সে স্বতন্ত্র। যেসব প্রক্রিয়াতে এতকাল সে লুব্ধ মানুষের যৌবন ও আয়ুবৃদ্ধি কবত, এখন সেসব সে নিজের উপরই প্রয়োগ করে।

তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে পরতাপ এবং জামির তার কাছে আসে পীতেমের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। সব খবর শুনে সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য মানুষের মতো বসে থাকে অনেক সময়। তার চোখে আতংক, যা স্পষ্টতই পরতাপ ও জামিরের চোখে ধরা পড়ে। সে কাঁদে না, কিংবা চেঁচিয়ে শোকপ্রকাশ করে না। সে সামনের দিকে অনির্দিষ্টভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন অতিপ্রাকৃত সব দৃশ্য দেখে। তারপর বিড়বিড় করতে শুরু করে। এক সময় মূর্ছা যায়।

সালমার পরিচারিকার সঙ্গে জামির ও পরতাপ তাকে ধরাধরি ক'রে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেয়। বিছানায় শোয়াবার পর তার চোখ খোলে। তখন কড়িকাঠের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে।

পরতাপ ও জামির সে রাত অন্য বাজিকরদের সঙ্গে কাটায়। তাদের কাছে সালমার যাবতীয় বৃত্তান্ত তারা শোনে। তারা এই চার ঘর বাজিকরের ভয়ানক আক্রোশ টের পায়।

পরদিন তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সালমা এখনো বিছানা ছাড়ে নি। তৃতীয় দিনে বিদায় নেবার জন্য তারা আবার তার সঙ্গে দেখা করতে যায়।

সালমা তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করে। এই স্বাভাবিক ব্যবহারও জামির ও পরতাপের কাছে অদ্ভুত লাগে। ধনী গৃহস্থ যেমন চাষীমজুরের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখে, সালমার ব্যবহারেও তারা সেই জিনিসটি টের পায়। সালমা তাদের খেতে দেয় ও নিরাসক্তভাবে দলের অন্য লোকজনের খোঁজখবর নেয়। তারপর তারা যখন বিদায় চায়, সে শুধু 'আচ্ছা' বলে তাদের বিদায় করে।

আষাঢ় মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয়। শ্রাবণে ঘন বর্ষা নামে। সবাই আশংকা করতে থাকে এবার বড় বান হবে। কেননা খবর পাওয়া যাচ্ছিল গঙ্গা ইতিমধ্যেই ভরে গেছে। উত্তরে নাকি অনেক আগে থেকেই বর্ষা শুরু হয়েছে। মহানন্দা প্রবল বেগে জল এনে ঢালতে থাকে গঙ্গায়, ভীষণ স্রোত সে জলের। তারপর ধীরে ধীরে মহানন্দার জলের স্রোত মন্দীভূত হতে থাকে ও ক্রমশ উঁচু হয়, কেননা নিচের দিকে গঙ্গা আগেই ভরা ছিল। তখন সেই নদীর উপরে গেরুয়া রঙের ফেনা জমতে থাকে, ভেসে আসতে থাকে এবং শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে বিরামহীন বৃষ্টি শুরু হয়।

একটানা সাতদিন বৃষ্টি হবার পর মানুষ শহর ছেড়ে দূরে, নদী থেকে দূরে পালাবার আয়োজন করতে শুরু করল। কেননা তখন শহরের নিচু অংশগুলোতে বৃষ্টির জল ও মহানন্দার জল একসঙ্গে মিশেছে। নদীর জলের আর যেন কোনো গতি নেই। শুধু উঁচু হচ্ছে সেই জল, যেন সামনে কোনো বিশাল প্রাচীর তুলে নদীকে কেউ আটকে দিয়েছে। সামনে অবশ্যই প্রাচীর ছিল, সে প্রাচীরও জল দিয়ে তৈরি।

পনেরো দিন বৃষ্টি হবার পর শহরের উঁচু অংশগুলোতেও কোমর ডুবে গেল মানুষের। সালমা তার পনেরো হাত উঁচু কাঠের ঘরের মাচানের উপর আপৎকালীন ব্যবস্থা মজুত করল।

তারপর বৃষ্টি কিছুটা ধরে এলেও জল সমানে বাড়তে থাকল। সমস্ত শহরই প্রায় জলের তলায়। সালমার পশুশালার গরু মোষ সব মরতে শুরু করল। প্রথমে তারা মরল খাদ্যাভাবে এক এক ক'রে, বাকিরা একসঙ্গে জলে ডুবে। তার চৌহদ্দির মধ্যেই তারা ফুলে পচে ঢোল হয়ে ভাসতে থাকল। চতুর্দিকে কটু গন্ধ-পূর্ণ বিষাক্ত বাতাস।

সালমা এই নরকের মধ্যে সম্পূর্ণ একা বেঁচে রইল। তার পরিচারক, পরিচারিকা সময় থাকতেই পালিয়েছিল, কিন্তু সালমা কোথাও যাওয়ার কথা ভাবেই নি!

তারপর জল যখন নামতে শুরু করে তখন সালমা মই বেয়ে উপর থেকে নিচে নেমে আসে। কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে একাই সে একটার পর একটা মৃত প্রাণীর দেহ বাঁশ দিয়ে ঠেলে স্রোতের দিকে বের ক'রে দিতে থাকে।

জল একসময় সম্পূর্ণ নেমে যায়, বৃষ্টিও বন্ধ হয় পুরোপুরি। সমস্ত শহরে শুধু দীর্ঘকাল ধরে পড়ে থাকে মৃত মানুষ ও পশুর মৃতদেহ এবং পূতিগন্ধে ভারি বাতাস।

তখন এক রাতে চেতা সহ আরো তিন ঘরের তিনজন বাজিকর সালমার বাড়িতে প্রবেশ করে। মই বেয়ে মাচানের উপর উঠে তাকে নিয়ে আসে আলোর সামনে। তাদের চারজনের হাতে উদ্যত ছুরি। তারা সালমার সঞ্চিত মোহর, অলংকার ও টাকা চায়।

সালমা ভয় পায় না এবং স্থির প্রত্যয়ে বলে, কিচ্ছু পাবি না!

চেতা বলে, না পেলেও ক্ষতি নেই, তোমার কলজেটা উপড়ে নিয়ে যাব বরং।

সালমা বলে, তাই নিয়ে যা।

তাকে তখন ডাইনির মতো দেখাচ্ছিল, তাতে চেতা ছাড়া আর তিনজন ভয় পেয়েছিল।

চেতা তার ছুরি দিয়ে সালমার মুখে ও বাহুতে ক্ষত করেছিল, তা থেকে রক্তপাত হচ্ছিল।

সালমা সেই একই ভঙ্গিতে বলে, তাও পাবি না

চেতা তখন তার গলার উপর ছুরি চেপে ধরেছিল। বলেছিল, বল্ কোথায় আছে তোর দৌলত?

সালমা উন্মাদিনীর মতো বলেছিল, কেন, কলজে নিবি না?

আর তখনই চেতা তার ছুরি সালমার বুকে বসিয়েছিল গভীর ক'রে।

তারপর প্রায় সারারাত তারা সমস্ত বাড়ি ভেঙেচুরে তোলপাড় করেও কিছুই পায় নি। শুধু মাচানের উপরে তখনো এক কলসী খাবার জল ছিল আর কয়েক বস্তা চাল। ঘাতক বাজিকরেরা সেগুলো নিয়েই ফিরে গিয়েছিল।

নমনকুড়িতে ভালো ফসল হচ্ছে ক্রমাগত। সাঁওতাল ও ওরাওঁদের ঘরে ঘরে সারা বছরের খাবার থাকে। উদ্যমী লোকেরা নতুন নতুন জমি হাসিল করে। কিন্তু এ সবের মূলে যে কারণটি, তা কেউ বোঝে না। সেই যে বাজিকরেরা এল আর বানবন্যা বন্ধ হল। নমনকুড়ি, জামিলাবাদ আর হিঙ্গলের যাবতীয় ডুবো জমি সব সোনা ফলাতে লাগল। প্রথম বছর পাঁচেক বর্ষার পরে জল দাঁড়াত জমিতে, কিন্তু সেও ক্রমশ কমের দিকে। তারপর থেকে আর কখনো বানভাসি হয় নি নমনকুড়ি।

এর মধ্যে কোনো যাদু আছে নাকি? বাজিকর পীতেম বুড়োর যাদু? কে বা জানে, অচিন দেশের মানুষ সব, জানে বা কোন গুপ্তবিদ্যা, তা দিয়ে বশ করে নদী, বান, বৃষ্টি।

এসব কথা ভাবত সাঁওতাল, ওরাওঁরা আর গোয়ালা, সদগোপ, মুসলমান চাষীরা। বর্ষার সময় নদী ভরে উঠত ঠিকই, কিন্তু সে আর উপচে পড়ত না। আবার আশপাশের জলও যখন নেমে আসত, নদী সে জলও নিয়মমতো পৌঁছে দিয়ে আসত মহানন্দায়, কোনো অঘটন ঘটাত না।

নতুন জমিদার বদিউলের ছেলে জামাল অনেক আগে থেকেই বাজিকরদের উপর খাজনা বসিয়েছে। খাজনা দিতেও হচ্ছে বাজিকরদের, কিন্তু মুশকিল হল যে আশায় পীতেম নমনকুড়িতে বসতি করল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। বাজিকরেরা গৃহস্থ হতে পারছে না সবাই। পরতাপ ও জামির অবশ্যই ব্যতিক্রম। তাদের দেখাদেখি অন্য পাঁচ-দশজনও জমিতে মেহনৎ দিতে শুরু করে। কিন্তু যেই কোনো বাধা আসে, আসে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যার হাত থেকে চাষীর নিস্তার নেই এবং যা হামেশাই হতে পারে, হতাশ হয়ে বসে পড়ে তারা। পরতাপ তার অর্জিত অভিজ্ঞতায় বোঝায়, আরে বাপু, ধরে নেও না কেন যে তিনটা চাষের একটা মার যাবে। তাহলেও আর দুটো থাকে। আর সে দুটোয় তোমায় ভরে দেবে। চাষের তো এই নিয়ম।

কিন্তু এসব কথা জাত যাযাবরকে বোঝানো কঠিন। তারপর ফসলের জন্য অপেক্ষা তার কাছে আরো অশান্তির মনে হয়। কাজেই পরতাপ, জামির সহ কয়েক ঘর মাত্র পুরোপুরি চাষের কাজে আত্মনিয়োগ করে, অন্যেরা যে যার মতো পুরনো কায়দায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

নমনকুড়ির জীবন বয়ে চলে পুনর্ভবার স্তিমিত স্রোতের মতো, তাতে আর ঢল নামে না, বান ডাকে না।

কিন্তু প্রকৃতির এই স্বাভাবিকতায় জামিলাবাদ এবং হিঙ্গল বড় অশান্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতি গত কয়েক বছর ধরে দিচ্ছে এমন অকৃপণ হাতে যে কর্মী মানুষ পরিশ্রমী

মানুষ তা থেকে একটু চেষ্টাতেই ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হয়ে যায়। পাঁচ বছর আগে যাদের ছিল এক হালের জমি, এমন অনেকেই এখন তিন হাল চার হাল ক'রে নিয়েছে। মাঠে কাজ করার লোকের অভাব নেই। আদিবাসীরা আসছে দলে দলে, নমনকুড়ির বহর আরো বড হচ্ছে। এমনকি গৃহস্থরা নিজেদের সুবিধার জন্য জামিলাবাদ ও হিঙ্গলেও বেশ কিছু আদিবাসী পরিবারের বসতি করিয়েছে। না হলে, চাকরপাটের অভাব গুরুতর আকাব ধারণ করেছিল। কাজেই জামিলাবাদ ও হিঙ্গলের জীবনে এখন প্রচুব সময়, ভোগেব জন্য উদ্বৃত্ত আয়।

এই তো সময়, যখন গোয়ালাদের সঙ্গে সদগোপদের পুরনো শরিকি ও মর্যাদার লডাইগুলোর নিষ্পত্তি ক'রে নেওয়া যায়। এবং এইতো সময়, যখন জামিলাবাদের আগন্তুক দিয়াডা মুসলমানদের দাপট দেখিয়ে কিছুটা খর্বাকৃতি ক'রে দেওয়া যায়।

কাজেই প্রচুব বিক্ষিপ্ত ও সংগঠিত ঝামেলা হয – যেমন হয়েছিল কয়েক বছব আগে জামির-রাধার সম্পর্ককে কেন্দ্র ক'বে।

রাধা সেই যে জামিরকে ঝোপঝাডেব অন্ধকাবে আকর্ষণ ক'বে নিয়ে গিয়েছিল তার সে আকর্ষণ থেকে জামির সহজে নিস্কৃতি পায় নি। তাদের এই প্রেম ও, অভিসার চলেছিল বছর দুয়েক। চতুর রাধা জামির ও তার সামাজিক দূরত্বটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারত। কাজেই অন্তত বছব খানেক সে ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে পেরেছিল। কিন্তু তাব পরে সে ধরা পডে যায়।

আর ধরা পডে দুর্দান্ত দেদোন ঘোষেব হাতে। অবশ্য দেদোনের হাতে ধরা পডাই স্বাভাবিক, কেননা, দেদোন দীর্ঘকাল ধবে রাধাকে আকাঙ্ক্ষা ক'রে আসছে এবং অসংখ্যবার তাকে প্রেম নিবেদনও করেছে। কিন্তু তার ভীষণ কুৎসিত মুখাকৃতি রাধাকে চিরকাল প্রতিহত করেছে। কাউকে দেহদানের ব্যাপারে রাধার একটিমাত্রই বিলাসিতা ছিল, তা হল, পুরুষটিকে মোটামুটি সুপুরুষ হতে হবে। সম্ভবত, এই কারণেই সে স্বামীর ঘর করতে পারে নি।

দেদোন সময় পেলেই রাধার গতিবিধি অনুসরণ করত। অনেকদিন ধরেই তার সন্দেহ হচ্ছিল। সন্দেহের প্রধান কারণ, রাধা পুরুষ মানুষ ছাড়া থাকতে পারে না। এতকাল সে যে ক'জন পুরুষকে সঙ্গ দিয়েছে তারা হয় জামিলাবাদ, না হয় হিঙ্গলের মানুষ। সুতরাং কারো কাছেই এসব ব্যাপার গোপন থাকত না।

এখন বেশ কিছুদিন যাবৎ রাধার চালচলনের কোনো সঠিক হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। তাতেই দেদোনের সন্দেহ হয় যে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো বাইরের লোক আছে। সন্দেহ তার দৃঢ় হয় যখন একদিন সে জামিরকে অন্ধকারের মধ্যে দূরের থেকে দেখে। কিন্তু সে নিঃসংশয় হতে পারে নি। অন্ধকার ছিল বলে সে জামিরের মুখ ভালো ক'রে দেখতে পায় নি, কিন্তু তার সন্দেহ হয়েছিল যে, যে-মানুষটা এইমাত্র মাঠে নেমে গেল সে জামিরই।

জামির ও রাধার অভিসার কুঞ্জ ছিল জামিলাবাদের একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দির। জায়গাটা জঙ্গল এবং কাঁটাঝোপে এমন সুরক্ষিত ছিল যে মানুষের সেদিকে কোনো প্রয়োজন ছিল না। জামির নিয়মিত সেখানে রাধার সঙ্গে মিলিত হতো।

সেই গোপন স্থানে একদিন দুপুরের দিকে দেদোন ধরে ফেলে তাদের দু'জনকে। প্রথমে সে নিজেকে লুকিয়ে রেখে রাধা ও জামিরের ক্রিয়াকলাপ দেখে এবং তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে জামিরের উপর।

দেদোনের খ্যাতি এ অঞ্চলে ধর্ষক হিসাবে। প্রত্যেক সমাজেই কিছু মানুষ থাকে যাদের বাদ দিয়ে সমাজটা চলতেই পারে না, অথচ এরা উচ্চতর সমাজের বিচারে পরগাছার মতো। এই ঘোষ ও মুসলমান বসতির আশপাশেও এরকম কিছু দরিদ্র মানুষ ছিল যারা সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকত। এদের পুরুষেরা অবস্থাপন্নদের বাড়িতে চাকরের কাজ করত। মেয়েরা করত খলালি কিম্বা ধান কোটা ভানা, চিড়া মুড়ি ভাজা, ইত্যাদি কাজ। জামিলাবাদ হিঙ্গলের উভয় গোষ্ঠীর গোপেদের মধ্যে দেদোনের মতো কিছু মানুষ এই শ্রেণীর রমণীদের উপর যথেচ্ছাচার করত এবং এমন ত্রাসে রাখত যে বাপের সামনে মেয়েকে কিংবা স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করলেও কেউ কোনো কালে প্রতিবাদ করতে সাহস করত না। পরবর্তীকালে দিয়াড়া অঞ্চলের মুসলমানরা এখানে উঠে আসার পর তাদের মধ্য থেকেও এ ধরনের কিছু নিপীড়কের উৎপত্তি হয়েছিল। হয়ত জামিলাবাদ ও হিঙ্গল কোনো ব্যতিক্রম নয়। তবে দেদোন নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম, কেননা, তার খ্যাতি ছিল এমন যে, সে নাকি চালা ফুটো ক'রে ঘরে ঢুকেও মেয়ে তুলে আনতে পারে। একমাত্র রাধার উপরে এ ধরনের কোনো আক্রমণ সে করতে সাহস করে নি, তার কারণ রাধা পতাকির বোন এবং স্বশ্রেণীর মধ্যে এধরনের ঘটনার সৃষ্টি করলে একেবারে অক্ষত পার পাওয়া যায় না।

সেই দেদোন এখন আচমকা জামিরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাধা তাকে আগেই দেখেছিল। সে আর্তনাদ ক'রে সরে যেতে সময় পায়, কিন্তু জামির সে সুযোগ পায় না। সে ওঠারই সময় পায় না, তার আগেই দেদোন তার উপরে চেপে বসে।

—ঘোষের মেয়ের সঙ্গে পিরিত আজ তোর শেষ। হারামজাদা—

দেদোন গর্জন করে, কিন্তু বেশি বাগাড়ম্বর করে না। সে শক্তিশালী মানুষ, নিজের উপর আস্থাও তার খুব।

রাধা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে দেদোনের এই উন্মত্ততা দেখে। চিৎকার করতে কিংবা পালিয়ে যেতেও সাহস করে না সে, শুধু মাঝে মাঝে ভয়ার্ত হিক্কা তোলে।

জামির দেদোনের আক্রমণ ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না। দেদোন তার উপরে চেপে বসা, চুলের মুঠি ধরে দেদোন তার মাথা মন্দিরের চাতালে ছেঁচবার চেষ্টা করে। জামির দু'হাত দিয়ে তাকে আটকাবার প্রয়াস পায় শুধু।

দেদোন পূর্ণবয়স্ক যুবক এবং সম্ভবত জামিরের থেকে অনেক শক্তিশালী। তার দেহ সুগঠিত। কিন্তু জামির দীর্ঘকায় এবং অল্প বয়সের জন্য অনেক বেশি ক্ষিপ্র।

ফলে দেদোন তার বুকের উপর চেপে বসলেও কোমরের উপরে সে ভর রাখতে পারে, আর কোমরের উপরে কোনো চাপ না থাকায় দুই পা বাঁকিয়ে জামির দেদোনকে কায়দা ক'রে ফেলে ও নিজেকে মুক্ত করে। তারপর দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

রাধা জানে দেদোন যদি এ লড়াইতে জেতে তার প্রেমাস্পদ অবশ্যই খুন হবে এবং সেও অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে বাড়ি ফিরতে পারবে না। কেননা তখন দেদোন তাকে স্বাভাবিক কামুকতায় গ্রহণ করবে না, গ্রহণ করবে অস্বাভাবিক পাশবিকতায়। এটাই নিয়ম। এজন্য সে সমাজে নিন্দিতও হবে না। কেননা গ্রাহ্য বীরত্বও এটাই। তাই গলায় আঘাত খেয়ে জামিরকে ভারসাম্য হারাতে দেখে সে আতংকে আরেকবার ককিয়ে ওঠে।

জামির হ্যাঁচকা টানে হঠাৎ প্রতিপক্ষকে ইটের চাতালে প্রথমে আছড়ে ফেলে, তারপর যাযাবরী ক্ষিপ্রতায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে হাঁটু ভেঙে শেসে আসে দেদোনের বুকের উপর। দেদোন আর্তনাদ ক'রে উঠলেও মুহূর্তে জামিরকে ধরে ফেলে সাপটে, যে ব্যাপারটা এ লড়াইয়ের প্রথম থেকেই সে করতে চেষ্টা করছে।

বেশ কয়েকবার ওলটপালট চলে। দু'জনের মুখই রক্তাক্ত। কান এবং মুখেব কশ বেয়ে রক্ত ঝরচে জামিরের। এখন তার চেহারায় খুনির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে সামান্য দূরত্বে আক্রমণের সুযোগে ঘুরছে চোখে চোখ রেখে। দু'জনেই সতর্ক কেননা দু'জনেই আহত এবং ক্লান্ত। দু'জনেই জানে মারাত্মক আঘাতের সময় এটাই।

হঠাৎ রাধার খেয়াল হয় সে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? সে তো পালাতে পারত এতক্ষণে, তবে? জামির, অথবা ভয়? সে আস্তে আস্তে পিছনে সরতে শুরু করে।

দৃশ্যটা প্রথমে চোখে পড়ে দেদোনের। সে জামিরকে ছেড়ে রাধার দিকে ঝাঁপ দেয়। জামির এ সুযোগ ছাড়ে না। সে একটা চিতাবাঘের মতো দেদোনের পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গর্দানের উপরে একটা প্রবল আঘাতে দেদোনের কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়। মাথার ভেতরে একটা ভোঁতা শূন্যতা বোধ, কুয়াশার মতো ঝাপসা অনুভূত সামান্য সময়, তারপর সে ঝড়ে ভাঙা গাছের মতো আছড়ে পড়ে মাটিতে। জামির তার উপরে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে হাঁফায়। তারপর বোঝে দেদোন আর সহজে উঠবে না। তখন সে পা দিয়ে লাথি মারে একটা, মুখ থেকে একদলা রক্ত মাখা থুথু ফেলে দেদোনের গায়ে, তারপর রাধার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা ক'রে টলতে টলতে জঙ্গলের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দেদোন জিতলে শুধু থুথু ফেলে চলে যেত না, দেদোন জিতলে জামির খুন হতো। কিন্তু একথা জামির বুঝেও দেদোনের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা

করে নি। কেননা সে শুধু আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিল। সে অবশ্যই ভুল করেছিল।

দেদোন কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে। তারপর গোপনে পরিকল্পনা চলে কয়েক দিন। তারপর একদিন মাঝরাত্রে নমনকুড়ির আকাশ লাল হয়ে উঠেছিল আগুনে।

দেদোন দলবল সংগঠিত ক'রে আক্রমণ করেছিল বাজিকর বসতি। সব ক'টি ঘরে আগুন লাগিয়েছিল, ধর্ষণ করেছিল রমণীদের, বিশেষ ক'রে লুবিনিকে, তার তখন চোদ্দ বছর বয়েস। দেদোন আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল পরতাপের দু'টি সন্তানকে, দাঙ্গাবাজদের ভীষর্ণ আক্রুতির হাঁসুয়ায় খুন হয়েছিল আরো দু'জন মানুষ।

এই ঘটনার পর দেদোনের বীরখ্যাতি আরো ছড়ায়, তার পাশবিকতা ও যথেচ্ছাচার আরো বাড়ে। এতে মজাও পায় সে। নিজেকে একদল শেয়ালের মধ্যে সিংহের মতো মনে হয় তার।

তারপর সে নমনকুড়ির সাঁওতাল পাড়ায় নজর দেয়। সাঁওতাল মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম আছে, একথা দেদোনরা জেনেছিল। এতে যে দেদোনদের দম্ভে লাগে, একথা সাঁওতালরা জানত না।

কাজেই আচমকা রাতের অন্ধকারে কিংবা হাট ফেরতা দলছুট কোনো সাঁওতাল রমণী হিঙ্গলে ও জামিলাবাদে ধর্ষিত হতে থাকে। সাঁওতালরা সর্তক হয়। এখনো এই দেশ তাদের কাছে বিদেশ, তাছাড়া এখানে দেদোনরাই দলে ভারি। কাজেই তারা নিজেরা সতর্ক হয় ও মেয়েদের শাসন করে।

তারপর একদিন হাড়মার নতুন বউ দুর্গি জামিলাবাদের আমবাগানে হারানো গরু খুঁজতে যায়। নিরালা নির্জন আমবাগানে যে দেদোন তাড়ির আসর বসিয়েছে, একথা সে জানবে কি ক'রে? দুর্গি দেদোনকে বাপ ডেকেও পার পায় না। আঁচল মুখে কামড়ে ধরে সে বাড়ি ফিরে আসে এবং 'কি হয়েছে' জিজ্ঞেস করতে হাড়মার গায়ের উপর আছড়ে পড়ে উন্মাদের মতো মারতে থাকে তাকে। তারপর সে চেঁচিয়ে কাঁদে ও পাড়ার সকলই জানতে পারে সবই।

হাড়মা কদিন গুম হয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকে। কোনো কাজ করে না। কোনো কাজে উৎসাহও বোধ করে না।

কিন্তু এভাবে তো মানুষের চলে না। তাই দুর্গিকেও ঘরসংসার করতে হয়, হাড়মাকেও মাঠে যেতে হয়। দু'জনেই একটু স্বাভাবিক হতে হাড়মা বলে, এবার একদিন আমবাগানে ডাক দেদোনকে।

দুর্গি শংকিত হয়ে বলে, কেমন?

হাড়মা বলে, ছেনালি ক'রে ডাকবি।

—এসব কাজ জানি নাকি?

—দরকারে সব জানতে হয়।

— যা হবার তা তো হয়ে গেছে, আর এসব ঝামেলায় গিয়ে লাভ কি ?

— হয়ে গেছে কে বলল ? হচ্ছে তো প্রায়ই। আর হয়েই যদি গিয়ে থাকে তাহলে মারলি কেন আমায় ?

হাড়মা চালায় বাঁশে গোঁজা তিনেসরি হেঁসোখানা নামায়। হেঁসোর মাথা একমুঠো-হাত লম্বা, পাশে আট আঙুল প্রমাণ। মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এমন হাতলে সরু বাঁকানো বেশ খানিকটা লম্বা লোহার দণ্ড ঢোকানো। সেই লোহার মাথায় হঠাৎ চওড়া হওয়া মারাত্মক হেঁসোর ফলা। বুনো জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে এমন অস্ত্র লাগে। হাড়মা শান্তভাবে একখানা কাঠের পালিশ করা টুকরো বের ক'রে তার উপরে পুনর্ভবার বালি ছড়িয়ে সেই হেঁসোয় ধার দিতে বসে।

তুর্গি বলে, তারপর ?

— তার পরের কথা তারপরে ভাবব। এখনকার কথা আগে ভাব। এখন যদি পাগল হয়ে যাই তাহলে 'তারপর' দিয়ে তোর কি হবে ?

তুর্গি আর কথা বলে না। হাড়মার ভাবভঙ্গি দেখে সে বোঝে এ কাজ তাকে করতে হবে। সে করেও।

দেদোন টোপ খায়, কেন না টোপ খাওয়ার মতো চেহারা তুর্গির ছিল। সন্ধ্যাবেলা নির্দিষ্ট গাছের নিচে তুর্গি দাঁড়িয়ে থাকে, দেদোন আসে। দেদোন কাছে আসলে হঠাৎ সেই গাছের হাত-পা গজায় এবং দেদোনের মুণ্ড ও ধর আলাদা হয়ে সেখানে পড়ে থাকে।

আর তখন জামিলাবাদের ঘোষ পাড়ায় হরিনাম সংকীর্তনের আসরে তুমুল খোলকর্তাল বাজনা চলে। আজ এর বাড়ি তো কাল ওর বাড়িতে আসর বসে। মানুষ উদ্দাম হয়ে নাচে, গান গায়।

সাঁওতাল এবং ওবাওরা খড় ধার দিয়েছিল, জঙ্গলে বিন্না ও শন ছিল। কাজেই বাজিকরদের ঘরগুলো আবার নতুন ক'রে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। প্রতি বাড়িতেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মতো বরগায় কি আড়ায় দু-একখানা অঙ্গারের রঙ ধরা কাঠ কিন্তু রয়ে গেল। সেগুলোয় আগুন ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু নতুন ক'রে বাড়ি বানাবার সময় দেখা গেল একেবারে পরিত্যাগ করার মতো হয় নি।

পুলিশ কোতোয়ালি ছিল হাবিবপুরে, এখান থেকে অনেকটা দূর। বাজিকরদের কেউ পরামর্শ দেয় নি কোতোয়ালিতে খবর দিতে, আর বাজিকর অতীতে কখনো স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে যায় নি, এখনো যায় না। জামিলবাদে একজন চৌকিদার আছে, সরকারি নিয়মে তারই অবশ্য খবর দেওয়ার কথা। কিন্তু সে স্থানীয়দের উপেক্ষা করতে সাহস পায় না। কাজেই এই খুন, ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ স্বাভাবিক ঘটনার মতোই গৃহীত হয়। কেউ এ নিয়ে নতুন ক'রে আলোড়ন সৃষ্টি করে না।

শুধু বালি দলের নেতা হিসাবে জামিরকে গালাগালি করে তার অপরিণামদর্শিতার জন্য। কিন্তু জরিমানাও হয় তার। অর্থাৎ নতুন ঘর তোলার জন্য জমিলব্ধ যাবতীয় খড় ও তার যাবতীয় গবাদি পশু বিক্রি ক'রে তার সম্পূর্ণটাই তুলে দিতে হয় বালির হাতে। খড় অবশ্য অঙ্গীকারের মধ্যে থাকে, কেননা আগুন একপণ খড়কেও রেহাই দেয় নি।

সময় যেহেতু কারো অপেক্ষায় থাকে না, বছর ঘুরে যায় একের পর এক। তারপরে জামালের জমিদারির এই অংশ বিহার থেকে আগত ভূঁইঞা পদবীধারী কয়েকজন ব্রাহ্মণ কিনে নেয় এবং জামিলাবাদে নতুন বাড়িঘরের পত্তনি করে। এরা সব অবস্থাপন্ন মানুষ। প্রথমেই তারা নানাধরনের শিক্ষিত মিস্ত্রি মজুর নিয়ে এসে ইট পুড়িয়ে পাকা বাড়ি তৈরি করে। বেশ কয়েকখানা পাকা বাড়ি তৈরি হয় ও পাকাপাকি হয়ে বসতে তাদের প্রায় একবছর লাগে।

এইসব ভূঁইঞারা যে কোন ছুতোনাতায় পুরানো পত্তনি উচ্ছেদ ক'রে জামিলাবাদ ও হিঙ্গল সংলগ্ন অনেক জমি খাসে আনতে শুরু করল। এরা কেউই সাবেকি জমিদার নয়, শুধুমাত্র বড়সড় জোতদার। কাজেই জমি থেকে নিজেরাই মুনাফা তুলবার সব রকম কায়দা এদের জানা। এ ছাড়া প্রত্যেক ঘরই মহাজনী কারবারের বিরাট জাল পেতে বসল। এরা থানা-পুলিশ আইনকানুন ভাল বুঝত এবং এসবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখত। ফলে সদগোপ, ঘোষ ও মুসলমানেরা এদের সমীহ ক'রে চলতে শুরু করল।

নমনকুড়ির মাঠে ইদানিং সবচেয়ে ভাল ফসল হচ্ছিল। এইসব জমি আদিবাসী ও বাজিকরেরা নামমাত্র খাজনায় এতকাল ভোগদখল ক'রে আসছিল। পুরনো বছরের খাজনা বাকির অজুহাতে বেশ কয়েকঘর মানুষের জমি হাতছাড়া হয়ে গেল। এর মধ্যে অবশ্যই বেশির ভাগ মানুষ বাজিকর। এইসব বাজকরেরা এতদিনেও জমির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি, কিংবা জমিজমা সংক্রান্ত আইনকানুনও বুঝতে শেখে নি।

যেসব বাজিকরের জমি চলে গেল, তাদের অধিকাংশেরই এজন্য কেনো বিকার দেখা গেল না। কেননা জমি তারা ঠিকমতো ব্যবহার করে নি। ও ব্যবহার করার গরজও বোধ করে নি। তাদের যেভাবে দিন চলছিল, সেভাবেই চলতে লাগল।

কিন্তু পরের পৌষে, মাঘে কৃষিকর্মরহিত বাজিকরেরা পরতাপ, জামির ইত্যাদি ঘরের সামনে এসে রুদ্ধবাক্ ইর্ষা প্রকাশ করে তাদের চাহনিতে। এত অজস্র শস্য এবার ফলেছে যে যে-ব্যক্তি সামান্য জমি মাত্র চাষ করেছে, তারও সারাবছরের খোরাকির জন্য ভাবতে হবে না।

সেই মাঘে লুবিনির ছেলে হল। অসামান্য রূপবান শিশু। পরতাপ তার নাম রাখল রূপা। লুবিনি ছেলে পেয়ে তার ক্ষোভ ভুলে গেল। জামির ও রাধার বৃত্তান্ত তার অজানা ছিল না। বিষয়টা যখন প্রচার হয়, লুবিনির তখন বোঝার বয়স হয়েছে। কাজেই ইর্ষা তাকে কিছুদিন বিপর্যস্ত রেখেছিল। সে মনে মনে রাধাকে উলঙ্গ ক'রে তার সর্বাঙ্গে আলকুশি ছড়াতে চেয়েছিল।

লুবিনির এইসব ভাবান্তর জামির লক্ষ করে নি। কারণ জামিরের সঙ্গে লুবিনির কোনো সম্পর্ক হয় নি। তাছাড়া, সে রাধাকে নিয়ে এত বিভোর ছিল যে লুবিনির শারীরিক মানসিক কোনো পরিবর্তনই তার চোখে পড়ে নি। রাধাপর্ব চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর জামির কিছুদিন আনমনা থাকে। তখন লুবিনি তাকে আড়াল থেকে নজর রাখত। জামির মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে যেতে লুবিনি তাকে উপেক্ষা দেখাতে শুরু করে। প্রথম প্রথম জামির এসব খেয়াল করত না। যেমন, এতকাল তার নির্দেশমতো লুবিনি হাতে হাতে যেসব সহায়তার কাজ করত, ইদানিং সেসব কাজে অবহেলা দেখাতে শুরু করল। ব্যাপারটা এমন নয় যে লুবিনি সংসারের কোনো কাজ করত না, বরং উল্টো। এখন সে আরো বেশি বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজকর্ম দেখাশুনা করছিল। কেননা ফসল যেহেতু বেশি আসছিল, চাষী গৃহস্থের কাজের পরিধিও বাড়ছিল। লুবিনি জামিরকে উপেক্ষা করত অন্যভাবে। জামির যখন বলে, গাইটাকে এবার ছেড়ে দে, চরে আসুক। লুবিনি তখন তার দিকে একবার তাকিয়ে গোয়ালঘরের উল্টোদিকে হাঁটা দিত। আবার পরিশ্রান্ত হয়ে জামির যখন দাওয়ায় এসে বসে বলত, জল দে, লুবিনি তখন এক ঘটি জল জামিরের থেকে হাত তিনেক তফাতে ঠক্ ক'রে নামিয়ে রেখে চলে যেত।

এ ধরনের মৃদু প্রতিবাদ বেশ কিছুদিন জামিরের চোখে পড়ে নি। তাতে লুবিনি আরো ক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তারপর জামির যখন নতুন ক'রে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন অনুভব করতে শুরু করে, তখন সকৌতুকে লুবিনির এসব ভাব সে লক্ষ করত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হায়া ঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলতে গিয়ে গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে জামিরকে সন্তর্পণে মাঠে নেমে যেতে দেখল। জামিরেব পাঁজা কোলে লুবিনিকে সে দেখেছে ঠিকই, নাহলে, অতবড পুরুষটার বুকের উপর দুমদাম কিল মারছিল কে? জামির চাপা হাসি হাসছিল।

দেখে হায়ার প্রবল আতঙ্ক হয়। ভয় সে চেপে রাখতে পারে না, ঘরে এসে পরতাপকে বলে।

পরতাপ প্রথমে কিছু বোঝে না। বলে, হ্যাঁ, তো কি হল?

এ কথাব সঠিক উত্তর হায়াও দিতে পাবে না। সে শুধু বলে, না আমার বড ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

—জামিরের যা সা-যোয়ান চেহারা—

পবতাপ তাকে ধমক দিয়ে বলে, যা যা নিজেব কাজে যা, যাদের কাজ তাদের বুঝতে দে। পাগল—

কিন্তু হায়াব আতংক কাটে না। সে লুবিনির ফেরাব অপেক্ষায় থাকে। বেশ কিছু সময় পরে লুবিনি ফিরে এলে হায়া সতর্কভাবে তাব চোখমুখ নজব ক'রে দেখে। না, একটা সলজ্জ উত্তেজনা ছাড়া সে আর কিছু আবিষ্কার করতে পারে না।

এর দিনদুয়েক বাদে হায়া লুবিনিকে জামিরের ঘরে শুতে পাঠাতে শুরু করে এবং এর পবে সারাজীবনে জামিব আর কখনো অবিশ্বস্ততার কাজ করে নি।

জামিলাবাদ, হিঙ্গল, নমনকুড়ি ইত্যাদি গ্রামের মানুষ জানত না কি ক'রে এখানকার জমি এত ফলপ্রসূ হল। গত পনেরো বছর ধরে টাঙ্গান দিয়ে জল আসা ক্রমাগত কমছে। এতকালের ডুবো জমি এখন চমৎকার আবাদী জমি হয়েছে। প্রতি মরশুমে ফসলে মাঠ হেসে উঠছে। মানুষ দেবতার আশীর্বাদ হিসাবে দেবতার নামে জয়ধ্বনি করছে। কিন্তু কেউ জানত না কি ক'রে এমন হল।

আবার সন্তোষ দেবীকোট, কান্তনগর, সুলতানপুর, জাহাঙ্গীরপুর ও বিজয় নগর পরগনার অসংখ্য গ্রামের মানুষ এই একই ঘটনাকে দেবতার অভিশাপ বলে ধরে নিয়েছে। সেসব গ্রামে কয়েক বছর ধরে কীর্তন, নামাজ, পূজাপার্বণ ও মানত চলছে দেবতার রোষ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। কারণ আত্রাই আর পুনর্ভবায় জল নেই। বর্ষার কয়েকমাস সামান্য জল থাকে, তাছাড়া বছরের অন্যসময় নদীগর্ভ ধুধু বালিয়াড়ি। ব্যবসা-বাণিজ্য যাতায়াতের জন্য এইসব পরগনার বিস্তৃত অঞ্চলে এই নদী দু'টিই ভরসা। কোনো অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ নদী দু'টিই শুকিয়ে গেল।

বৃদ্ধরা বলে, হ্যাঁ বাপু, এমন আরো একবার হয়েছিল বটে, বাপ-দাদাদের কাছে শুনেছি, সে এখন থেকে একশো সওয়াশো বছর আগে।

আগে যা ঘটেছিল এইবারেও তাই ঘটেছে। তিস্তা আর আত্রাইএর সংযোগে হিমালয় থেকে নেমে আসা বড় বড় পাথরের চাঁই, গাছের গুঁড়ি জমে জল যাতায়াতের রাস্তা ক্রমশ বন্ধ করেছে। সেই বাধার উপর পলি ও বালি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে আত্রাইএর মুখকে পুরো বন্ধ ক'রে দিয়েছে। এদিকে তিস্তার প্রবল জলধারা নতুন পথ ক'রে নিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদ। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রঙপুর জেলা। একদিকে জলের জন্য হাহাকার, অন্যদিকে বন্যা প্রতিবছরই।

আগের বারে জেলা কালেকটররা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে কলকাতার রেভিনিউ বোর্ডকে রাজি করিয়ে টাকার ব্যবস্থা করেছিল এই বাধা দূর করার জন্য। প্রতিদিন দশহাজার কুলি কাজ করত। কিন্তু সেসব ব্যবস্থা বড় সহজে হয় নি। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, ও পাহাড়ী জায়গা ছিল মানুষের বসবাসের অযোগ্য। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মরছিল জ্বর ও পেটের রোগে। ফলে কুলিরা পালাতে থাকে। তখন আবার কুলিদের আটকাবার জন্য দারোগা, পাহারাদার, দফাদার, ইত্যাদি নিয়োগ করতে হয়।

সে সময় সাহেবদের এসব আয়োজনের প্রয়োজন ছিল। লবণ, রেশম, তাঁত, চাল ইত্যাদি মালচলের জন্য তখন একমাত্র পথ ছিল নদী। কাজেই সাহেবদের ব্যবসা মার খাচ্ছিল। তার উপরে কলকাতায় তখন ঘনঘন চাল পাঠাবার দরকার হতো।

নদীতে জল না থাকলে কিভাবে চাল পাঠানো যাবে ? কাজেই সরকারী ব্যবস্থায় দ্রুততা ছিল।

কিন্তু এবারে ব্যবস্থা অত তাড়াতাড়ি হয় না। যাতায়াতের জন্য স্থানে স্থানে রেল-ব্যবস্থা হয়েছে। রাস্তাঘাটও তখনকার দিনের থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ হয়েছে। কাজেই কালেকটরদের ব্যবস্থা নিতে বেশ সময় পার হয়ে যায়। অবশ্য আত্রাই-এর মুখ পুরোপুরি বন্ধ একদিনে হয় নি। বছরের পর বছর ধরে আত্রাই-এর মুখ আটকেছে, আর সেকারণে জল কমেছে দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। জল কমেছে আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গান ও এদের অসংখ্য খাঁড়িগুলোতে। আর এই জল কমাতে লাভবান একমাত্র নমনকুরি, হিঙ্গল, জামিলাবাদের মানুষ। তাই তারা খোঁজও নেয় নি কিসে জল কমল !

তবুও সরকারকে একসময় ব্যবস্থা নিতে হয়। কেননা আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গান শুকোলে রেলপথের খুব একটা অসুবিধা না হলেও তিস্তা জলপাইগুড়ি ও রঙপুর ভাসাচ্ছে। তাতে ক্ষতি হচ্ছে বিরাট। কাজেই সরকারকে নজর দিতে হয়। আবার হাজার হাজার কুলি সংগ্রহ করতে হয়। তবে এবার আর খুব একটা অসুবিধা হয় না। আদিবাসীদের আগমন অব্যাহত ছিল। কুলি হতে তারা কখনোই অরাজি নয়। সুতরাং আত্রাইএর মুখের বাধা সরতে থাকে।

ফলে পরের বছর বর্ষার সময় নমনকুরির নিচু জায়গা ডুবল। তার পরের বছর নমনকুরির নতুন আবাদী জমি ডুবল। আর তার পরের বছর প্রবল জলস্রোত নমনকুরিকে পুরো ডুবিয়ে জামিলাবাদ হিঙ্গলকেও ডুবালো। আগের পনেরো-বিশ বছরের মধ্যে এরকম অভিজ্ঞতা কারো হয় নি। বাজিকররা আসায় পর তো জল হয়ই নি। বলতে গেলে বাজিকরেরা জলকে ভয় পায়। সাঁওতাল ওরাওঁরা যদিও প্রথমে লড়াই করেছে, কিন্তু এখন এতদিন পরে তারাও অসহায় বোধ করে। জামিলাবাদ-হিঙ্গলের উঁচু জায়গায় নমনকুরির মানুষ ও জানোয়ার অনাদরে অবহেলায় দুরন্ত বর্ষার সঙ্গে লড়াই করে, মরে।

তারপর বৃষ্টি শেষ হয়ে যখন শরতের মেঘের আনাগোনা শুরু হয় আকাশে, তখনো নমনকুরির জল দিগন্ত পর্যন্ত থৈ থৈ করে। সাঁওতাল ওরাওঁরা আশায় থাকে জল একসময় নামবে, তারা আবার তাদের ডুবে যাওয়া ভিটেগুলো সন্ধান ক'রে বের করবে। আবার মাটি তুলে উঁচু করবে, তারপর আবার ঘর বাঁধবে। একদিন প্রকৃতি হার মানবেই।

কিন্তু বাজিকরেরা এরকম সাহসিক চিন্তা করতে পারে না আর। পরতাপ, জামির ও তাদের মতো আরো দু'চারজন, যারা জমির সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা তৈরি করতে পেরেছিল, দূরে জলের মধ্যে তাকিয়ে নিজেদের জমিগুলোর দিকনির্ণয় করার প্রয়াস পায় বৃথাই।

তারপর আশ্বিন মাস পার হয়ে গেলে বাজি দলের সবাইকে জিজ্ঞেস করে, এবার ?

এ কথার উত্তর কারো কাছেই নেই। তখন বালিই আবার বলে, এখানে আর নয়, কোনো নতুন জায়গা খুঁজতে হবে।

—কোথায় ?

এ কথার উত্তরও থাকে না।

তখন কেউ একজন বলে, এবার কোনদিকে যাব ?

—পুবে।

এ কথা বলে জামির।

লুবিনি সেই পুবের দেশের কথা শারিবাকে বলে, যে পুবের দেশের কথা দমু পীতেমকে বলেছে, পীতেম বলেছে পরতাপ, জামির আর লুবিনিকে—জামিব বলেছে রূপাকে, আর এখন এই সমুদয় পুবের দেশের বৃত্তান্ত লুবিনি শোনায় শারিবাকে। কিন্তু কোথায় যে সেই স্থির দেশটি, যেখানে আছে বাজিকরের স্থিতি, স্থায়িত্ব, সেকথা কেউই জানে না। প্রতিবারই মনে হয়েছে এই বুঝি সেই দেশ। প্রতিবারই কোনো না কোনো আঘাত—সে আঘাত মানুষের সৃষ্ট হোক কিংবা প্রকৃতির সৃষ্ট হোক—বাজিকরকে দিশাহারা করেছে।

—নমনকুরি থিকা কোথায় গেলি, নানি ?

লুবিনি চুপ ক'রে থাকে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাই তাব পথেপ্রান্তরে কেটেছে। কোন তাড়নায় জামির নিত্য নতুন দেশের সন্ধান করেছে, তা আর কারো কাছেই বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। আবার এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহও আর কেউ বোধ করত না। কেন না, মালদা শহরে তারা থাকতে পারত, যেভাবে অন্য চারঘর থেকে গেছে। থাকতে পারত রাজশাহী শহরেও। কিন্তু জামিব এমন একটি স্থান খুঁজেছে যেখানে নমনকুরির মতো অজস্র ফসল সে ফলাতে পারবে, অথচ জলে ডুবে সর্বনাশ হবে না। সে যেন একটা পরিচয় চাইছিল নিজের দলের জন্য।

বালি বৃদ্ধ হওয়াতে দলের পরিচালন ভার তার হাতেই এসেছিল। আর জামিব দেখেছিল মাসখানেক এদিক সেদিক চলার পর মানুষগুলো জানোয়ারের মতো হাঁটছে। তারা অল্পেতেই পড়ছে ক্লান্ত হয়ে, তাদের কোমর বেঁকে যাচ্ছে, হাত ঝুলে পড়ছে সামনের দিকে। সেই রাজমহলের আমল থেকে একটানা পথে চলার অভ্যাস চলে গেছে।

এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে শেষপর্যন্ত জামির রাজশাহী শহরের বাইরে পদ্মা নদীর ধারে নামালো তাদের মোটঘাট। সুখস্বপ্নের স্মৃতির মতো নমনকুরি রয়ে গেল এক বিস্ময়। সেই ধান-চাল গরু-মোষের গেরস্থালি—সে কি এই জীবনেরই কোনো ঘটনা! এই বাজিকরের জীবনে!

বছর দুয়েক বাদে জামির একবার গিয়েছিল খোঁজ নিতে, কেননা নমনকুরি তাকে ভীষণভাবে পিছনে টানছিল। দেখে হতাশ হয়েছিল। নমনকুরি আবার তার আদিমতায় ফিরে গিয়েছে। বছরের ছ' মাস সম্পূর্ণই জলের তলায় থাকে। সাঁওতাল ওরাওঁ বা অধিকাংশই বিভিন্ন দিকে ছিটকে পড়েছে। যারা আছে, তারা হিঙ্গল, জামিলাবাদ ইত্যাদি গ্রামগুলোর সম্পন্ন চাষি-জোতদারের চাকর, মহিন্দর কিংবা নিতান্তই কেনা গোলাম হয়ে অসম্ভব দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে।

বৃদ্ধ বালি তখন বলেছিল, এখন তাহলে কি করবে বাজিকর ?

জামির কি এ কথার উত্তর জানে ? তবুও বালি তাকেই প্রশ্নটা করে। দলের দায়িত্ব যখন তার উপর, উত্তর তাকেই খুঁজে বের করতে হবে।

যুদ্ধে যাওয়া পাঁচ যুবকের মধ্যে এখন মাত্র দু'জন আছে, বালি এবং জিল্লু। এখন তারা বৃদ্ধ। তারা এখন জামিরের দিকে তাকায়, এই বৃদ্ধ বয়সে জামিরের কাছেই তারা আশ্বাস খোঁজে। আর তখন বালির ছেলে ইয়াসিন কিংবা জিল্লুর ছেলে সোজন যদি ঝুলি ঘাড়ে ক'রে ক্লান্ত হয়ে আস্তানায় ফেরে, জামির হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যায়। বলে, কোথায় গিয়েছিলি ? ভিখ মাঙতে ? কেন, আর কোনো কাজের খোঁজ করতে পারিস না ?

সোজন খুব চালাক চতুর ছেলে। খেলা দেখাতে যখন শহরের রাস্তায় কিংবা গ্রামে গ্রামে ঘোরে, সঙ্গে রূপাকে নেয়। রূপাও সোজনের সঙ্গে ঘুরতে ভালোবাসে, খেলা শেখে।

সে বলে, কোথায় যাব কাজ খুঁজতে ? গঞ্জের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজে কাল গিয়েছিলাম, তো এখানকার লোকেরা তাড়িয়ে দিল।

—কেন ?

—ভিড় বেশি হলে তাদের রোজগার কমে যাবে না ?

—তাও তো বটে।

কিন্তু জামিরের মাথা থেকে চিন্তাটা যায় না। তাহলে গঞ্জের হাটে কাজ আছে। সেখানে তাহলে চেষ্টা চালাতে হবে।

পরদিন সে ঘাটে যায়। নানাধরনের দেশী-বিদেশী মহাজনী নৌকোয় ঘাট ভরা। প্রচুর মাল ওঠানামা হয়। ভিড়, ধুলো, চিৎকার-চেঁচামেচি মিলে জায়গাটা অদ্ভুত রকমের ব্যস্ত ও সরগরম। জামির একটা গাছের নিচে বসে অলসভাবে দেখতে থাকে—সবকিছু।

ছোট বড় অজস্র নৌকোর মধ্যে অনেক উঁচুতে মাথা তুলে ভেসে আছে তিনখানা বাষ্পচালিত নৌকো। এগুলো এদেশে নতুন এসেছে। মাঝে মাঝে কোনো কোনোটা তীব্র ভোঁ দিচ্ছে। কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে লাইন দিয়ে মাথায় ক'রে, পিঠে ক'রে কুলিরা নৌকোয়, স্টিমারে মাল তুলছে। বেশির ভাগ বস্তাতেই ধান কিংবা চাল। মানুষগুলোর সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম ঝরছে। রোদ যত বাড়ছে, পরিশ্রম যত বাড়ছে, ততই মানুষগুলো একে অন্যের সঙ্গে অসংযত ব্যবহার করছে। একের গায়ে অন্যের ধাক্কা লাগলে পরস্পরকে খেঁকিয়ে উঠছে। খাটনির চাপে সব মানুষগুলো যেন ক্রমশ মারমুখি হয়ে উঠছে। অসংখ্য পাতি কাক সমস্ত বন্দর এলাকা ছেয়ে আছে এবং বিরক্তিকর একঘেয়ে চিৎকার করছে।

জামির এইসব দেখছে ও চিন্তা করছে, এইসব জাগতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে

বাজিকরের কোনো সম্পর্ক নেই। একথা অবশ্যই সত্যি যে, যে মানুষগুলো ঐ নৌকো ও স্টিমারের জঠর ভরছে খাদ্যশস্যে, তারা প্রতিদানে পাচ্ছে শুধু নিজেদের জঠরের জন্য ঐ খাদ্যশস্যই দু'এক মুঠো। তবু এই ব্যস্ততার মধ্যে অন্য কিছু আছে, যা বাজিকরের জীবনে নেই।

চেহারা দেখে জামির অনুমান করতে পারে এখানে মূলত দুই জাতের মানুষ আছে। স্থানীয় কুলিদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। বহিরাগত মানুষও আছে, তারা বিহারী ও হিন্দিভাষী। ক্রমশ বেশি বেশি বিহার অঞ্চল থেকে এদিকে মানুষ আসছে। বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খরা হয়েছে এবং তার জন্য দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলছে। মানুষ তাই দলে দলে এসে কুলির কাজে এদিকের গঞ্জ, বন্দর ও রেল-স্টেশনে লেগে পড়ছে। জামির চিন্তা করে এই স্রোতের সঙ্গে আপাতত মিশে যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। যে করেই হোক এদের সঙ্গেই মিশে যেতে হবে।

সে যেখানে বসেছিল তার কাছেই বিরাট একটা নৌকোয় মাল বোঝাই হচ্ছে। কলের কাছে দু'খানা কাঠের পাটাতন মাটি ও নৌকোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। মানুষ মাথায় মোট নিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে নৌকোর খোলের ভিতরে নেমে যাচ্ছে। আবার নেমে এসে জল ভেঙে পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকা মোটর গাড়ি থেকে বস্তা তুলে নিচ্ছে।

এরই মধ্যে পাটাতনে উঠতে গিয়ে হঠাৎ একজনের পা বেকায়দায় পড়ে পিছলে যায়। লোকটা অদ্ভুতভাবে পড়ে। তার মাথায় কম করেও চার-পাঁচ মণ ওজনের বোঝা ছিল। পা পিছলে সামনের দিকে চলে যেতে সে সোজা চিৎ হয়ে পড়ে যায় এবং মাথার ভারি বোঝা সশব্দে বুকের উপর পড়ে তাকে পিষ্ট করে। সামনে এবং পিছনে তার ভারবাহী মানুষ, তারা কেউ সাহায্য করতে পারছে না। জামির লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে লোকটার বোঝাটা অমানুষিক শক্তিতে তুলে একপাশ করতে যেতেই সেটা গড়িয়ে জলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কোলাহল উঠেছিল। এখন একজন গোমস্তা ও দুনা দুই-তিন পাহারাদার ছুটে আসে। জামির শুধু দেখল লোকটির মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এল। সে তাকে দু'হাতে তুলে গাছের তলায় নিয়ে এসে শুইয়ে দিল।

মুহূর্তে ভিড় হল। কেউ একজন চেঁচালো, রমজান চাচারে ডাক, গোলাম পড়েছে। জামিরের থেকে বয়সে কিছু বড় একজন প্রৌঢ় মুসলমান দৌড়ে আসে।

—হায় আল্লা, এ কি হল?

জামির রমজানকে জায়গা দেয়। রমজান দু' হাতে গোলামের রক্তাক্ত মুখ ধরে নাড়া দেয়, ডাকে।

নাড়া লেগে নাকমুখ দিয়ে আবার রক্ত ওঠে। গোলামের জ্ঞান নেই। রমজান বিহ্বলের মতো এদিকে ওদিকে তাকায়, কি করবে বুঝতে পারে না।

কেউ একজন গামছা ভিজিয়ে নিয়ে এসে নিঙড়ে গোলামের মুখের উপরে দেয়। জামির রমজানের পিঠে হাত দেয়। রমজান তাকে দেখে, সেই একই বিহ্বল চাউনি।

জামির বলে, ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

—ঘরে ?

—ঘর কত দূর ?

—ঘর ?

জামির পাশের আর দু'একজনকে বলে, ধর তো ভাই !

রমজানের ঘর বেশি দূরে নয়। সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে সেখানে নিয়ে আসে। সকালে যে মানুষটা তাজা ছিল দুপুরে এ অবস্থায় সে ফিরে এলে সে বাড়িতে যা হবার এখানেও তাই হয়। জামির রমজানকে থম দিয়ে বসে থাকতে দেখে, গোলামের মাকে বুক চাপড়ে কাঁদতে দেখে, দেখে গোলামের বউকে জ্বালার মতো পেট নিয়ে উঠোনে অজ্ঞান হয়ে পড়তে।

কেন না বাড়িতে আনার আগেই গোলাম মারা গিয়েছিল। জামির হতবুদ্ধি প্রৌঢ় মানুষটির পাশে সারাক্ষণ বসে থেকে অন্যদের শোক, ব্যস্ততা, কবর দেওয়ার ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি দেখতে থাকে।

এই ভাবে রমজানের সঙ্গে জামিরের যোগাযোগ হয়। শহরের উপকণ্ঠে রমজানদের গ্রাম। জমি থেকে বিভিন্ন কারণে উৎখাত হওয়া কয়েক ঘর মানুষের বসতি এখানে। প্রায় সবারই জীবিকা গঞ্জের ঘাটের কুলিগিরি। গোলাম ছাড়াও আরো তিনটি সন্তান আছে রমজানের, তাদের মধ্যে বড়টি মেয়ে ও বিয়ের উপযুক্ত।

স্বাভাবিক মানুষের জীবনে শোক কখনো স্থায়ী হয় না। প্রাথমিকভাবে শোক আসে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে, তখন মনে হয়, কি হবে আর ? কি করব এই জীবন নিয়ে ? তারপর একসময় শোক ভীষণভাবে চেপে বসে। সে চাপ এমন পাশবিক, যে মানুষ অন্য আর সব শারীরিক কষ্টের মতোই তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। শরীরের একেবারে নিজস্ব কারখানায় তখন সজ্ঞানে অথবা অবচেতনে তৈরি হয় আশ্চর্য প্রতিরোধ, যা নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে কখনো কখনো ভীষণ মর্মান্তিক বোধ হয়। তবুও এই নিয়ম ভারি অমোঘ। শোকের শুরু থেকেই মানুষ নিজের অজান্তে এই প্রতিরোধ তৈরি করতে শুরু করে, পরে মানসিক চেষ্টা তাকে আরো শক্তিশালী করে।

জামির দেখে মুহ্যমান রমজান ধীরে ধীরে নিজেকে স্বাভাবিক ক'রে নেয়। প্রথমে যে মানুষটা বলেছিল, 'মুই কি পাগল হোই যামো ?' এখন সে বলে, 'বসি থাকলে চলবে বাজিকর ?' এবং গঞ্জের ঘাটে স্টীমারের ভোঁ। শুনে দশদিনের মাথায় সে উঠে দাঁড়ায়।

কোনো এক অজ্ঞাত সহমর্মিতায় জামির প্রতিদিন এই মানুষটার কাছে আসে।

অধিকাংশ সময়ই দু'জনে চুপচাপ বসে থাকে। সুখদুঃখের কোনো কথাই হয় না। যখন কথা হয়, তার বিষয়বস্তু তাদের নিজস্ব দার্শনিক বোধবুদ্ধির লেনদেন। যেমন, রমজান বলে, ছ্যাথেক বাজিকরের পো, খোদাতালায় কাছে মোর কিছু নালিশ নাই, তবু যে মনটা পোড়ে ক্যান!

তখন জামির বলে, আঃ হা, সিটা ভারি আচ্চয্যের কথা বটে এবং জামির শুধু কথার কথা বলে, যেমন কথার পিঠে কথা বলতে হয়। আবার যেমনি নিজের কথা নিজের কানে যায়, তখন ভাবতে বসে যে কথাটা ঠিক হল কি না!

সত্যিই আশ্চর্যের কথা এবং জামির ভেবে দেখে সে ঠিকই বলেছে। কেন না, একজন আছে, যার কাছে সব নালিশ অভিযোগ রোষ দুঃখ ইত্যাদি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করা যায়, এসব সে অভিজ্ঞতায় জানে না, জানে বুদ্ধিতে। সে জানে রমজানদের এই একজন আছে, তাই কখনো কখনো একটা বিরাট আশ্রয়ের মতো তা কাজ করে। এ আশ্রয় শুধু সমপর্ণের জন্য নয়, এ এমন একটা আধার, সেখানে তুমি তোমার যাবতীয় ক্লেদ, ক্রোধ এবং ঘৃণাও নিক্ষেপ করতে পার। এই আশ্চর্য ঈশ্বর কিংবা খোদাতালা রমজান কিংবা তার স্বগোত্রীয় সামাজিক জীবদের এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যেখানে চাই না তোমাকে, জানি না তোমাকে, বললেও সেই নিরীশ্বর ঘোষণা আসলে এক পরম আস্তিক্যের অভিমানে আবদ্ধ থাকে। কাজেই গোলামের মা স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারে, 'নাথি মারি তুমার ওই মসজিদ আর জুম্মা আর নেমাজেৎ, খোদাতালা নাই, খোদাতালা নাই। থাকলি মোর কপালেৎ এমুন হয়। আল্লা রসুল! আল্লা রহমানের রহিম! দুনিয়ার বেবাকে হাসির ধামার মতো প্যাটটা দেখবা পালো, আর সি পালো না!

আর তখনি রমজান বলে— না, তার কোনো নালিশ নেই। হাসি গোলামের বউ। জামির এই দু'জনের দু'ধরনের কথাই শোনে, হাসির কথা কিছু শোনে না। না শুনলেও সে তার শূন্যদৃষ্টি দেখে, যেখানে সেই একই আস্তিক্যের ভাষা।

তাই সে আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে, যদি নালিশই না থাকে, তবে, রমজানের বুক পোড়ে কেন? নমনকুরির বাপের মতো সর্বনাশ বাজিকরের আর কি হয়েছে? কিন্তু সে একটা লোকসান। তার সঙ্গে আছে নিতান্তই নিরুপায় দুর্ভাগ্য। কোনো বাজিকর রমণী আকাশের দিকে তাকিয়ে গোলামের মায়ের মতো কাউকে গাল পাড়ে নি। কোনো বাজিকর এমন কথাও বলে নি, 'না আমার কোনো নালিশ নেই।' তারা জেনেছিল যে, ক্ষতি যা হয়েছে, তার আর আসান নেই। তাই এমন কারো কাছে আশ্রয় চায় নি যার কোনো জৈব অস্তিত্ব নেই। যে আছে তার নাম রহু। কিন্তু সে কি এমন অমোঘ? পীতেমের মতো জামিরেরও মনে হয়, না, তা কখনোই নয়। আসলে রহু, দনু, পীতেম কিংবা জামির মূলত প্রায় একই। আর, বিগামাই, কালী মাই, কি ওলা মাই? সেও তো শুধু পাথের সংগ্রহ, তার বেশি কিছু নয়।

লুবিনি জামিরের ভেতরে ওবের এই দেশটার যাবতীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণ আত্মস্থ হতে দেখে। সব কিছুই বদলে যাচ্ছিল, বদলাচ্ছিল না শুধু বাজিকরের কপাল। না হলে কোথাকার কোন ভিনদেশী বাজিকর, এখন তার কথাতে পর্যন্ত এদেশী ভাষা। শিশুরা এখন আগে স্থানীয় ভাষা শেখে, তারপর মা-বাপের বুলি। আর মা-বাপও এখন যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই এই দেশের ভাষাতেই কথা বলতে চায় বেশি সময়।

এতে জামির এক ধরনের আশ্বস্ত হয়। কেন না, অভিজ্ঞতায় বুঝেছে অস্তিত্ব রক্ষায় এই পরিবর্তন ভালো। কারণ, পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে বাজিকর এই পৃথিবীতে টিঁকে থাকতে পারবে না, একথা পীতেমই বুঝেছিল। এখন জামির বোঝে এই পরিবর্তনের মধ্যে যদি মিশে যাওয়া যায়, সেটাই হবে মঙ্গলের।

কাজেই স্বার্থপরের মতো রমজানের সঙ্গে সম্পর্ককে সে আঁকড়ে ধরে থাকে ও ব্যবহার করে। রমজানের সহায়তায় গঞ্জের ঘাটে কুলির কাজ পেতে এখন আর বাজিকর যুবকের অসুবিধা হয় না।

লুবিনি নদীর পাড়ে বসে কিংবা গঞ্জের হাটে এই দেশটাকে আরো গভীরভাবে বুঝতে শুরু করে। সারা দিন সারারাত এই বিশাল নদী দিয়ে অসংখ্য ছোট বড় নৌকো যায়। সেইসব নৌকোয় জীবনের বিচিত্র সব রঙ ধরা পড়ে যার সঙ্গে বাজিকরের কোনো মিল নেই। কোনো নৌকোয় নতুন বউ শ্বশুরবাড়ি যায়। নৌকোর আয়তন দেখে বুঝতে হবে, কেমন ঘরের মেয়ে আর কেমন ঘরের বউ। কি ক'রে বুঝবে যে শ্বশুরবাড়ি যায়, না বাপের বাড়ি যায়? দেখ, মেয়ের মাথায় ঘোমটা আছে কি না, তার পরে দেখ সে মেয়ের চোখ ছলোছলো, না হাসিহাসি।

আবার সাহেব-মেম, বাবু-বিবিদের নৌকা কত বড় ও বাহারি। তিন কামরা, চার কামরার নৌকো সব। কোনো নৌকোয় তাকিয়ায় হেলান দেওয়া গেলাস হাতে বাবুদের সামনে বাই নাচ হয়। কোনো নৌকোয় সাহেব-মেম হৈ-হল্লা করে খানাপিনা করে। আবার জেলে নৌকোই বা কত ধরনের। পদ্মাপারে জেলেরা সর্বত্রই খুব দাপটের।

লুবিনি যখন আবার গঞ্জের হাটে অন্য বাজিকর মেয়েদের সাথে কুহক, ভানুমতি, ওষুধ, শিকড়, তাবিজ ফিরি করে, তখনো তো মানুষের কত বিচিত্র জীবনপ্রণালী দেখে।

জামির ধীর স্থির মানুষ। এই ধরনের মানুষ বিবেচক হয়। যে মানুষের ধাক্কা খায়তে হয় না কাউকে, তার আত্মসন্তুষ্টি ঠেকায় কে? কিন্তু এমন মানুষ জামির নয়।

নমনকুরির স্মৃতি অন্য অনেকের কাছে বহু দূরের হয়ে গেলেও জামিরের কাছে নয়। মাথায় বোঝা নিয়ে সে যখন স্টিমার কিংবা নৌকোয় ওঠে, তখন নিরুপায় ঘাম মাথা ও কানের পাশ বেয়ে মুখের উপরে, ঠোঁটে ও জিভেও এসে পড়ে। এই ঘামের নোনতা স্বাদ তাকে এখনো নমনকুরির ফসলের মাঠে নিয়ে যায়।

লুবিনিকে সে বলে, এংকাই মিলমিশ হোই যাবে, লয় ?

—কার সাথ ?

—ইখানকার মানুষজনের সাথ।

—তাই ভাবেন তুমু ?

—তাই চাই মুই।

জামির এমনই চায়। কিন্তু এ শুধু তার ইচ্ছাই, আর ব্যাপারটা এত সহজ নয়ও।

লুবিনি বলে, কেন্তু দেখেক, মানুষ হেথায় দু'রকম আছে। আছে হিন্দু, আছে মোছলমান।

—সিতো সব্বত্তই আছে।

—হাঁ সিটা ঠিকোই। তবি দেখো, ইয়ার সাথ উয়ার মিল নাই, আবার উয়ার সাথ ইয়ার মিল নাই। এ দু'জাতের কেরো সাথ বাজিকরের মিল নাই।

এসব কি জানে না জামির ? খুবই জানে। তবুও লুবিনির সাথে অলস সংলাপ হিসাবে এই প্রিয় বিষয়টাই সে বেছে নিয়েছিল। আর এখন দেখে কি নির্দয় যুক্তিতে লুবিনি তার ইচ্ছাগুলোকে ভাঙে। তবুও সে কথা চালিয়ে যায়, এ যেন তার নিজের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব, হয়ত ভাবে এভাবে একটা সমাধানের রাস্তা নিজের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসবে।

সে বলে, মিল নাই ? দেখ না ক্যান্ রমজান মিয়া মোক কত খাতির করে, তার বেটাবিটিরা মোক চাচা কয়, তোক কয় চাচি। তবি ?

—ইস্টিমারে যখুন দুকরের ভোঁ পড়ে রমজান মিয়া নদীৎ নাইমে অজু করে, তুমারে ডাকে তখুন ?

—মোক্ ডাকপে ক্যান ? মুই কি নেমাজ পড়মো ?

লুবিনি যুক্তি দিয়ে বোঝায় যে বাজিকর নমাজও পড়বে না আবার হিন্দুদের মতো পুজো-আচ্চাও করবে না। যেসব মালোরা দুর্দিনে গঞ্জের ঘাটে এসে কুলিগিরি করে সুযোগ আসা মাত্র নৌকো পাড়ে টেনে তুলে উপুড় ক'রে গাব আর আলকাতরা লাগায়, নিজেরা গায়ে মাথায় তেল মেখে চকচকে হয়। তারপর একদিন গলুইয়ের উপর ফুল পাতা সিঁদুর ধূপ দিয়ে 'জয় মা গঙ্গা' বলে নদীতে ভেসে পড়ে। আবার বড় বড় সাঁইদারদের দেখ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত এনে পুজো করে, সাঁই সাজায়, কত তার অনুষ্ঠান। সেসব ব্যাপারে কেউ কি বাজিকরকে ডাকে ?

—না, ডাকে না।

—তবি মিল হয় কেংকা ?

নিজের মনের সংশয়ের কথাগুলোই জামির লুবিনির কাছ থেকে শোনে। তবু জিলুব ছেলে সোজান যখন জেলেদের ঘরের একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে আনে, তখন সে খুশি হয়।

কিন্তু এই খুশি হওয়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জামিরের অভিজ্ঞতায় গোরখপুরের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু বালি ও আরো দু'চারজন বেঁচে থাকা বৃদ্ধের স্মৃতিতে গোরখপুর এখনো জীবন্ত। এ দেশের মানুষের জাত-পাত সম্বন্ধে সহনশীলতা গোরখপুরের থেকে অনেক বেশি, এ তারা দেখেছে। কিন্তু তবুও বিয়ে এমন একটি ব্যাপার যার শিকড় সমাজের গভীরতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণভাবে যা চোখে পড়ে না, এইসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের সম্ভাবনায় তা উপরে উঠে আসে।

সোজান যাকে বিয়ে ক'রে এনেছে, অথবা যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছে, সেই মেয়েটি পাখি। পাখি ঝালোদের মেয়ে।

জামির বলে, ঝালো কি ? ঝালো আবার কোন জাত ? মালো চিনি, ঝালো চিনি না।

লুবিনি চেনে। দুপুরে যখন ঘরে পুরুষমানুষ থাকে না, তখনই তো বাজিকরের মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। লোকজন, দেশবিদেশ দেখা পুরুষ মানুষ বাজিকর রমণীদের বুজরুকিতে ভোলে না, দূর দূর করে। কিন্তু মেয়েদের তো অসীম কৌতূহল ঐ পুঁটুলির ভিতরে। বাজিকর মেয়েরা, না জানি, কি আশ্চর্য সম্ভাবনাময় জিনিসপত্র রেখে দিয়েছে ওর মধ্যে !

লুবিনি বলে, মালো আর ঝালোর ভেতরে তফাত আছে। যে জনা গাঙ্গে যায় বড জাল নিযা, নাও নিয়া, সি হোল মালো। সি জালের ফাঁস থাকে। টানা হোক, কি খেপ্‌লা হোক, তাথে অনেক পয়সা লাগে। আরো লাগে নাওয়ের মালিকানা।

আর ঝালো ? তার জালে ফাঁস নেই। লম্বা লাঠির ভেতরে গলানো কয়েক হাত মাত্র সুতোর কারিগরি, বা তিন কাঠির ভিতরে মৌচাকের মতো ঝুলে পড়া নিতান্ত আটপৌরে জাল। সেই সব দিয়ে পুকুর, নালা, বর্ষার খেত কি নয়ানজুলিতে মাছ মারা। পুরুষের পরনে অধিকাংশ সময়ই কোমরের ঘুনসিতে এক ফালি ত্যানা, পেছনে ঘুরে ফের কোমরে ওঠার আগে পশ্চাৎকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে প্রকট করে। আর মেয়েদের খাটো শাড়ি, যা ঝালো কন্যার জীবনে একসঙ্গে একাধিক জোটে না।

রাজশাহীর মালোরা বর্ণশ্রেষ্ঠ। ঝালোদের সঙ্গে তাদের ক্রিয়া-কলাপ হয় না। দু' সম্প্রদায়েরই পদবী অবশ্য 'হালদার'।

কিন্তু জামিরের এই সুখী উত্তেজনা খুব স্থায়ী হয় না। পাখির বাপ নীলু হালদার গঞ্জের ঘাটে মাল বওয়ার কাজও করে। যেহেতু পাখি বয়স্থা হলেও সে বিয়ের

ব্যবস্থা করতে পারে নি, তাতে তার লোকনিন্দা ছিল। কাজেই পাখি যখন নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নেয়, তাতে সে স্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু তার স্বজনরা তাকে ছাড়বে কেন? তারা নীলুর কাছে কৈফিয়ৎ চায়। কে না জানে বাজিকর বেজাত। ঝালো বলে কি শেষমেষ বাজিকরের হাতে মেয়ে দিতে হবে? একটা সমাজ নেই!

গঞ্জের ঘাটে মানুষজন এ নিয়ে নীলুকে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। কয়েকদিনের মধ্যে নীলু অতিষ্ঠ হয়ে যায়। মাতব্বরদের সে বলে, তবে কি করবা কও মোক্?

চৈত্র মাসে সব মাছমারাদের চড়কের উৎসব হয়। তাতে বেশ কয়েক বছর ধরে নীলুই হয় প্রধান সন্ন্যাসী। তাকে নিয়ম কানুন মানতে হয়। উপোস করতে হয় এবং ঠাকুরের কাঠ ঘাড়ে নিয়ে এক মাস বাড়ি বাড়ি পথ পরিক্রমা ক'রে ভিক্ষা করতে হয়। সেই ঠাকুর বড় সুন্দর। মসৃণ ও চকচকে কালো কাঠের নৌকো, তার উপরে একদিকে খোদাই করা শিবের ও তার বাহন ষাঁড়ের মূর্তি। অন্য পাশে হাত জোড় করা দুই ভক্ত। মাঝখানে একটি শঙ্খ। এহেন কাঠের ঠাকুর নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করতে হয় সারা মাস। সঙ্গে থাকে ঢোল, ঢাক, শানাই ও কাঁসি। বাড়ি বাড়ি গান করতে হয়। গান করে হেমন্ত। গান করাই তার নেশা ও পেশা।

হেমন্ত বলে, হল না হয় বাজিকর। মানুষ তো, জন্তু-জানোয়ার তো নয়। পাখির মনেৎ লাগিছে, ব্যাস, আর কথা কি?

এ রকম কথা হেমন্তই বলতে পারে। সে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ায়, সম্বলের মধ্যে একটা দোতারা যন্ত্র। সে যন্ত্রে কত বিচিত্র সুরই বাজায় সে, আর সব সুরই যে কোনো মাত্রা থেকে সমে এনে ফেলতে পারে হেমন্ত, এমনই ওস্তাদি তার।

একজন মাতব্বর বলে, তুমি কি বুঝবা, হে! ঘর কর না, সমাজ কর না। মালো গুষ্ঠি পয়সার দেমাকে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, ঝালোরা নিজ সমাজে সেটি হবার দিবে না।

নীলু বলে, ঠিক কথা, এলা ঠিক লয়।

হেমন্ত হাসে। বলে, মালো গুষ্ঠির পয়সাটা তুমি কুনঠি দেখলা, মাতব্বর? দু'চারজন সাঁইদারের কথা বাদ দিলে, আর বেবাকে তো নেংটা, জালের ঘান্দি আটকাবার সুতা কিনার পয়সাও তো আজকাল আর জোটে না দেখি।

—তুমো কি তাদের গরম কযে?

—গরম তোমরা দেখ, তাই তাদের গরম। মোক্ তো কেউ গরম দেখায় না।

—ওই আবার! আরি, তুমার কথা আসে কিসে?

হেমন্ত বলে, বেশ, তবি তোমরাই কও, মুই শুনি।

বলে সে তার দোতারায় কানে মোচড় দিয়ে টুং টাং ক'রে সুর বাঁধতে শুরু করে।

সবাই মিলে ঠিক করে পাখিকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। ছাড়িয়ে এনে তাকে আবার বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়, এমন কুলত্যাগী মেয়েকে আবার বিয়ে করবে কে, এই প্রশ্নে।

সবার পিছনে বসে বৃদ্ধ পতিতপাবন ঝিমায়। এই প্রসঙ্গে সে মাতব্বর খগেনকে বলে, খগা, মোর কথাটা মনেৎ রাখিস, বাপ।

খগেন বলে, আর তুমি থামো তো। সেই সকাল থিকা খালি এক ট্যাক ট্যাক লাগাইছে। বলিছি তো, এ্যাটা বিহিত করো্যে দিব।

—হুঁ, দিস বাপ, ভুলিস না।

পতিত এই ঝালোদের মধ্যে ধনী লোক। সামান্য দু' চারশো টাকার সুদের কারবার সে করে, তারও গণ্ডি এই ঝালো সমাজ। এই পরিণত বয়সে বিপত্নীক হয়ে সে বড বিপাকে পড়েছে। মাতব্বর খগেনের সঙ্গে তাই সে সকাল থেকেই লেগে আছে। কাজটা যদি খগেন ক'রে দিতে পারে, তাহলে তার পুরনো দেনাটার কথা না হয় সে আর তুলবেই না। আর কাজটা হল, যদি পাখিকে খুলে আনা যায় তাহলে সে-ই বিয়ে করতে রাজি তাকে।

খগেন এক মুমূর্ষু গোষ্ঠীর মাতব্বর। যখন কোনো সমাজ লক্ষ্মীছাড়া হয়, তখন আর কার মাতব্বরি কে শোনে! কিন্তু মাতব্বরির মজা এই, একবার দায় চাপলে তাকে আর ঘাড থেকে নামানো মুশকিল। কেউ চা'ক আর নাই চা'ক, মাতব্বরির নেশা তাকে মাতব্বরি করাবেই। এই সব সামাজিক সমস্যায় খগেন তাই যেচেই মাতব্বরি করে। দু'একজনকে উসকায়, দলে টানে, তারপরে তার নিজস্ব রায় দেয়। পতিতকে সে আশা দিয়ে রেখেছে দুই কারণে। প্রথমত, পুরনো দেনাটা পতিত তামাদি ক'রেদেবে বলেছে। আর দ্বিতীয়ত, সামাজিক কর্তৃত্ব জাহির করার বেশ জোরদার একটা সুযোগ এই সমস্যা। পাখিকে খুলে আনা ও পতিতের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, এই দুই কাজে তার কর্তৃত্ব নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু অধৈর্য এই বৃদ্ধের উপর এখন তার রাগ ধরে। সব ব্যাপারটা বেশ হিসাবমতো এগোচ্ছিল, মাঝখানে কথা তুলে সব বেচাল ক'রে দেবে হয়ত।

নীলুকে সে বলে, শোনেক, নীলুদাদা, ইসব অনাচার সমাজের বুকেৎ মুই হবার দিবা পারি না। তুমুও কি পারেন?

নীলুকে বলতে হয়, না, তা পারি কেংকা?

—ফির দেখেক, তুমু হলেন তামাম মালো-ঝালোদের চডকের পেধান সন্ন্যাসী। বেবাক মানুষ জানে তুমু পেধান থাকলি বাবার পূজাৎ কোন তুরুটি থাকে না। বেবাক মানুষ জানে তুমার মন্তর পড়া হাজরা আগুন, জল, মায় পদ্মা পার হয়া শ্মশান-মশানে ঘুঁরি মরার খুলি আনবে ঠিকই।

এসব কথায় নীলুর বুক ফোলে। হাজরা ছাড়ার মন্ত্র এখন একমাত্র সেই জানে। -সংক্রান্তির আগের রাত্তিরে মন্ত্র পড়া তেল সিঁদুর দেওয়া খড়্গ দিতে হয় কোনো

ভক্তকে। ভক্ত তখন দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই খড়্গ হাতে ছুটে যায়। শ্মশান মশানে ঘোরে সারারাত্তির। সেই সময় তার সামনে পড়া খুব বিপদের। বাবার নামে সে তখন যা খুশি তাই করতে পারে। ভূতপ্রেতেরা তখন হয় তার সঙ্গী। ভোর হওয়ার আগে মড়ার মাথার খুলি নিয়ে তাকে হাজির হতে হয়। এর নাম 'হাজরা ছাড়া'।

মাতব্বর আবার বলে, বাবার পূজা তো আর একটা মাস গেলেই। রীতকরম সব তো তুমারই হাতে। এখন তুমুই বল যে কি করা হবে?

—কি করবা কও?

—পাখিরে খুলি আনবা হবে।

—আনলাম, তাবাদে? কেডা বিয়া করবে তারে?

—সি ভাবনাও মুই ভাবি রাখিছি। মামার ঘর খালি। ছোলগুলা তো বেবাক পিরথগান্ন। দেখেক, বুড়া বয়সে মানুষটা বড কষ্ট পায়। তুড়া ফুটায়া দেবার লোকও নাই। অস্বীকার করবা পার না, আপদ বিপদে পতিত হালদারই আমাগোরে দেখে। পাখিরে মামার হাতেই দেও। অনেক বলি কয়ে রাজি কইরেছি মামাক।

হেমন্ত সশব্দে হেসে বলে, অ, তাই কও। তাই মুই ভাবি গাই বিয়ায়, আর যাঁড়ের ইয়া ফাটে ক্যান্।

মাতব্বর খগেন খুব রেগে ওঠে। বলে, হেমন্ত তুমু থামবা কি না? সব কথার মাঝে তুমু এ্যাটা হাসিঠাটা আনে ফালাবার চাও। বেপারটা কত গুরুতর সে খ্যাল তুমার নাই।

হেমন্ত হাসতে হাসতেই বলে, খুবই গুরুতর। কি গুরুতর? না, এটা যুয়ান চ্যাংড়ি এটা যুয়ান চ্যাংড়ার ঘরেৎ গিয়া উঠিছে। মাতব্বরের কথা শুনে এটা বুড়োর ঘরেৎ উঠে নাই।

হেমন্তের ইঙ্গিতে পতিতপাবনও উত্তেজিত হয়। বলে, কি, মোক বুড়া কইলি, হেমন্ত! মুই বুড়া! জানিস, তোর বাপের কাছেৎ এখনো আটগণ্ডা পয়সা পাই। সি পয়সা না দিয়াই তোর বাপ মরিছে, তোর কাছেৎ কুনোদিন সে পয়সা চাইছি?

—টিকিট তো কাটি রাখিছ, মামা। ওপারেৎ গিয়া বাপের কাছ থিকা সি পয়সা নেও গা। আর ক্যান্ মায়া বাড়াও?

গণ্ডগোলও হয়, হাসিঠাট্টাও হয়। কিন্তু উপস্থিত সকলে শেষ পর্যন্ত খগেনের কথাতেই সায় দেয়। না দেওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা, যে যার নিজের সমস্যা নিয়েই এত ব্যতিব্যস্ত যে অন্যের ব্যাপারে চিন্তা করার সময় কিংবা আগ্রহ কারোই বিশেষ থাকে না। কাজেই সমাজে মিলমিশটা অন্তত থাকুক, এটুকু নিশ্চিত হতে পারলেই সবাই খুশি।

—কিন্তু পাখি যদি না আসতে চায়, তবে? বাজিকরেরা যদি না আসতে দেয়?

– আসবে না! তার ঘাড়ে কয়টা মাথা? আসতে তাকে হবেই।

– আর বাজিকরেরা যদি তাকে আটকে রাখার মতো দুঃসাহস করে তবে তার প্রতিফলও তারা পাবে।

এসব কথায় হেমন্ত ভয় পায়। সে তার নিজ গোষ্ঠীর এই সব হা-ঘরে মানুষগুলোকে ভালোই চেনে। ঝড়ে ভাঙা, বৃষ্টিতে ধোওয়া কুঁড়েঘরগুলোর ভেতরে যে এত রকমের সড়কি, বল্লম, হেঁসো থাকতে পারে, একথা আর কেউ না জানুক হেমন্ত জানে। আর নিস্তরঙ্গ দুঃখপীড়িত জীবনে, যে কোনো কারণেই বিরোধ হোক না কেন প্রতিপক্ষকে মনে হয় যাবতীয় দুর্দশার কারণ। ভীষণ আক্রোশে তখন রক্ত ছুটবে ফিনকি দিয়ে, লাশ পড়বে, পদ্মাচরের উদ্দাম হাওয়ার মতো ছুটে চলে যাবে মানুষ রক্ত দর্শন করতে। উত্তেজনা আর উত্তেজনা। এই সব সময়ে পনেরো-বিশ বছরের পুরানো ঘরনীকেও নতুন ও উত্তেজক মনে হয়। হেমন্ত এসব জানে।

সে বলে, দেখেক, দাঙ্গাৎ যায়া লাভ নাই। ফির সি থানা পুলিসের ঝামেলি, শেষ-মেশ তিষ্টোবার জাগা পাবানা কোথাও। সিবারকার মালোদের সাথ বিবাদের কথাটা ভাবেক।

– তবি তুমুই দায়িত্বডা নেও, মায়া খুলে নিয়া আসেক।

খগেন হেমন্তকেই দায়িত্ব দিতে চায়। হেমন্ত অবশ্যই এসব কাজে উপযুক্ত ব্যক্তি। সর্বত্র তার যাতায়াত, সব মানুষের সঙ্গেই তার খাতির। নীলুও বলে, হ্যাঁ, ভাই, তুমুই যাও, মাথাঠাণ্ডা লোক তুমু, তাথে ঝামেলি কম হবে।

হেমন্ত বলে, কিন্তু এটু ভাইবা দেখেন তুমরা, কাজটা কি ঠিক হবে? এটা ছোঁড়া আর এটা ছেড়ি মিলমিশ হইছে, তাদের যুধা করবেন তুমরা?

আবার মাথা গরম হয়ে উঠতে চায় মাতব্বরদের। শেষে হেমন্তকে রাজি হতে হয়। তাতে আশ্বস্ত হয়ে উঠে যায় মাতব্বরেরা। অন্যেরা থাকে কয়েকজন। হেমন্ত বলে, নীলুদাদা, তুমার মনের কথাও কি এডা?

নীলু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে উত্তর দেয়, মোরে শুধায়ো না, জবাব পাবা না। বিচের ব দিবার পারি না, খোওয়াবার পারি না, আর এখন ভাবারও পারি না কিছু।

তরুণ বয়সের একজন বলে, কাকা, গান শুনি না অনেকদিন, এট্টা গান করেক।

গানের জন্য হেমন্তকে পেড়া পেড়ি করতে হয় না কখনো। সে আনমনে দোতারায় কান মুচড়ে সুর বাঁধতে থাকে। তারপর ভারি সময়োপযোগী একটি গান ধরে সে।

উজানী নগরের কাটা জলে ভেসে যায়,
কাহারো বসনে লাগে কাহারো হিয়ায়।

আশ্বিনে অনাবৃষ্টি যদি
ফলন নাই পোয়ালের গাদি,
ভরা যৌবনের কালে বাপ ভাই হইল বাদী।
উজানী নগরে যাব,
পিরিতের ধন চিনে নিব,
যে করে সে করুক মানা,
কারো কথাই শুনিব না।
গাঙ্গের জোয়ার নিশিদিনই বয় —
শরীলে যৌবন দুটি দিন বইতো নয়।

তার পরের দিন হেমন্ত জামিরের কাছে এসেছিল। বাজিকরেরা তাকে চেনে ও পছন্দ করে। সেখানেও সে এই গানটিই প্রথমে করে। তারপরে গল্প কথার মাঝে-মধ্যে সে বারবার বিষয়টা উত্থাপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। খবর পেয়ে একসময় পাখি আসে, তার সাথে সোজনও আসে। পাখির দেখাদেখি সোজনও তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। তখন হেমন্ত একেবারে বিহ্বল হয়ে যায়। বেশ মানিয়েছে দু'টিকে। আর কি খুশির ভাব দু'জনের! কি ক'রে আর সে এখন ওসব কথা তোলে?

সবাই চলে গেলে জামিরকে হেমন্ত কথাটা বলে। শুনে জামির কিছু সময় গুম হয়ে থাকে। শেষে বলে, তুমাদের সাথ মোদের সম্পর্ক হবার পারে না?

হেমন্ত বলে, বুঝি না বাজিকর। মোর তো কেরো সাথই সম্পর্ক আটকায় না।

— ঠিক আছে, তুমাদের মেয়াকে ডাকি। তুমু নিজ মুখেৎ তাক বলে যাও।

জামির বহুদিন পরে রাধার কথা ভাবে। সময় সবাইকে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জামির নিজেকে এখনো অপরাধী ক'রে রেখেছে। তাছাড়া এতদিন এদেশে বাস হয়ে গেছে। জামির ভেবেছিল, হয়ত মানুষ গ্রহণ করবে তাদের আস্তে আস্তে। কিন্তু হচ্ছে না, কিছুতেই শিকড় গাড়া যাচ্ছে না।

পাখি এলে সোজনও সঙ্গে আসে। জামির অন্যদিকে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে, তোমাক ফিরা যাবার হবে।

পাখি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সোজন বলে, ক্যান?

— বালোরা চায় না তাদের বিটি মোদের ঘরে থাকে।

— কেন্তু তাক্ তো মুই বিহা করি আনিছি।

— সি বিহা তারা মানে না।

পাখি বলে, মুই যামো না, কাকা। বাপেরে বুঝাও তুমরা

হেমন্ত [illegible] থাকে।

— কাকা তুমার দু'টি পায়েৎ পড়ি, মোক নিবার চায়ো না।

— মুই নিবার চাই না মাও, চায় না তোর বাপও, কেন্তু সমাজ চায়। তারা তুমাকও ছাড়বে না, তুমার বাপেরেও ছাড়বে না।

পাখি এতক্ষণে নিজেকে শক্ত করে। বলে, বেশ, গেলাম মুই, তাবাদে তুমার মাতব্বরেরা মোর কি গতি করবে ?

— ফির বিয়া দিবে তুমাক।

— কেডা বিয়া করবে মোক এবপরে ?

— লোক আছে।

— কেডা সি লোক ?

হেমন্ত মনেপ্রাণে চাইছিল পাখি বিদ্রোহ করুক। এই দৌত্য করতে রাজি হয়ে সে কি যে আহাম্মকি করেছে ! এখন তাই সে মনেপ্রাণে চাইছিল মেয়েটা অস্বীকার করুক ঝালোদের মাতব্বরদের নির্দেশ, পালিয়ে যাক এখান থেকে, যা খুশি তাই করুক। তাই সে নির্দ্বিধায় বলে, সি লোক হইল পতিত হালদার।

— কাকা ! ইসব থালে তুমাদের মোর বাপেক বেকাযদা করার চাল, নয় ?

— যা বলো।

— মুই যামো না, যা পারো করেন তুমরা।

পাখি হনহন ক'রে হেঁটে চলে যায়। সোজন দাঁড়িয়ে থাকে। খানিকক্ষণের স্তব্ধতা। সোজন ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই জামির আদেশের গলায় বলে, সোজন, দাঁড়া। সোজন আবার ঘুরে দাঁড়ায়।

জামির বলে, ও মেয়াক ঘুরাই দিবার হবে।

সোজন ভয়ে ভয়ে বলে, না।

জামির চিৎকার ক'রে তাকে সতর্ক করে, সো-জ-ন !

সোজন বেশ কিছু সময় চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ধীর পায়ে চলে যায়।

জামির হেমন্তকে বলে, কাল তুমাদের মেয়াক ফিরত পাবা, হালদার। আজ যাও।

হেমন্ত যেমন চেয়েছিল তেমন হয় না। সে ভারি দুঃখ পায়। একসময় চক্রান্ত করার ভঙ্গিতে ফিসফিস ক'রে বলে, বাজিকর উয়াদের কহেক পালাই যাবার।

জামির একটু হাসে। বলে, তা হয় না হালদার। তুমু তো বাজিকরের তাম্বুতে জন্মাও নাই, তুমু ইসব বোঝবা না।

পরদিন পাখি ফেরত চলে এসেছিল। সোজন তার পাশাপাশি অনেকদূর পর্যন্ত এসেছিল। তারা কোনো কথা বলে নি, তবুও তাদের উভয়ের মনই প্রচণ্ড

বাঙ্ময় ছিল। সেখানে ছিল অজস্র কথা। ঝালো পাড়ায় ঢোকার বেশ খানিকটা দূরে একটা গাছের নিচে পাখি দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, আর নয় বাজিকর, ইবার ঘুরে যাও।

সোজন তার চোখে চোখ রাখে। চারদিকে গ্রীষ্মের দুপুরের স্তব্ধতা। সামনে কিছু দূরে পদ্মার বালিয়াড়ি, তারপরে পদ্মা। পাখি সেদিকে তাকিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় খড়কুটো ঘুরপাক খেয়ে ছুটে যেতে দেখে। কিন্তু সোজনের চোখ তার মুখে।

সোজন তার মুখ দু'হাতে তুলে ধরে। পাখি দুর্বল হাতে সোজনের হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। বলে, লোভ কোরো না বাজিকর, ই লোভের তো শেষ নাই।

অথচ সোজনকে সে সত্যিই বাধা দিতে পারে না। সোজন তাকে বুকের মধ্যে পিষ্ট করে। বলে, আর দেখা হবে না, পাখি? পাখি কষ্টে নিজেকে মুক্ত করে। বলে, এক দেশে বাস, দেখা তো হতেই পারে। কেন্তু তাতে লাভ? সি তো খালি কষ্ট, বাজিকর!

দু'টি অল্প বয়সের তরুণ-তরুণী শিশুর মতো কাঁদে পরস্পরকে ধরে। তারপর একসময় হাত ছাড়িয়ে পাখি দৌড়ে খানিকদূর এগিয়ে যায়। আকুল আগ্রহে সোজনের দুই হাত তাকে ধরবার আগ্রহে সামনে বাড়ানো অবস্থায় থমকে থেমে যায়। পাখি ছুটতে থাকে, মাটির ঢেলায় আঘাত লেগে একবার পড়ে, আবার সে উঠে ছোটে। তার আঁচল মাটিতে লুটোয়। সে ভ্রূক্ষেপ করে না। সোজন সে-ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে।

গঞ্জের ঘাটে রমজান এবং তার গ্রামের বেশ কয়েকজন হঠাৎ অনুপস্থিত হতে শুরু করল। জামির বিষয়টা প্রথমে স্বাভাবিক অনুপস্থিতি বলে ভেবেছিল। কিন্তু পাঁচ-ছ'দিন পর-পর না আসতে দেখে সে খবর নিতে একদিন দুপুরে রমজানদের গ্রাম মামুদপুরের উদ্দেশে রওনা হয়। মামুদপুর পর্যন্ত তার যেতে হয় না, তার আগেই পদ্মার একটা নতুন চরে সে রমজানকে অন্য অনেকের সঙ্গে ব্যস্ত দেখে। সময়টা শীতের শেষ, কিন্তু পদ্মার উন্মুক্ত চরে রোদের তাপ বেশ চড়া। জামিরকে দেখে রমজান এগিয়ে এসে একপাশে বসে।

হাওয়ায় মিহি বালি উড়ছে। সেই হাওয়া রমজানের চুল-দাড়িকে এমনভাবে বিস্রস্ত করছে যে তাকে প্রায় অপরিচিত মনে হচ্ছে এখন। কাছেই নদীর জল, ক্রমশ প্রশস্ততায় যেন দিগন্তের সঙ্গে মিলেছে, সেখানে নদীর রঙ ঘন নীল।

জামির বলে, এসব হচ্ছেটা কি ? ক'দিন কামে যাবার দেখমো না ?

রমজান সলজ্জ হাসে। বলে, লেও, তামুক খাও। আর কহেন ক্যান্, চাষার ছেলে, গোরে না গেলে তো নেশা কাটবে না।

— চাষার ছেলে, তো এই মরুভূমিতে কি ?

— সেটাই তো ক'ছি রে, ভাই। নিজের তো আর জমি-জিরাত নাই। জমি নাই তো চাষও নাই, কিন্তু হাত যে নিশপিষ করে, বুক যে ধাঁফড করে! তাই পোতি বছর চড়ের এই পলি বন্দোবস্ত করি কাছারির সাথ।

— কি চাষ হবে এখানে ?

— তরমুজ, তরমুজের চাষ।

— তরমুজের চাষ এই বালিতে হয় ?

— হ্যাঁ, দেখ নাই তরমুজের খেত কোনদিন ?

দেখেছে নিশ্চয়ই, খেয়াল ক'রে দেখে নি। বাজিকর কী দেখে নি এই দুনিয়ার ? রমজানের বুকের ধাঁফড জামিরের বুকে সংক্রামিত হয়। সে বলে, কেমন লাভ থাকে তরমুজের চাষে ?

— ফসল যদি ভালো হয়, লাভ তোমার ভালোই থাকবে। তবে তরমুজের লতা আর কোলের ছাওয়াল মানুষ করা এক কথা কিনা।

জামির তখন আরো সবকিছু জানতে চায়। কি ক'রে চাষ করতে হয় ? কাছারিতে গেলে আরো বন্দোবস্ত পাওয়া যাবে কিনা ? পেলে কিসের বিনিময়ে পাওয়া যাবে ? চাষের পদ্ধতি রমজান শিখিয়ে দেবে কি না ?

রমজান বলে, কেন, বাজিকর, নেশা লেগে গেল নাকি? বাজিকরের চাষের নেশা!

জামির দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নমনকুরির ধানের সুবাস নাকে এখনো লেগে আছে। পথচলতি মানুষের ধানের খেতে হাওয়ার দোলা দেখলে এখনো বুকে তুফান তোলে। দেখতে দেখতে হল তো বেশ কয়েক বছর, তবুও!

সে রমজানকে বলে, চাষের কাম কিছু জানা আছে, রমজান ভাই। তাই চাষের কথায় মন মোরও পোড়ে।

সে সংক্ষেপে নমনকুরির কথা বলে, নানা পীতেমের কথা বলে, যাযাবর জীবনের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা যা যা করেছে সে সব বলে, বলে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা।

রমজান বলে, তাই বল, বাজিকরের এত চাষের কামের খোঁজ ক্যান্।

ফেরার পথে কোনো নতুন উদ্যম জামিরকে পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। তার মনের ভেতরে তরমুজের চারা তখন অংকুরিত হতে শুরু করেছে। সে তাড়াতাড়ি ফিরে পরতাপের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। পরতাপই চাষবাসের ব্যাপারে তার পথপ্রদর্শক।

কিছুদূর এগিয়ে নদীতীরে একটা গাছের নিচে জামির এই নির্জন দুপুরে সোজনকে একাকী বসে থাকতে দেখে। সোজনের দুই হাঁটুর উপরে দুই হাত আড়াআড়ি রাখা। সেই দুই হাতের উপরে চিবুকের ভর রেখে সে দিগন্তজোড়া নদীর বাঁকের দিকে তাকিয়ে। এখান থেকে পদ্মার বুকের মধ্যে দেখা যায় দু'টি দিয়ারা। দ্বীপ দু'টিতে সবে মনুষ্য বসতি শুরু হয়েছে। সমস্ত চর দখলের ইতিহাসে রক্তপাতের ঘটনা থাকে। এই দু'টি দ্বীপের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। একটি দাঙ্গা তো বাজিকরেরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছে। স্থানীয় মুসলমান চাষীদের সঙ্গে হালদার জেলেদের সংঘর্ষ হয়েছে বারবার। বস্তুত দ্বীপ দু'টি জেগে ওঠার সময় থেকেই জেলেরা এদের ব্যবহার শুরু করে। অবশ্য যেহেতু জীবনের অধিকাংশ সময়ই তারা জলে কাটায়, সেজন্য দ্বীপ দু'টিকে তারা তাদের স্বাভাবিক অধিকারে ধরে নিয়েছিল এবং নদীপথে চলাচল করার সময় মাছ ধরা ও পোতাশ্রয় হিসাবে এগুলিকে তারা ব্যবহার করত।

যতদিন পর্যন্ত এই দিয়ারা দু'টি উলঙ্গ ছিল, ততদিন কোনো ঝামেলা হয় নি। এই শিশু অবস্থা খুব কমদিনের নয়। তারপর ক্রমে দিয়ারা আরো উঁচু হয় এবং সবুজের সাজপোশাক পরে মনোরম হয়। আর তখনি শুরু হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্থানীয় অবস্থাপন্ন মুসলমান চাষীরা দ্বীপ দু'টির দখল নেওয়ার জন্য আশপাশের জমিদার কাছারিতে চক্রান্ত করতে থাকে। হালদাররা হালিক কৈবর্ত হলেও, যাদেরই সামান্য সহায় সম্বল আছে, তারাই চাষের সময়ে মাঠে নামত। দ্বীপ দু'টি-

তাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকায় তারা অবসর মতো কিছু-কিছু ধান ছড়াতে এখানেও পলির প্রলেপ পড়া দ্বীপে বিনা আয়াসেই ধান হচ্ছিল ভালো।

দিয়ারা ও চর দখল কিংবা বেদখলের কৌশল একটাই। হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তি প্রদর্শন ক'রে জানান দিয়ে হয় দখল। আর বেদখলে শক্তিপ্রদর্শন হয় নির্মম ও চরম। ফলে লাশ পড়া একটা প্রায় নিয়মের ঘটনা। এতে অন্য কোনোরকম বোঝাপড়ার অবকাশ নেই।

মুসলমান জোতদাররা একটা সিকস্ত জমির ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই দিয়ারা দু'টি প্রায় দাবির আকারে উপস্থিত করে। পদ্মায় যেহেতু সিকস্ত তটের অভাব নেই, কাজেই দাবিদারেরও অভাব হয় না। সিকস্ত জমির একটা গ্রহণযোগ্য মানবিক আবেদন থাকে যার সঙ্গে আইনের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও মানুষের সমর্থন পাওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু হালদাররাও ছাড়ার পাত্র নয়। এই কুমারী দ্বীপ দু'টির মালিকানা যেন তাদের প্রকৃতিদত্ত। কাজেই বেদখলের লড়াই দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষেপে ক্ষেপে এবং বেশ তীব্র আকারেই হয়। বেশ কয়েকটি লাশ পড়ে। শেষ পর্যন্ত একটা অঘোষিত চুক্তিতে উভয়পক্ষ কিছুকাল স্থির থাকে। এই চুক্তির কারণ মুসলমান জোতদাররা হালদারদের হাত থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বীপটি ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। তারা অবশ্য আপাতত কিছুটা দম নেবার জন্যই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু হালদাররা নিজেদের স্তোক দিয়েছিল এই ভেবে যে, প্রতিপক্ষ যদি ছোট ভূখণ্ডটি নিয়ে শান্ত হয়, তো খারাপ কি? বড়টা তো রইল নিজেদের দখলে। সুতরাং একটা অস্বস্তিকর শান্তি বিরাজ করে যার আড়ালে গোপন প্রস্তুতি চলে।

দূর থেকে দ্বীপ দু'টিকে ভারি চমৎকার সবুজ দেখায়। জামির দ্বীপ দেখতে দেখতেই সোজনকে দেখে। সোজনকে দেখে তার মন বিষণ্ন হয়ে যায়। দ্বীপ এবং সোজন, এই দুই বিষয়ই তাকে এক নিমেষে নমনকুরিতে নিয়ে যায়। দ্বীপ দু'টির ফসলের প্রাচুর্য তার মনে নমনকুরির স্বল্পস্থায়ী কৃষকজীবনের মধুর স্মৃতিকে আলোড়ন করে, আর সোজন তাকে এক স্বার্থপর বেদনায় নিষিক্ত করে। সে সোজনের উপর নিষেধ আরোপ করেছে, অথচ রাধার ব্যাপারে নিজেকে শাসন করতে পারে নি।

সোজনের পিছনে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে, সোজন টের পায় না। একটু ইতস্তত ক'রে সে স্নেহের কণ্ঠে বলে, সোজন—

সোজন ফিরে তাকায় না।

জামির পিছন থেকে তার মাথায় হাত রাখে। সোজন মুখ ঘোরায়, তার চোখের বেদনার সঙ্গে বিরক্তি মিশ্রিত হয়। সে কিছু বলে না। জামিরের চোখে বিষণ্ন স্নেহ। সোজন আমল দেয় না। সে হঠাৎ উঠে নদীর ঢালের দিকে নেমে যায়, পিছন ফিরে তাকায় না।

জামির অপমান বোধ করে না, দুঃখ পায়। আহা, ছেলেটাকে দিওয়ানা করে দিলাম, সে ভাবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সোজনের চলে যাওয়া দেখে। সূর্য হেলে পড়েছে, বালির উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলে সোজন জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দমকা ঘূর্ণি হাওয়া 'ডানের কুটো' উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে নাচের ভঙ্গিতে। জামির আরো বেশি ক'রে চিন্তা করে, সোজন ও সমস্ত বাজিকর সন্তানদের স্থিতি দিতে হবে। স্থায়িত্ব একান্তই দরকার। আর সে জন্য পদ্মার বালিয়াড়িতে তরমুজের চাষ দিয়েই শুরু হোক না নতুন ক'রে!

ফিরে যাওয়ার আগে জামির দেখল নদীর পাড়ে বাঁধা অনেকগুলো জেলে নৌকোর একটা গলুইয়ের উপর উঠে সোজন আবার একই ভঙ্গিতে বসে পড়েছে।

মাতব্বর খগেন পণ্ডিতের দেনার দায় থেকে মুক্ত হয় না। পাখি ফেরত এলেও পণ্ডিতের বউ হতে তার ঘোরতর আপত্তি। একথা একবার তার বাপ বলতে গিয়ে মেয়ের কাছে এমন চোপা শোনে যে দ্বিতীয়বার এ প্রসঙ্গ ওঠাতে আর সাহস পায় না।

পণ্ডিত বলে, খগেন, হয় টাকা ফেরত দে, না হয়তো পাখিরে এনে দে।

কেননা পাখির টোপে খগেন আরো কিছু টাকা নিয়েছিল পণ্ডিতের কাছ থেকে। সে বলে, ভালো মুশকিল! তুমি এটু ধৈর্য ধরবা পারেন না? এ কি এক কথার কাম?

—ধৈর্য! ধৈর্য কি রে শালো? আমগাছটা কাটার সময় পর্যন্ত তুমি আমারে ধৈর্য ধরাবার চাও, না? তোমার মতলব আমি বুঝি না! আমার ধৈর্য ধরার সময় আছে রে হারামজাদা?

—তবে কি ভাবিছেন, পাখি এক্কেরে নাপাতে নাপাতে আসে তোমার গলায় মালা দিবে?

—ও রে-স-শালা! ও রে-স-শালা! তুই তো মানুষ জ্যান্ত খুন করবি! অ্যাঁ। এই না কদিন আগেই কলি সব ঠিকঠাক?

—হবে, হবে, এত ব্যস্ত হয়েন না দেখি।

কিন্তু হয় না। পাখির যা মুখচোখের ভাব, খগেন তার কাছে ভিড়তেই সাহস পায় না। তার বাপকে বললে উল্টো দু'কথা এখন শুনিয়েই দেয় নীলু। কাজেই খগেন এখন পালিয়ে বেড়াতে থাকে পণ্ডিতের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত তাকে ও অন্য সবাইকে রেহাই দিয়ে যায়। এসব ঘটনার মাস দু'য়েকের মধ্যে সে মরে। এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বয়স তো ষাটের উপর হয়েছিলই, কয়েকদিনের জ্বরে সে মরে যায়।

আমগাছটা কাটার সময় তার ছেলেদের কাছে এসে খগেন হা-হুতাশ করে, আহাহা, কি মানুষটাই ছেল! পুণ্যিমান লোক, তাই ভোগান্তি বেশি হোল না, যেমন পড়া তেমন মরা।

তারপর অন্যদের কাছে বলে, এজন্যিই বিয়া বিয়া বাই উঠিছিল, কি যে মানুষের লোভ!

পাখি অন্য সবার সঙ্গে পণ্ডিতপাবনের শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেয়ে আসে এবং এজন্য কোনো হীনমন্যতায় ভোগে না। সে বরং হেসে হেসেই সবার সঙ্গে কথা বলে। এতে

অন্যেরা, বিশেষ ক'রে পুরুষেরা তার দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। কেননা পণ্ডিতের শ্রাদ্ধে পাখির খেতে আসা ও তার এই হাসাহাসি পুরুষেরা বেহায়াপানা বলেই ধরে নেয়। আর রসিক মানুষ যদি কোনো স্ত্রীলোককে বেহায়া ধরেই নেয়, তাহলে তার বিপদের অন্ত থাকে না। তার থেকেও বড় কথা, পাখি হাত-ফেরতা স্ত্রীলোক। কোনো রমণী হাত-ফেরতা হলে লোভী মানুষ তাকে খুবই সহজলোভ্য বলে ধরে নেয়। এতে ইদানিং পাখির বড় বিপদের আশংকা হয়। তাকে অনাবশ্যক সতর্ক থাকতে হয়।

সতর্ক থাকতে হয় বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকেও। যেমন খগেন, সে অবান্তর ঘনিষ্ঠতা করতে এসে বলে, খুব যাহোক সিদিন বুড়াব ছেরাদ্দ খায়ে আসি ক,-আনডো!

খগেন দাওয়ার উপর উঠেই বসে। অযাচিতভাবে আবার বলে, বুড়ার সাথ বিয়া না বসে ভালোই করিছিস, না হলে দেখ খামোকা অকালে বিধবা হবার হোত।

পাখি তাকে একেবারেই উসকাবার সুযোগ দেয় না। দেয়ালের মতো মুখে বলে, বাবা বাড়িত্ নাই, কিছু কথা থাকলে পরে আসবা পারেন।

বেহায়া খগেন হাসে। বলে, নীলুদাদার কাছেৎ আসিছি আমি? যাছিলাম রাস্তা দিয়া, ভারি জল তেষ্টা পায়লো। এক ঘটি জল দে পাখি, খাই।

জল চাইলে আর মানুষ না করে কি ক'রে! পাখি ভিতর থেকে জল এনে দাওয়ার উপরে রাখে।

খগেন পাখির মুখের দিকে তাকিয়ে নির্লজ্জের মতো হাসে, তারপর চোখ মটকায়, বলে, খালি জলই খোয়াবি? আর কিছু খোয়াবি না?

পাখির চোখ মুহূর্তে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এই লোকটা প্রতিবন্ধক না হলে হয়ত সোজনকে ছেড়ে আসতে হতো না তাকে। আর এখন এ জানোয়ার—

সে মুখে বলে, খোয়াচ্ছি দাঁড়ান।

সে ভিতরে যায়। বেড়ার পাশে দাঁড় করানো আছে তিন নলা মাছ-মারা কোচটা। মোটা লোহার তিনটে শলাকা ত্রিভুজের আকৃতিতে লম্বা বাঁশের হাতলে আটকানো। তিনটা ফলাতেই বর্শির মতো উল্টো দিকে টানা আল্। সে কোচটা হাতে নিয়ে বাইরে আসে।

—এডা দেখিছেন?

খগেন লাফ দিয়ে দাওয়া থেকে নিচে নামে। ওরে বাপরে, এ যে একেবারে আলাদ্ সাপ, যেন এখুনি ছোবলাবে।

সে শুধু মুখে বলে, অ্যাই, অ াই, পাখি – আ রি না, সি কথা নয় – আরি –!

পাখি তার পিছনে পিছনে দাওয়া থেকে নামে ও বোঝে, এই তার মওকা। এ

সময় চেঁচাতে হয় ও গালিগালাজ করতে হয়। এবং সে তা করেও। ভর দুপুরের সময় এমন কাণ্ড। পাখির গলা শুনে মানুষজন ঘরের থেকে বের হয়, এদিক সেদিক থেকে এগিয়ে আসে।

পাখির চিৎকার আরো বাড়ে, মাতব্বর, ঝালোর মাতব্বর! বড় জলের তিয়াষ মাতব্বরের! আগো, তোমরা জল দেন মাতব্বরেক! আবার কথা কি, খালি জল খোয়াবি? দেখিছ এই ট্যাভা? নাড়ি ভুড়ি বার করি দিমো, তবে আমি এক বাপের বেটি!

খগেন পালাতে পারে না। তোতলাতে তোতলাতে সে যা বলে, তা হল, অ্যাই দেখ আরি, আমি এট্টু জল খাবার চালাম, তা দেখ—ইসব কিসব আকথা-কুকথা? অ্যাঁ? আমি–

অর্থাৎ খগেন এখন আত্মরক্ষার ভূমিকায়। ছোকরারা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে টিটকারি দেয়। খগেন সরে পড়ে। তারপরেও পাখি বেশ খানিকক্ষণ চেঁচায়।

নীলু এরপরে আসে, ভিড় দেখে, পাখির চিৎকার শোনে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে। তারপর যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে একপাশে রাখা মাটির কলসি থেকে জল ঢেলে পা ধোয়, মুখ হাত ধোয় এবং গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে ভিতরে ঢুকে যায়। এ সবে তার কিছু যায় আসে না।

কিন্তু পাখির দিন এভাবে যায় না। অন্য সবার মতোই নদীর তীরে সে সোজনকে নিঃসঙ্গ বসে থাকতে দেখত। তার বুক খাক হয়ে যেত, কিন্তু তবুও সবকিছু ভাসিয়ে দিয়ে, অস্বীকার ক'রে সোজনের কাছে যেতে পারত না। সে সব সময়ই বাজিকর বৃদ্ধদের আকুল আবেদনের কথা মনে রাখত। কেননা তারা সব ঘরপোড়া গরু এবং পাখি-সোজনের সম্পর্কের মধ্যে দেরিতে হলেও সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেয়েছিল ঠিকই।

তারপর সোজন একদিন হারিয়ে গেল। নদী পার হয়ে দশ-পনেরো জনের একটা নলুয়া বাদিয়ার দল এপারে এসেছিল। এদের মূল জীবিকাই হল পাখি ধরা ও পাখি মারা। নানারকম কৌশল তাদের পাখি মারবার। তার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র পদ্ধতি হল বাঁশের নল দিয়ে মারা।—এক গোছা বাঁশের নল থাকে প্রত্যেকের হাতে। প্রথম নলটির মাথায় থাকে একটা লোহার ছুঁচলো কাঁটা। গাছের পঁচিশ ত্রিশ হাত উঁচুতে পাখি থাকলেও এই নল দিয়ে অদ্ভুত নিপুণতায় তারা পাখি মারতে পারে। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে একটা নলের পিছনে আরেকটা নলকে জোড়া দিয়ে দীর্ঘ করে। পাখি উপরের নলটির কাছাকাছি হলে আচমকা পেটের নিচ থেকে খোঁচা মেরে পাখিকে বিদ্ধ করে। এভাবে নল দিয়ে পাখি শিকার

করে বলে তাদের নাম নলুয়া বাদিয়া। পাখির মাংস ও নানারকম পোষমানা পাখিও এরা বিক্রি করে।

নিঃসঙ্গ সোজন নলুয়াদের পাখি শিকার ও পাখি ধরার পদ্ধতিতে প্রথমে আকৃষ্ট হয়। তার সামনে একদিন নলুয়ারা কয়েকটি টিয়াপাখি ধরল অদ্ভুত কায়দায়। তীব্র আঠা মাখা একটা পাখির দাঁড় দড়ি দিয়ে গাছের ডালে প্রথমে তারা ঝুলিয়ে দেয়। তারপর সময় বুঝে একটা পোষা টিয়াকে ছেড়ে দেয়। টিয়া গিয়ে ঝাঁকে বসে, ভাব আদান প্রদান করে বনের পাখির সঙ্গে। তারপর একসময় শেষে এসে সেই আঠা লাগানো দাঁড়ে বসে। বনের পাখিরা এই নতুন সঙ্গীর চালাকি ধরতে পারে না, তারাও এসে দাঁড়ে বসে ও আঠায় পা আটকে ফেলে। নলুয়া তখন দড়িতে ঢিল দিয়ে দাঁড় নামায় ও পাখি ধরে।

সোজন তারপর তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘুঘুর ফাঁদে ঘুঘু ধরতে দেখে। এইভাবে নলুয়াদের সাথে ঘুরতে ঘুরতে সোজন একদিন তাদের সঙ্গেই কোথায় চলে যায়। জামির অনেক খোঁজ করেও তাদের হদিস করতে পারে না। শুধু জানতে পারে নদীর ওপারে মুর্শিদাবাদে কোথায় যেন গিরিয়ার প্রান্তর আছে। বর্ষার সময় সব নলুয়ারাই সেখানে আশ্রয় নেয়। গিরিয়াই তাদের নির্দিষ্ট ঠিকানা, কিন্তু বছরের এই সময় তাদের খোঁজ করা বৃথা। জামির জিল্লুর কাছে মুখ দেখাতে পারে না।

পাখি আর নদীতীরে সোজনকে দেখে না। পরে সে সব শোনে এবং এতদিনে যথার্থই নিরাশ্রয় হয়ে যায়। প্রচণ্ড হতাশা তাকে কুরে কুরে খায়। কেননা সে পুরুষ মানুষের দেহের স্বাদ পেয়েছিল, আর সে পুরুষ ছিল সোজনের মতো সুদর্শন যোয়ান। যে কারণে খগেনের মতো বয়স্ক মানুষও তাকে প্রলুব্ধ করার সাহস পায় সে কারণ এটাই। খগেন এবং খগেনের মতো অভিজ্ঞ আরো অনেকে জানত পাখির পক্ষে সতীসাধ্বী হয়ে থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সন্ধ্যার পরে তার ঘরের পিছনে শিসের ঝড় উঠত কিংবা কাশি শোনা যেত। চলতে ফিরতে একাকী বহু সময়ই মানুষ তাকে প্রকাশ্যে ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিত কিংবা সরাসরি প্রস্তাব করত খগেনের পদ্ধতিতে।

পাখি প্রথম প্রথম রাগলেও, পরে আর রাগে না এবং একসময় আবিষ্কার করে যে সে এসব উপভোগ করতে শুরু করেছে। তার অভ্যন্তরের চাহিদা ও দহন তাকে নিরুপায় এক ভবিতব্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বুঝে সে শেষ চেষ্টা করে। অর্থাৎ সে চেষ্টা করে ও প্রস্তাব ক'রে দেখে এইসব মানুষের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে ক'রে মর্যাদা দিতে রাজি আছে কিনা। কিন্তু এমন কাউকেই সে পায় না। আর তার বিয়ের ব্যাপারে তার বাপেরও কোনো মাথাব্যথা নেই।

ফলে পদ্মাপারের মালো এবং ঝালোদের পাড়ার স্ত্রীলোকদের কাছে অচিরেই সে এক রাক্ষসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ও ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে সে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার তীব্র আনন্দও পায়।

রমজানের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত তরমুজের চাষ করে জামির ও আরো দু'জন বাজিকর। কিন্তু সে বড় সহজে হয় না। প্রথম দিন রমজানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে এসেছিল পরতাপের কাছে পরামর্শ করতে। চাষের কাজে পরতাপই তো তার শিক্ষাদাতা। কিন্তু যা এতদিন লক্ষ করে নি চাষের কথায় এখন জামিরের তা নজরে আসে। হায়, পরতাপ এখন এক অতিবৃদ্ধ, রুগ্ন অথর্ব। নমনকুরির সেই কর্মী মানুষটা কোথায় হারিয়ে গেছে। জামিরের প্রস্তাবে তার চোখ এখন আর ঝিলিক দিয়ে ওঠে না। জামির দেখতে পায়, আর সব দরিদ্র বৃদ্ধের মতো পরতাপ এখন দিন গুনছে।

জামির তবুও আরো দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে, তারপর রমজানের সঙ্গে কাছারিতে গিয়ে চাষের ইজারা নেয়। কিন্তু তরমুজের চাষে এত ঝামেলা সে কি জানত? অথবা জানলে কি এ কাজে এগোত? হয়ত, এগোত। জামিরের স্বভাবই এই, একবার কোনো কাজ করবে স্থির করলে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। কিন্তু একথা তাকে ভাবতেই হয় যে, পুরো ব্যাপারটা সে আগেভাগে ভাল ক'রে বোঝে নি এবং এ কাজের বিভিন্ন দিক ঠিকভাবে ভেবে দেখে নি।

কেননা রমজানদের যাহোক রকমের ঘর গেরস্থালি ছিল। কাজেই সার, গোবর, চাষের আনুষঙ্গিক শতেক জিনিসের, যা আপাত দৃষ্টিতে খুবই নগণ্য, আয়োজন ছিল। জামিরের সেসব ছিল না। তাছাড়া তরমুজ দীর্ঘ সময়ের চাষ এই দীর্ঘ খরার সময় নদী থেকে অবিরাম জল টেনে আনা ও গাছের গোড়ায় ঢালাতে যে কি ধরনের ধৈর্য ও পরিশ্রমের দরকার, একথা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

তবুও বীজ থেকে যখন তরমুজ লতার প্রাথমিক পাতা দু'টি বের হয়, তখন জামিরের বড় উত্তেজনা হয়। সেই নবীন পাতাকে সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচানোর জন্য করতে হয় খড়ের বিছানা কলাগাছের খোলের ঢাকনা। সে যেন শিশু মানুষ করা। যতদিন না লতা বহমান হয়, ততদিন বড় তিতিক্ষা। তারপরেও কি রেহাই আছে? লতা যখন বালির উপর দিয়ে পল্লবিত হয়, ফুল-জালি আসে তখন আরম্ভ হয় রোগ আর পোকার আক্রমণ। ধসা হল লতার কুষ্ঠ, যাতে গাছের গোড়া থেকে পচতে শুরু করে। তাছাড়া আছে কাটা পোকা যা লতার যে কোনো জায়গা কেটে দু'টুকরো ক'রে দিতে পারে।

রমজানের নির্দেশে জামির লড়াই করে। পেটে খোরাক জোটে না সবদিন। তরমুজের খেতে কাজ করতে হয় বলে গঞ্জের ঘাটে কুলির কাজে যেতে পারে না। লুবিনির সামান্য রোজগারের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়।

তারপর সেইসব জালিতে ফল আসে, ফল ক্রমশ বড় হয়। নতুন জালি আসে, ভ্রমর আর মৌমাছি সারা ক্ষেতে উড়ে বেড়ায়, প্রজাপতি লতার উপর দোল খায়। তারপর ফলের রঙ সাদা থেকে হালকা সবুজ হয়, তারপরে গাঢ় সবুজ, তারপরে ক্রমে কালো। রঙের বৃহৎ আকারের তরমুজ খড়ের বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকে।

এসব দেখে রমজানের মতো জামিরের কলিজা ঠাণ্ডা হয়, খিদের পোকা আর পেটের ভেতর মোচড় মারে না, অথবা মোচড় মারলেও, আর তেমন ক'রে মালুম হয় না জামিরের।

তারপর চৈত্রের শেষে যখন তরমুজ হাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু হয় তখন তরমুজ ক্ষেতের আসল দুশমনেরা এসে হাজির হয়। এরা ধসা রোগ বা কাটা পোকার থেকেও ভয়ংকর। এদের বাগ মানানোর কোনো উপায় রমজানেরও জানা নেই।

এরা সব শহর ও আশপাশের বাবু ঘরের জোয়ান ছেলে। দূরের থেকে তাদের আসতে দেখে রমজান বলে, পতিবার ভাবি আর তরমুজের চাষে যাব না, এত উৎপাত আর সহ্য হয় না। কিন্তু মন যে মানে না। এত পরিশ্রমের ফসল, দেখ, এখন কেমন নিজের হাতে লুটেরার কাছে তুলে দিতে হয়।

জামির বলে, কেমন ?

—নিজেই দেখতে পাবা।

—উৎপাত করবে ?

—উৎপাত! না দিলে বুকে ছুরি বসাবার পারে। সুলতানপুরের আখের চাষই উঠে গেল এই উৎপাতে। একশো বিঘার ক্ষেত এরা আগুন দিয়ে জালিয়ে দিয়েছে, সে জানো ?

—পুলিসে খবর দেয় না মানুষ ?

—পুলিসে খবর দেবে? যাবার হবে না তোমারে গঞ্জের হাটে, টাউনের বাজারে ? সেথায় এরাই তোমার জীবনমরণের হকদার।

বেশি অপেক্ষা করতে হয় না। নৌকা ক'রে ছোকরারা এসে ক্ষেতের কাছে নামে। রমজান গম্ভীর হয়ে থাকে। দলের মাতব্বর ছোকরা এগিয়ে এসে বলে, চাচা, তরমুজ খাব। রমজান বলে, আলবাৎ খাবা। তবে গাছেৎ কেহ হাত দিবেন না, বাপেরা। দুটা ছিড়া দিছি, খুশি মনেৎ চলি যান।

—দুটা! আছি দশজনা, চাচা। কম ক'রে পাঁচটা তো চাইই।

—অত খাবার পারবেন না বাপেরা। এক একটার ওজন দেখিছেন পাঁচ সের, ছয় সের। নষ্ট করার সামগ্‌গিরি লয়, বাপ। ওরে আবু দুডা তরমুজ ছিড়া দে বাবুগেরে।

ছোকরারা উচ্চ হাসে। কেউ মন্তব্য করে, দুটা? অ্যাঁ? মগের মলুক!

—একজন তৎক্ষণে ক্ষেতের ভেতর থেকে একটা তরমুজ ছিঁড়ে ফেলেছে।

গাছটার দফা শেষ। মাঝামাঝি জায়গায় লতাটা ছিঁড়ে গেল। তার মানে বাকি ফলগুলোর দফা শেষ।

আবু লাফ দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, এডা কি করলেন? গাছটার সব্বোনাশ করলেন?

ছোকরা পাত্তা দেয় না। বলে, আরিব্বাপ, লাপাচ্ছে দেখো, যেন মারবে!

রমজান উঠে দাঁড়ায়। কাছে এসে বলে, আগেই আপনাগেরে নিষেধ করলাম, গাছেৎ হাত দিবেন না, শুনলেন না কথাটা?

মাতব্বর ছোকরা বলে, বেকুব, বেকুব, অতি বেকুব এই ছোকরা, বুঝলে চাচা? তা যাকগে, অঢেল হয়েছে এবার তোমার, দু'চারটা নষ্ট হলে গায়ে বাজবে না। এই, পাঁচটার বেশি তুলো না।

দলপতির নির্দেশে ছোকরারা ক্ষেতের মধ্যে ঢোকে। জামির ভাল ক'রে দেখে এদের। বিশ বাইশ বছরের বাবুঘরের ছেলে সব, কেউই শিশু নয়। আর দেখ, কি অত্যাচার।

রমজান হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠে, আরে করেন কি? করেন কি?

দলপতি ছোকরা রমজানের দুই ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে চেপে বসিয়ে দেয়। মুখে বলে, একদম কথা নয়, চাচা। ভালোমুখ ক'রে খেতে চেয়েছি, ভালোমুখ ক'রে দিয়ে দেও।

রমজান হতভম্ব হয়ে যায়। আবু, রমজানের দ্বিতীয় ছেলে, লাফ দিয়ে গিয়ে ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়ায়। বলে, খবরদার, খেতের বাইরে যান সব। তার হাতে একটা হেঁসো।

জামির দেখে, যে ক্ষেতের মধ্যে ছোকরারা ঢুকেছে সেটা তারই। সে এবার তার বিশাল দেহটি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কটিদেশের সামান্য বস্ত্রখণ্ড ছাড়া তার সারা শরীরই উলঙ্গ। সে ধীর পদক্ষেপে তার ক্ষেতের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোকরারা তাকে দেখে গাছ থেকে হাত সরিয়ে নেয়। জামির শান্ত অথচ স্থির গলায় বলে, ক্ষেতের বাইরে যান, বাবুরা।

এ কথায় কাজ হয়।

সব ক'জন গিয়ে মোতব্বরের পাশে দাঁড়ায় এবং ক্রুদ্ধ চোখে জামিরকে দেখে।

জামির নিজে ক্ষেতের বাইরে এসে বলে, রমজান ভাই ছুডা দিবার চায়েছেন, তাথে আপনাগেরে হবে?

জামিরের হাত দু'টি বড় বেশি লম্বা, আর তার উপরে মোটাসোটা শিরাগুলো ঈষৎ আন্দোলনেই সাপের মতো কিলবিল ক'রে ওঠে।

দলপতি বহু চেষ্টায় নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে। বলে, আমার পাঁচটাই চাই।

জামির হাতের তালু দু'টিকে হতাশার ভঙ্গিতে উল্টে দেয়। বলে, তবে লাচার। মেহন্নতের ফসল, বাবুরা, হারামের লয়। আর এটটা কথা, এই বুড়া মানুষটাক রপমান করে ঠিক করলেন না। আপনার বাপের বয়সী লোক।

—কি অপমান করলাম?

—ওনাক ঘাড়ে হাত দিয়ে বসালেন না আপুনি? ইটা ঠিক লয়।

—এতে অপমান হোল?

—হোল। আর এতে মানে হয়, ওই বুড়ার থিকা আপনার গায়েৎ জোর বেশি। বুড়ার থিকা যে যোয়ানের গায়েৎ জোর বেশি, ইটা দেখাতে কি পোরমানের দরকার হয়? খ্যামতা থাকে আপুনি ওই বুড়ার বেটার ঘাড়েৎ হাত দেন।

জামির ইঙ্গিতে আবুকে দেখায়।

সর্দার ছোকরা চাপা ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়ে। বলে, দরকার হলে তাও পারি।

আরেকজন এগিয়ে এসে বলে, তুমি কে চাঁদ? তোমাকে তো চিনলাম না?

—আমি এক চাষা, দেখবাই পাচ্ছেন।

কথাটা বলতে পেরে এই অস্থির সময়েও জামিরের বুকটা ভরে ওঠে। চাপা উত্তেজনার কম্প তার ভিতর থেকে যেন কেটে যেতে থাকে। সে বলে, দুডা লয়, তিনডা তরমুজ নিয়া চলি যান বাবুরা।

দলপতি পিছন ঘুরে দাঁড়ায়। জামিরের উদারতায় কান দেয় না। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলে, চাষা তুমি নও। তবে তুমি কে সে খোঁজ করব।

দলটা গিয়ে আবার নৌকায় ওঠে। জামির নৌকাটাকে চলে যেতে দেখে রমজানের পাশে এসে বসে। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে থাকে। রমজান বলে, কাজটা খারাবি হোল।

আবু বলে, ভালো কোন কামটা? খ্যাতটা নকরা-ছকরা করবা দিলে সিডা ভাল হোত?

রমজান বলে, এরা ঝামেলি পাকাবে।

জামির এতক্ষণের ঘটনা থেকে স্থির মাথায় সারসংক্ষেপ করে। শেষে বলে, রমজান ভাই, গরীবের সবেতেই ঝামেলি। ইসব ঝামেলি নিয়াই বাঁচবা হবে, লচেৎ ভিখ মেঙ্গে খাওয়া লাগে।

পাখি একটা ঘোরের মধ্যে চলছিল। কেননা তার দেহের প্রয়োজনটা ছিল বড় বেশি। যতদিন সে তা জানত না ততদিন তো কোনো অশান্তি ছিল না। কিন্তু সোজন তাকে সেই অনুপম উদ্যানে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানকার বাতাস পর্যন্ত এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ যে. একমাত্র পেটের খিদে ছাড়া অন্য যাবতীয় প্রয়োজনকে মানুষ হেলায় দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। অন্তত পাখির তাই মনে হয়েছিল। তার তখন দিনকে খুব দীর্ঘ মনে হতো, যেহেতু রাত ছাড়া অন্য কোনো আড়াল তাদের ছিল না।

তখন এক রাতে সোজন বলেছিল, এই এখন তোর আমার দুই বুকের মাঝখানে যদি একটুকরো জলন্ত কয়লা রাখা যায়, তাহলে কি হবে ?

ভারি কঠিন প্রশ্ন। পাখি কোনো কথা বলে নি এবং তা শুধু চুপ ক'রে থাকবে বলে নয়, উত্তরটা নিয়ে সে যথার্থই সমস্যায় পড়েছিল বলে।

সে তো মাত্র কয়েকদিনের স্মৃতি। তারপর যতদিন সোজন নদীর পাড়ে একা বসে থাকত ততদিন পাখি সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের জ্বালা টের পেয়েছে বুকের উপরে, ভেতরে। তারপর সোজন হারিয়ে যাওয়ার পর ক্রমে টের পেয়েছে তার শরীর এবং মন এখন আর কিছুই চায় না, শুধু একটি সমর্থ পুরুষের শরীর। সে পুরুষ সোজন হোক. আর যেই হোক, এখন আর তার কিছু যায় আসে না।

ফলে প্রথমে ঝালোপাড়ায় এবং পরে ঝালোপাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে মালো-পাড়ায় পাখি অশান্তি ছড়ায়, আর তার পরিণতি হয় মর্মান্তিক।

দুই সন্তানের বাপ নলিন পাখির মোহ এড়াতে পারে না। তবে কে কাকে আগে প্রলুব্ধ করেছে বলা কঠিন। নলিনের চেহারা চিকন কালো, সমর্থ শরীর। বস্তুত আজ থেকে পাঁচ-ছ' বছর আগে এই চেহারার দৌলতেই সে যোগেন সাঁইদারের মেয়ে ধার্যবালাকে বিয়ে করতে পেরেছিল। না হলে তার যা অবস্থা তাতে সাঁইদারের মেয়ে ধাযর তাকে বিয়ে করার কোনো কারণ নেই।

নলিন যেহেতু অভিজ্ঞ লোক তাই পাখির সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টা বেশ কিছুদিন গোপন রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু এবারে সে বড় বেশি মজে, কেননা নষ্ট প্রেমে রস বেশি গেঁজিয়ে ওঠে, নেশা বড় বেশি জমে।

ধার্য যখন এসব টের পায় তখন ভারি হৈ-চৈ করে সে. অশান্তি করে। নিয়মমতো নলিন ক্ষমা চায়, প্রতিজ্ঞা করে। সে অবশ্যই ভুলতে পারে না যে ধার্যের বাপ যোগেন সাঁইদারের কৃপাতেই আজ সে দু-দুখানা নৌকার মালিক।

কিন্তু এসব প্রতিজ্ঞা থাকে না। নলিন আরো গোপনতা ও অধিকতর চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আবার ধার্যর কাছে ধরা পড়ে। নলিনকে ছেড়ে সে এবার পাখিকে নিয়ে পড়ে। পাখি অবশ্যই এ পাড়ায় আসে না, কিন্তু ধার্য ও পাড়ায় গিয়ে যদি কখনো পথচলতি পাখিকে দেখতে পায় তাহলে তুমুল গালিগালাজ করে।

এসব ব্যাপারে পাখি আর আজকাল কথা বাড়ায় না। বলে, নিজের মানুষকে ঠিক রাখতে পার না, আমায় বলে কি লাভ! সে অন্য দিকে সরে যায়।

তারপর এই নিত্য অশান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ধার্য নিজেই বুদ্ধি বার করে। প্রবল প্রতিহিংসার বিষ তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিচ্ছে। নলিন এখন অন্য রাস্তা ধরেছে। সে পরিষ্কার বলছে, বেশি ঝামেলা করবি তো একেবারে ঘরে এনে তুলব। যেমন আছিস তেমন থাক।

তা সত্বেও ধার্য ঝামেলা করে এবং প্রতিফলস্বরূপ নলিনের কাছে একদিন প্রচণ্ড মার খায়। মার খাওয়া ধার্যর এই প্রথম। এ ব্যাপারে তার বড় অহংকার ছিল, এখন সে অহংকার ভাঙে। সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

তারপর একসময় সে ভাবে যে, সে যোগেন সাঁইদারের মতো ক্ষমতাশালী মানুষের মেয়ে, কাজেই এভাবে এসব মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঝালো এবং মালোপাড়ার মাঝামাঝি একটা ছাড়া জায়গায় একটা মজা দীঘি আছে। দীঘি একসময় বড় ছিল। এখন চারদিকে মজা পচা পাঁক, মাঝখানে ছোট পুকুরের আকারে খানিকটা জলা জায়গা। জায়গাটা নির্জন ও আগাছায় পূর্ণ। দুই পাড়ার স্ত্রীলোকেদেরই এই জায়গাটা আড়ালে যাওয়ার জন্য দরকার হয়, সে কারণে পুরুষরা এদিকে বড একটা আসে না। জায়গাটা যেহেতু ভীতিজনক, কাজেই কেউই এখানে একা আসে না। আর প্রত্যেকেরই এই আড়ালে আসার ব্যাপারে একটা নিজস্ব দল আছে। দল যে শুধু এ কাজের জন্য তা নয়, ঘনিষ্ঠতা, গল্পগুজব, প্রাণের কথা বলা, সবই এই আড়ালে আসার আকর্ষণ বাড়ায়।

পাখি শুধু এর ব্যতিক্রম। তার কোনো সঙ্গী সাথী নেই। তার ভয়ডরও নেই। সে একাই আসে, একাই যায়। কোনো স্ত্রীলোকই তাকে পছন্দ করে না, আবার ভয়ও পায়।

ধার্য তার সঙ্গীদের সঙ্গে কি পরামর্শ করেছিল কেউ জানত না, তার সঙ্গীরাও কতটা গুরুত্ব দিয়েছিল তার প্রস্তাবে তাতেও সন্দেহ আছে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার আগে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পাখি ধার্য ও তার দুই সখীকে সামনে দেখতে পেয়েছিল।

ধার্য সঙ্গীদের কি যেন ইঙ্গিত ক'রে পাখিকে বলেছিল, এই পাখি, এদিকে শোন।

পালাবার জায়গা ছিল না, আর পালাবার কথা পাখি ভাবেও নি। সে বলে, কি বলবে বল, আমার সময় নাই।

ধার্য ঠাণ্ডা গলায় বলে, সময় তোর নাই, জানি। নাগর বইসে থাকলে সময়

আর কার থাকে ?

বলে পাকা খুনীর মতো ধার্য এগিয়ে এসে পাখির হাতখানা ধরে।

—একি হাত ধরিছ কেন ?

ধার্য যে যোগেন সাঁইদারের মেয়ে তা তার চেহারাতেই বোঝা য'য়। সে অক্লেশে কাঁধের গামছা পাখির মুখের মধ্যে ঠেসে ধরে। তার সঙ্গীদের বিশেষ সাহায্য করতে হয় না। তারা বরং ঘটনার কার্যকারিতায় হতবাকই হয়ে যায়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য পাখি নিজেও খুব একটা বাধা দেয় না। লজ্জা, ভয়ডরের মতো জীবনের উপর আসক্তিও কি তার চলে গিয়েছিল।

ধার্য তাকে টেনে নিয়ে পাঁকের মধ্যে নেমে পড়ে। পাখি যেন সেই ছাগশিশু যার কান কামড়ে শেয়াল জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়। সে ছটফট করে ঠিকই, কিন্তু তাকে ঠিক বাধা দেওয়া বলা যায় না। ধার্য তাকে পাঁকের মধ্যে চেপে ধরে, প্রথমে হাত দিয়ে, তার পরে পা দিয়ে। পা দিয়ে চেপে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফায়। তারপর পায়ের নিচে কম্পন কমে গেলে সে পাড়ের দিকে তাকায়, সেখানে তার সঙ্গীরা ছিল না।

পাঁচখানা নৌকা নদীর উপর দিয়ে খুব ধীরে এগোয়। তরমুজে ভর্তি নৌকা খুব ভারি, নৌকার কানা পর্যন্ত জল উঠে এসেছে। পাঁচ নৌকায় হাজার তরমুজ। প্রতি নৌকায় দু'জন ক'রে মানুষ সামনে পিছনে। এক নৌকায় জামির আর রূপা, আরেক নৌকায় রমজান আর আবু, অন্যেরা বাকি নৌকায়। আজ শনিবারের গঞ্জের হাট। পাইকার ব্যাপারীরা আসবে। নৌকা খুব ধীরে এগোয়। রাস্তা তো বেশি নয়, দুপুরের মধ্যেই পৌঁছানো যাবে হাটে।

কয়েকটা তরমুজ নিয়ে এসে পরতাপের পায়ের কাছে রেখেছিল জামির। তরমুজ চাষের কথায় যে অথর্ব চোখে কোনো উৎসাহ আনতে পারে নি জামির, তরমুজের চেহারা দেখে সে চোখ উত্তেজনায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

পরতাপ শীর্ণ হাতে নেড়েচেড়ে ছুঁয়ে ছেনে তরমুজ দেখে। আঃ, কতদিন পরে ক্ষেতের ফসলের স্পর্শ! জামির, তোর ক্ষেতে হয়েছে এমন সোনা! আহাহা, কি চেহারা! জামির, আমি তোর ক্ষেত দেখতে যাব। নিয়ে যাবি আমাকে?

আলবৎ নিয়ে যাব, চাচা।

—কেমন ক'য়ে নিয়ে যাবি? আমি যে হাঁটতে পারি না।

—গরুর গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাব, চাচা।

—গরুর গাড়ি কোথায় পাবি, জামির? তুই কি গরুর গাড়ি করতে পেরেছিস?

—ধার ক'রে নিয়ে আসব। না পাই, কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব তোমায়।

—তাই চল। তাই নিয়ে চল। কালই যাব আমি।

পরের দিন বৃদ্ধ পরতাপকে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল জামির। বৃদ্ধ চাষীর মতো মাথায় পরতাপ একটা সাদা কাপড়ের ফালি দিয়ে পাগড়ি বেঁধেছিল, হাতে নিয়েছিল লাঠি। লাঠিতে ভর ক'রে ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল পরতাপ। বুক ভরে আলো উত্তাপ আর সুঘ্রাণ নিতে চেয়েছিল সে। তারপর রমজানের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, সুঘ্রাণ পাই না কেন, বাপ?

রমজান বলে, সব ফসলের সুঘ্রাণ থাকে না, চাচা। তরমুজের খেতে কি ধানখেতের বাস পাওয়া যাবে?

—যাবে, আলবাৎ পাওয়া যাবে। সব ফসলের সুঘ্রাণ আছে। আমার বুড়া নাক তাই লাগে না। বাঃ, ভালো ক্ষেত। মন বড় ভরে গেল, জামির। আঃ, আমার হাতে আর জোর নাই। থাকলে তোদের দেখিয়ে দিতাম।

উত্তেজনায় লাঠি ধরা হাতটা তার কাঁপে। জামির তাকে বসিয়ে দেয়। রমজান তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সুখদুঃখের কথা বলে।

সেই তরমুজ কেটে পরতাপের সামনে ধরেছিল জামির। ভালো তরমুজ, চামড়া পাতলা, আগাগোড়া টকটকে লাল। পরতাপ মাড়ি ডুবিয়ে কামড় দিয়েছিল। বলেছিল, জামির রে, এ তরমুজ ক'দিন রেখে দিলে এর মধ্যে দানা হবে নির্ঘাৎ, মিশ্রির মতো দানা হবে।

সেই তরমুজ নিয়ে জামির এখন রমজানের সঙ্গে হাটের পাইকারের কাছে যায়।

হাটের কাছে নৌকা বেঁধে রমজান নিচে নেমে পাইকারের সঙ্গে কথা বলতে যায়। জামিরকে বলে যায়, নজড কড়া রাখেক, বাজিকরের পো। এ বড় ছ্যাচোর জায়গা।

ঘাট ভর্তি নৌকা, নানান জিনিসপত্র ফলমূলে ভর্তি। দক্ষিণ থেকে বড় বড় ঘাসি নৌকায় নারকেলের স্তূপ। এদিকে নারকেল বিশেষ হয় না। ভালো দাম পায় ব্যাপারিরা। জামির বড় উত্তেজিত আজ। কতদিন পরে আবার মাঠের ফসল সওদা নিয়ে হাটে এসেছে। আহঃ, ভিখ-মাঙা থু-করা কামে হয়ত আর যেতে হবে না। কম করেও চার পাঁচ হাজার তরমুজ সে ফলিয়েছে। এর জন্য তাকে রক্ত জল করা পরিশ্রম করতে হয়েছে, রমজানের মধ্যস্থতায় মহাজন করেছে, আর এখন সেই ফসল নিয়ে হাটে। আজকের হাটে হাওয়া বুঝে পরের হাটে বেশি মাল আনার ব্যবস্থা করতে হবে। পনেরো দিন বাদে রঘুনাথ ঠাকুরের মেলায় সব বাজিকরদের পাঠাতে হবে তরমুজ দিয়ে। সে মেলার আকর্ষণই একমাত্র তরমুজ। লোকে বলেও তরমুজের মেলা। হাজার হাজার তরমুজ সেখানে খুচরো বিক্রি হয়। পড়তাও ভালো থাকে। জামির এসব চিন্তায় বিভোর থাকে।

হঠাৎ একসময় মানুষের চিৎকারে তার চমক ভাঙে। একখানা নৌকা বে-আক্কেলের মতো এসে তরমুজের নৌকার উপর পড়ছে। সামাল সামাল করতে করতে আবুর তরমুজ ভর্তি নৌকা ডুবে গেল। সময় থাকতে লাফ দিয়ে আবু অন্য নৌকায় উঠে গিয়েছিল। জামির কিছু বুঝবার আগেই আগন্তুক নৌকার পনেরো বিশজন আরোহী তরমুজের ভারভর্তি নৌকাগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনখানা নৌকা ডুবে যেতে জামির বৈঠা নিয়ে ভাড়াটে নৌকাগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবু ও অন্যরাও বৈঠা লগি ইত্যাদি তুলে নিয়েছিল। আশপাশের নৌকাগুলো থেকে হৈ হল্লা হচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে থাকে। জামিরের বৈঠা একজনের পিঠে পড়ে দু-টুকরো হয়ে গেল। সে তখন চোখের সামনে শুধু আগুনের ফুলকি দেখতে পায় এবং নিমেষে গলুয়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে একখানা বল্লম টেনে বার করে। তরমুজ ক্ষেত পাহারা দেওয়ার জন্য এই বল্লম সে নিজের হাতে বানিয়ে নিয়েছিল।

বল্লম তুলে একটা নৌকার উপরে সে আবুকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে

দেখে। আবুর রক্ত দেখে জামির উন্মাদ হয়ে যায়। সে তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আক্রমণকারী নৌকার উপরে লাফিয়ে পড়ে। নৌকা ভীষণ দোল খায়। দু'তিনজন বল্লমে বিদ্ধ হয়। জামিরের হাতের উপর একটা হেঁসোর কোপ লাগে। সে আবার নিজের নৌকায় ফিরে আসে। আক্রমণকারী নৌকাটা পিছোতে শুরু করে। তাদের একজন একটা তরমুজের নৌকায় ছিল। নিজেদের নৌকা দূরে সরে যাচ্ছে দেখে সে ঝাঁপ দিতে গিয়েও দূরত্ব আন্দাজ ক'রে সাহস করল না। তারপর নিজের বিপদ বুঝে জলে ঝাঁপ দেওয়ার উপক্রম করতেই পিছন থেকে জামির তাকে আমূল বিদ্ধ করে এবং প্রবল আক্রোশে বল্লমে গাঁথা অবস্থায় জলের ভিতরে চেপে ধরে। প্রবল জিঘাংসায় জলের নিচে বল্লম দিয়ে চেপে ধরা মানুষটার অন্তিম আলোড়ন সে উপভোগ করে এবং এক সময় টের পায় মানুষটা আর নড়ছে না। সে চারদিক তাকিয়ে প্রচুর মানুষ দেখে যারা হতবাক হয়ে তার দানবীয় কীর্তি দেখছিল। সে বল্লমসহ মানুষটাকে ছেড়ে দেয়, তারপরে দু' হাতে মুখ ঢেকে নৌকার উপর বসে পড়ে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে স্বপ্নের মতো ঘুম আসে এবং সে সেই নৌকোর গলুয়েই উপর লুটিয়ে পড়ে।

লুবিনি ও অন্য বাজিকরেরা প্রথমে শুনেছিল জামির খুন হয়েছে। খবর পাবার পর তারা অনেকেই সেই গঞ্জের হাটে ছুটে এসেছিল। স্বামীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুসংবাদ শুনে কোনো রমণী যেভাবে ছুটে আসে, লুবিনিও সেভাবেই এসেছিল। আলুথালু বেশ, চুল উড়ছে হাওয়ায়, উদভ্রান্ত দৃষ্টি, লুবিনি ছুটছে। কোন দিকে যাচ্ছে, কোন দিকে যেতে হবে সে জানত না।

সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে তারা অনেক কষ্টে রূপা এবং রমজানকে খুঁজে পায়। রমজান ও রূপা কিছু মানুষের জটলার মধ্যে বোবার মতো বসেছিল।

তার আগেই অবশ্য পুলিস এসেছিল। তারা তিনজন আহত আক্রমণকারী, অজ্ঞান জামির ও আবুকে নিয়ে গিয়েছিল।

রমজানের পরিচিত মানুষেরা তাকে নানারকম পরামর্শ দিচ্ছিল, কিন্তু সেসব কথা রমজানের কানে যাচ্ছে না। সে হতভম্বের মতো সবার দিকে, সবার মুখের দিকে, চোখের দিকে তাকাচ্ছে, মাথা নাড়ছে। কিন্তু কোনো কথাই যে তাব মগজে ঢুকছে না, সেকথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

বিষয়টা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। এ হল সেই বাবু ঘরের উচ্ছৃঙ্খল ছোকরাদের কাজ। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে সব। পয়সা দিয়ে লোক ভাড়া ক'রে শিক্ষা দিতে চেয়েছে রমজান আর জামিরকে, নিজেরা আড়ালে থেকে মজা দেখেছে। কিন্তু হয়ত এতটা প্রতিরোধ আশা করতে পারে নি। পাঁচখানা তরমুজের নৌকা ডুবানো আর কি এমন কঠিন কাজ? কিন্তু কাজটা কঠিন হয়ে গেল। আশাতিরিক্ত ঝামেলা হয়ে গেল। জামিরের মতো শান্ত এবং সবার কাছেই পোষ মানতে রাজি এক দৈত্য হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়কে এভাবে নষ্ট করা মেনে নিতে পারল না।

পরদিন নদীর পার থেকে বাজিকর বসতি উঠে এল শহরের আরো কাছে, পুলিস লাইনের মাঠের একপাশে। বৃদ্ধ বালি আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। তারা এই প্রথম কিছু দাবির কথা বলল। এই প্রথম। পুলিস তাদের এখান থেকে অন্য কোথাও সরে যেতে বলেছিল। বালি বলেছিল, আমরা আমাদের উপর আক্রমণ আশংকা করছি। তাই আমরা কিছুদিন এখানে থাকতে চাই, হুজুরের কাছাকাছি। সময় সুযোগ মতো অন্য কোথাও চলে যাব। আর হুজুরের কাছে আমাদের দলপতির বৃত্তান্তটাও জানতে চাই।

সাহেব জানিয়েছে, জামির খুনের আসামী, তার বিচার হবে। বিচারে হাকিম যা শাস্তি দেয় তা মানতে হবে।

সাহেব তাদের কিছুদিনের জন্য পুলিস লাইনের কাছে থাকবার অনুমতি দিয়েছিল।

জামির শিরদাঁড়ার উপরে কোথাও চোট খেয়েছিল, ফলে সেই যে সে নৌকার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল সে ঘুম তার ভাঙল বেশ কয়েকদিন পর। এই দিনগুলো সে থানার হাজতে মৃতের মতো শুয়ে ছিল। প্রতিদিন একবার ক'রে পুলিসের ডাক্তার তাকে দেখে যেত। এর মধ্যে দুদিন লুবিনি এবং অন্য দু-একজন বাজিকরের অনুমতি মিলেছিল তাকে দেখবার। তারা কেউ জামিরের জীবনের আশা করে নি।

যখন জামিরের জ্ঞান ফিরল তখনো তার মস্তিষ্কের নির্বোধ ভাব কাটল না। সে যদিও শান্ত ছিল, কিন্তু সে ছিল বাহ্য ও দৃশ্যমান জগতের সম্পূর্ণ বাইরে। তার বাক্‌শক্তিও ছিল না। এই সময় থানায় তার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত হয় এবং লুবিনিকে তার সঙ্গে থেকে তার দেখাশোনা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

এর এক সপ্তাহ বাদে জামির একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লুবিনিকে দেখে হাসে। লুবিনি তার চোখে পরিচিতির লক্ষণ দেখে। তারপর জামির কথা বলে এবং একদিনের মধ্যে পূর্ণ স্বাভাবিকতার জগতে ফিরে আসে। এই ঘটনায় লুবিনির এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। জামির স্বাভাবিক হওয়াতে তার অপরিসীম আনন্দ হয়, আবার জামিরকে ছেড়ে চলে যেতে হয় বলে নিদারুণ দুঃখও হয়।

—জানো রে, শারিবা, তোর নানা ক'লো, ই মুই কোথায়, আমি ভয়েৎ তার মুখ চাপি ধরনো। যাঃ সব্বোনাশ, মরা মানুষ জিন্দা হয়, বোবা মানুষ কখনো কথা কয়। ওঃ, সি কি হামার সুখ, সি কি যে দুঃখ!

লুবিনি তারপরে রমজান মিয়ার কাছে গিয়েছিল, এখন কি হবে? এ কথার উত্তর রমজান কি দেবে? আবুও যে হাজতে।

তারপর ধীরে ধীরে শক্ত হয় রমজান। বাকি তরমুজ পাইকার ডেকে মাঠ থেকেই বিক্রি ক'রে দেয়। কিছু টাকা পায় লুবিনি। রমজান বলে, মোকদ্দমা চালাতে হবে। পয়সা আবোলতাবোল খরচ করা যাবে না।

কিন্তু মোকদ্দমা যে চালাবে মুরুব্বি কোথায়? তাও পাওয়া যায়। রমজানের এক ভায়রা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে। অভিজ্ঞ বুঝদার মানুষ। বেশ কিছুদিন ধরে মামলা চলে। সেসব আইন-কানুনের কূট-কুচাল কি লুবিনি বোঝে যে শারিবাকে বলবে? তবে বাবুরা জামির, আবু, ইত্যাদির বিরুদ্ধে নামী উকিল দিয়েছিল। সাক্ষী সাবুদ হাজার হেনস্থায় দিন মাস গড়িয়ে বছর ঘুরে গেল। বিচারে আবুর তিন বছর আর জামিরের সাত বছর জেল হল।

লুবিনির বুক ভাঙল। বাজিকরের মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই নানা খেলা, ভানমতি, বুজরুকি শিখতে হয়। কিন্তু লুবিনি অল্পবয়সেই জামির বাজিকরের বউ হয়—সেই জামির, যার নমনকুরিতে ফসলের জমি ছিল। কাজেই বাঁশবাজি, দড়ি-বাজি, লুবিনির অত গরজ ক'রে শেখার দরকার হয় নি। নমনকুরি ছাড়ার পর সে অভাব সে টের পায়। জামির এসব ব্যাপারে তাকে কখনো কিছু বলত না। কিন্তু তখন এসব নতুন ক'রে ঝালিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, কেননা পেট তো মানে না। আর বাজিকরের অন্য কোন বিদ্যাই বা জানা আছে! কাজেই লুবিনিও অন্যদের মতো 'ভিখমাঙা' শুরু করেছিল, অন্যদের মতেই এসবে চৌকশ হয়ে উঠেছিল।

আর এখন, যখন জামির বলল, বেঁচে থাকিস, আমি ফিরে আসব—তখন বেঁচে থাকার জন্যই লুবিনি অন্যদের সঙ্গে দেশদেশান্তর করত ভিখ-মাঙার কাজ নিয়ে।

শেষবার জেলখানায় দেখা করতে আসার সময় রমজান সঙ্গে ছিল। জামিরকে সে বলেছিল, দেখেক, বাজিকরের পো, মোর ছাবালডা চোর ডাকাইত না হই যায়। তোমার উপর ভরসা, জেলের মধ্যে কত কিসিমের লোক থাকে।

জামির তাকে অভয় দিয়েছিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে রমজানকে বলেছে, বড় ভাই, দুনিয়ায় বাজিকরের বন্ধু মেলা ভার। আমার মানুষগুলোকে একটু নজর

রাখেক। আর—সে লুবিনিকে ও রূপাকে দেখিয়েছিল। জামিরের চোখ ছলছল করছিল, লুবিনি কাঁদছিল।

রমজান তাকে কথা দিয়েছিল। কিন্তু সবাই জানত এসব কথার কতটুকু মূল্য। রমজানের কি ক্ষমতা যে এতগুলো মানুষকে সে দেখে? তবুও জামির যেন আশ্বস্ত হয়েছিল।

সাত বছর নয়, এক বছর মাপ পেয়ে জামির ছ' বছর পরে মুক্তি পায়। ছ'বছর পরে যখন সে বেরিয়ে আসে তখন জামির একজন বৃদ্ধ। তার চেহারার বিশাল কাঠামোটুকুই শুধু অবশিষ্ট আছে—হাড়ের কাঠামো, আর কিছু নেই। তারপর আরো বিশ বছর সে বেঁচে থাকে বাজিকরদের দুর্গতির সমস্ত দায়বহন করবার জন্য। শেষপর্যন্ত জীবন তাকে নতুন কিংবা তার আকাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তুই দিতে পারে নি।

যখন সে জেলে ছিল বাজিকরেরা রাজশাহী শহরকে মূল বিন্দু স্থির ক'রে কাছের ও দূরের জনপদে ঘুরে বেড়াত তাদের আদিম ব্যবসাকে কেন্দ্র ক'রে। লুবিনির কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু অন্য বাজিকরেরাও বছরে অন্তত দু-তিন মাসের জন্য রাজশাহী শহরে বাস করত। কারণ, জামিরকে ছেড়ে তারা চিরকালের জন্য দূরে যাওয়ার কথা চিন্তা করত না। যে কারণে রহুর সঙ্গে তার জনগোষ্ঠী জলে ঝাঁপিয়েছিল, সেই কারণ বা সংস্কার তাদের রক্তে এখনো ছিল। তাই জামিরের মুক্তির জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। এই অপেক্ষার সময়ে অনেকে মারা যায়—বয়স্ক ও তরুণদের মধ্যে। যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগ তাদের মধ্যে লেগেই ছিল।

জামিরের জন্য অপেক্ষা তাদের ছিল ঐকান্তিক, কিন্তু জামিরের নির্দেশিত পথে চলবার এবং চালাবার মতো শক্তিমান ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে আর কেউ ছিল না। একমাত্র জীবিত বৃদ্ধ বালি, কেবল দুঃখ করত।

ইতিমধ্যে রূপা বয়স্ক যুবক হয়েছিল। নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই কন্যা বাছাই ক'রে লুবিনী তার বিয়ে দিয়েছিল। রূপার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে লুবিনিকে খুবই ভাবতে হয়। প্রথমে সে ঠিক করেছিল যে জামির ঘুরে এলে তবেই রূপার বিয়ে দেবে। কিন্তু রূপা ছিল জামিরের একেবারে বিপরীত না হলেও অনেকাংশেই অন্যরকম। রূপা উচ্ছল ও কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল। তার চমৎকার আকর্ষণীয় চেহারা গোষ্ঠীর মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করছিল, কেননা খুব কম স্ত্রীলোকই তার আকর্ষণ এড়াতে পারত। এ কারণে লুবিনি জামির ফিরে আসার আগেই তার বিয়ে দিয়ে দেয়। বালিও সেরকম পরামর্শই দিয়েছিল। বাজিকরেরা সবাই একমত হয়ে শা-জাদী নামে এক বালিকার সঙ্গে রূপার বিয়ে দেয়।

রূপা ছিল পাকা খেলোয়াড়। প্রচলিত খেলাগুলো ছাড়াও সে শিখে নিত যেখানে যা নতুন দেখত। তাছাড়া, তার ছিল অসাধারণ বাক্‌পটুতা। খেলা দেখাবার সময় অনর্গল কথা বলে মানুষের মনোযোগ ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারত সে। সে ভালো ঢোলক বাজাত, চমৎকার গান গাইত। সে ছিল যথার্থ ই এক বাজিকর।

জামিরের হাজতবাসের সময় দলের সর্দারি পেয়েছিল পিয়ার বকসের ছেলে

ইয়াসিন। সর্দারির কাজে ইয়াসিন যে খুব নির্ভরযোগ্য মানুষ ছিল এমন নয়, তবুও তার থেকে উপযুক্ত লোক তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। খুব শক্তসমর্থ না হলেও খুব বিবেচক হিসাবে ইয়াসিনের খ্যাতি ছিল।

জামির ফিরে আসার পর ইয়াসিন তার কাছে গিয়ে বলেছিল, ইবার লেন চাচা, আপন কম্ম নিজে করেন, হামাক স্বোয়াস্তি দেন।

জামির বলে, কি কামডা কল্লে এতদিন, বসত করার মতো জায়গা খুঁজিছ? ইয়াসিন চুপ ক'রে থাকে।

— খোঁজ নাই না পাও নাই?

— এলা কি হামার কাম? বেবাক মানষে দূর দূর ছাই ছাই করে—

— খোঁজই নাই, তো পাবা কি।

ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে জামির ইয়াসিনকে ডেকে পাঠায়। বলে, সব মানুষ হেথায় থাকবে। খালি আমি তুমি যামো। আশপাশ কাছে দূরে খুঁজবা হবে বাজিকরের বসত করার মতো জায়গা এ দুনিয়ায় আছে কি না। আগে বসত, তার পরে অন্য কাম।

এর দিন দু'য়েক পরে তারা দলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এক মাস পরে তারা ঘুরে এসে জানায়, জায়গা একটা পাওয়া গেছে বাজিকরদের স্থায়ী আস্তানা গাড়ার। কাজেরও কিছু অগ্রিম কথাবার্তা হয়েছে সেখানে। কোথায় সেই স্থান যা বাজিকরকে ধারণ করতে পারে? এখান থেকে উত্তরে পাচবিবি নামে একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে, তারই কাছে পাতালু নদীর তীরে বাজিকরদের নতুন বসত পত্তনি হবে। সেখানে হিন্দু ও মুসলমান দুই জমিদারেরই কুঠিবাড়ি আছে। সেই কুঠিবাড়িতে হাতি আছে। তারা দু'দলই জামিরকে কথা দিয়েছে।

অথচ বেশ কয়েক বছর মহিমবাবু ও লালমিয়াঁর সেবা করার পরও প্রশ্ন উঠেছিল, তুমরা হিঁদু না মোছলমান ? এর আগে দীর্ঘ একশো বছরের মধ্যে এ প্রশ্ন কারোই উঠাবার দরকার হয় নি। অথচ পাঁচবিবির মহিমবাবু কিংবা লালমিয়াঁর কাছে তখন এ প্রশ্ন জরুরি ঠেকেছিল।

তখনো দুই কুঠির খাস জমিগুলো সম্পূর্ণ উদ্ধার হয় নি। তখনো গাছ ফেলা চলছে। কোথায় নাকি যুদ্ধ হচ্ছিল, তাতে অনেক গাছের দরকার, বাঁশের দরকার। তাই ভিখমাঙা বাজিকরেরা গাছ ফেলছিল আর জমি খালাস করছিল। এসব তারা করবে পাঁচবিবিতে বসত করার এক পুরুষ পরে। এই এক পুরুষ তারা জামির বাজিকরের নেতৃত্বে পাঁচবিবিতে খুঁটো গেড়ে বসে থাকবে। তারা আর ভিখ মাঙবে না, এরকম একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জামিরের নেতৃত্বে আবালবৃদ্ধ বাজিকরেরা নেয়। খোদাবকসো বাজিকর, বালি বাজিকর ও শিউ বাজিকর—এই তিন অতিবৃদ্ধ বাজিকর ঘনঘন মাথা নেড়ে জামিরের কথায় সায় দিয়েছিল। নাঃ, আর 'গেহু', আর 'শোকা' হাত পেতে ভিখমাঙা নয়! আর বান্দর, ভাল্লু, রহু চণ্ডালের হাড় নাড়া-চাড়া নয়!

দনুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষকে তার নানি এসব বৃত্তান্ত শোনায় আর সেই বালক বয়সের থেকে অনেক বেশি একাগ্রতায় নিবিষ্ট হয়ে শোনে সেই সব কথা।

—রহু চণ্ডালের হাড় জানু রে শারিবা ?

—না!

—ঘোর আমাবস্যায় এক বিটিছোলের একছেল্যা হবে। সি হোবে একোই মায়ের একোই বেটা। সি ব্যাটাক্ মরবা হবে আমাবস্যার দিনোৎ আর লাশ ভাসান হবে আমাবস্যার আতোৎ। তবি সি লাশ গহীন আতৎ নদী থিকা উঠাবা হবে। তাবাদে তার কণ্ঠার হাড়ে বানাবা হবে ভানুমতির হাড়। সি হল রহু চণ্ডালের হাড়। সি হাড় হাতেৎ রাখ্যে তুমু হয়কে লয়, লয়কে হয় করতে পারবা!

—সাচা ?

—সাচা লয় ?

—তুই দেখিছিস, নানি ?

—হাঁ, দেখিছি। বালি বুড়ার কাছেৎ ছিল সি রহু চণ্ডালের হাড়। আর কেরো লয়। আর সোব্বার হাতেৎ থাকত মেকি হাড়। তাথেই ত্যাল সিন্দুর মাখায়া সবে ভেলকি লাচাত মিছাই। কেন্তু বালি বুড়ার ছিল আসল হাড়।

—তো সি হাড়টা কি হল ?

– ও, সিটা তোক্ বলা হয় নাই? তবি শোন্, তোর নানাতো এলা সব ঠিক করল যি আর বাজি লয়, আর ভিখমাঙ্গা লয়। ইবার আর দশজনার মতো খাইটে খাবার হোবে। তো সব ঠিকঠাক কর্‌য়ে বেবাক হুই পাতালু নদীৎ বিসজ্জন হল।

– তা বাদে?

– আঃ হা, তাবাদেই তো আসল মজা।

—কেম্‌কা?

– বাজিকর বুললে হামি কাম কর্‌য়ে খামো, ভিখ মাঙ্গমো না। কাম করবা? তা যাও, পাটের খ্যাৎ নিড়াও, জনে জনে দু দু পয়সা আর এক সন্‌ঝা খাওয়া। তো ভিখমাঙ্গা নেংটার দল পাটের খেতোৎ নাইমে গেল। বাস্, দু' ঘণ্টায় কাম খ্যাষ। কামও খ্যাষ, পাটের খ্যাতও খ্যাষ!

– ক্যান?

অনেক দিনের চাপা পড়া স্মৃতিতে ঝলক ওঠে। নানি হাসে। অথচ চোখের কোণে জল চিকচিক করে। পাট-নিড়ানি কাম ভিখমাঙ্গা বাজিকরের কাম লয়, শারিবা। পাটের চারা আধা উঠি গেল নিড়ানির ঘায়ে, আর আধা পড়ল পায়ের তলায় চাপা।

সেই দোষে লালমিঞা কোড়া মারল পঁচিশ ঘা।

জামির বলেছিল, হামাক কোড়া মারেন, ছাহেব। বেবাক দোষ হামার।

তখন যুদ্ধের বাজার, পাটের দাম মেলা। পুরো মাঠের পাট নষ্ট। রাগ হয় বৈকি মানুষের!

লুবিনি পিঠের ঘায়ে বুনো লতাপাতার মলম লাগায়। তমো কি রোখ রে মানুষটার শারিবা, বলে ভিখ-মাঙ্গা কাম আর করমো না। চাষীমজুরের কাম শিখবা হোবে। বলে আর হা-নিশ্বাস ফেলায়। তো সি হা-নিশ্বাস দেখি হামি। আর আর বাজিকরের থমথমা মুখ। এলা কি দেকদারি কাম! বালি বাজিকরের ছেলা লছমন বাজিকর জবর খেলোয়ার। সি বলে, হাই, সারা দুনিয়া হামার আছিল্। হামার আছিল্ লদী, পাহাড়, বালি আর মাঠ, আর এখুন দেখ হামরা বন্দি হই গেলাম। বাজিকর যদি খাটা ছাড়ি ঘর ধরে, তবিই সি আহাম্মক, লচেৎ লয়।

বালি বলবে, তা লয় রে লছমন। যি পাপে বাজিকর বাউদিয়া, সি হাজার সালের পুরানা পাপ। সি পাপ খণ্ডাবার জন্য তুমাক তো দণ্ড দিবার হবে। তো জামির সি দণ্ড দেয় তুমারদের বেবাকের হয়া।

– কি পাপ নানি, কি পাপ?

– হায়, শারিবা, সি বড় কঠিন পাপ। ওলা কথা বালি বুঢ়া জানত।

নানি সে কথাটা এড়িয়ে যেত। সে পাপের কথা জানতে শারিবার অনেক দিন লাগবে। কিন্তু জানার আগে দীর্ঘদিন সে পাপের দণ্ড স্বজনদের সঙ্গে ভোগ করবে। ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে যেগুলো সে বুঝবে সেগুলোর সত্যতা সে

অস্বীকার করতে পারবে না। যেমন, সে অপমানিত হবে চোর বলে, সে গাল খাবে লুঠেরা বলে, সে গোপনে মানুষকে বাজিকর বৃন্দাদের কাছে আসতে দেখবে গূঢ় অভিসন্ধিতে, গুনতুক আর গুপ্তবিদ্যার সাহায্যে অভিলাষ সিদ্ধ করার জন্য।

ক্রমশ অভিজ্ঞতা এবং সমাজ তাকে শেখাবে আরো অনেক কিছু। সে জানবে বাজিকরের নিজস্ব সমাজ বলতে বিশেষ কিছু নেই, বিশ্বাস নেই, ধর্ম নেই, কার্যকারণ, স্থান-কাল-পাত্র কাণ্ডজ্ঞান খুব কম। বাজিকর জানে হামবড়াই, কিন্তু মানুষের সমাজের প্রয়োজনীয় মৌলিক কাজ সে জানে না। সে আসলে ভীরু ও লোভী। তার নিয়তি দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও ক্ষয়রোগ। এই সমস্ত পৃথিবী তার, কিন্তু এমন কোনো জায়গা তার নেই যেখানে সে পা রেখে দু'দণ্ড দাঁড়াতে পারে।

—তাই বটে, তাই বটে শারিবা। তাই তোর নানা ফির মার খায়। জমিতে হাল দিতে নাইমে মহিমবাবুর অ্যাটা ভইসের পায়েৎ ফাল মারি দিল লছমন। চাষের কামের সোমায় অ্যাটা ভইস চোট খায়ে বইসে গেলে গেরস্থের রাগ হয় বৈকি!

আর জামির নিজেকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে, মার খেয়েই শিখতে হবে। হাজার বছরের কর্মহীন উদ্যোগহীন হাত, এত সহজে কাজ শিখবে? পাপের দণ্ড দিতে হবে না? আরো কত পুরুষ ধরে পাপের ভোগ ভুগতে হবে?

—জানিস শারিবা, তোর নানা চাইছিল গেরস্থ হবার। চাষি-গেরস্থ। নিজের ভইস থাকবে, হাল-লাঙল থাকেবে, ভুঁই থাকবে। ভিখমাঙ্গাকে সি বড় ঘেন্না করত। নমনকুরির সামান্য সময়ের মরীচিকা তাকে আরো লোভী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিল।

লুবিনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে এইসব কথা বলত শারিবাকে, যেন অত্যন্ত গোপন কোনো শরমের কথা বলছে, যেন কিশোরীর প্রথম গোপন কথাটি—বড় মধুর, লজ্জায়, আকাঙ্ক্ষায়, একান্ত নিজস্ব। যেন এ রকম একটা অদ্ভুত কথা শুনে সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠতে পারে। সেই ভয়, এখনো। নানির এখন আশির উপরে বয়েস, এখনো জামির এই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে থেকে, তবুও। জামির তো মারাই গেছে তিরিশ বছর হয়ে গেছে, তবু এখনো কেন শরম লাগে, ভয় ভয় লাগে লুবিনির?

শোন শারিবা, গোরখপুর আমাদের নিজেদের জায়গা নয়। আমি শুনেছি তোর নানার নানার কাছ থেকে, সে শুনেছে তার নানার কাছ থেকে। আমরা ছিলাম গোরখপুরের আরো পশ্চিমে কোন এক মরুভূমি আর বালির মুল্লুকে। আর গোরখপুরে বাজিকরের বসত বছরে একমাস কি দু'মাস, ওকে কি বসত বলে? কখনো কখনো দু'বছর তিন বছর বাদে ঘুরে আসত কোনো দল। যেমন হামারদের দল, যেমন ঘুরল নাই, ক্ষুধার হারাই গেল গোরখপুর?

তখন রমণীরা পরত ঘাঘরা আর কামিজ, পুরুষরা পড়ত মুগরু আর কুর্তি।

এখন দেখ সব মেয়ে শাড়ি পরে, পুরুষরা পরে ধুতি আর লুঙ্গি। সে সব ছেড়ে দিল—তার নিজের ভাষা, নিজের পোশাক, নিজের আচার-আচরণ, নিজের ক্রিয়া-কর্ম, সব। কেন রে শারিবা, কেন? না, তোর নানা বলত, আমি মজুর খেটে খাব আর ভিখ-মাঙ্গব না, লোক ঠকাব না। বে-ইজ্জতের কাম করব না। আমার বালবাচ্ছা হবে ইমানদার আদমি। মুখে বলত, আমি মজুব খেটে খাব, মনে ছিল, আমি গেরস্থ হব। সে শুধু লুবিনি জানত, আর জানত বালি বুড়ো।

কিন্তু সে আর হল কই, শারিবা? বাজিকর পাট ক্ষেত নিড়াতে জানে না, মার খায়। বাজিকর হাল মই দিতে জানে না, মার খায়। আচানক চুরির দায়ে ধরা পড়ে, মার খায়, জেল হয়। গ্রামে মড়ক লাগে দোষ হয় বাজিকরের। বাচ্চা-কাচ্চা চুরি গেল, হারিয়ে গেল, মারো শালা বাজিকরকে, দেও তার ঘর জ্বালিয়ে। তবু জামির বাজিকর পাঁচবিবির নদীর চড় আঁকড়ে পড়ে থাকে। পাঁচবার হাতি ঘরদোর ভাঙার পরে রোখ আর তার আগের মতো থাকে না। তখন একদিন চতু বাজিকর আর আনোয়ার বাজিকর ঝোলা ঘাড়ে নিয়ে ভিখ মাঙতে বের হয়। জামির তাদের আর না করতে পারে না। দশদিন বিশদিন ঘুরে তারা কিছু রোজগার ক'রে ফিরে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে দু'টো বাঁদরের বাচ্চা। বাঁদরের বাচ্চাকে খেলা শিখাতে হয়। তারা জামিরের কাছে ভয়ে কিংবা লজ্জায় আসে না।

জামিরই তাদের ডাকে। বলে, ঠিক আছে। বাঁচে থাকা পরথম লড়াই, তাবাদে আর সব। কাজ পালে কাজ করবা, না পালে বান্দর নাচাবা, রহু চণ্ডালের হাড় দিয়া ভেল্কি দেখাবা। কিন্তু কাজ পরথম। হামি বুড়াটা হোই গিলাম, কথাটা মনেৎ রাখ, বাপাসকল। সব কাম শিখবা হবে।

তখন আবার ঢোলকে বাড়ি পড়ে। ডুগ্‌ডুগ্, ডুগ্‌ডুগ্, লাগ্, ভেল্কি লাগ্, চোখে মুখে লাগ্, হামার ছাড়ো সবাকে লাগ্। হাই দেখো রহু চণ্ডালের হাড়ের কিসমৎ। সত্যের গুল্লি ডবল হ', মিথ্যার গুল্লি চইল্যে যা – হাঁ, এই দেখো ডবল—ডুগডুগডুগডুগ—

তেরে পাও পিছল গয়া টুট্ গইল ঘাঘরিয়া
গাঙমে ভিজ গয়া শাড়িরে—
তেরে পাও পিছল গিয়া—
পুখর ঘাটমে চিকনা মাটি—

পনেরো হাত উঁচু দিয়ে দড়িতে অবলীলায় হেঁটে যায় বাজিকর যুবতী। দড়িতে দোল খায়, হাতের পায়ের ভঙ্গি করে। নিচে ঢোলক বাজে, চটুল গান হয়।

এইভাবে বাজিকরের জীবন চলল গড়িয়ে। আর প্রতি বছরই দু'জন তিনজন ক'রে কাশি ও মুখে রক্ত ওঠা রোগে মরতে থাকে। লুবিনিও এই দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকবে এই রোগেই মরার জন্য।

জামির বাজিকরদের বাসস্থান ক'রে দিয়েছিল। সে বাসস্থান যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, যতদিন জামির বেঁচেছিল তার স্থায়িত্ব নিয়ে কারো মনেই কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু জামিরের মৃত্যু যত নিকটবর্তী হচ্ছিল, বাজিকর ততই অসহায় বোধ করছিল। সে শুধু জামিরের নেতৃত্ব হারাবার ভয়েই নয়, মানুষের জীবনে ও চতুষ্পার্শ্বে জটিলতা খুব দ্রুত বাড়ছিল যা বাজিকরের কাছেও অজানা ছিল না।

দনুর বংশধরেরা মৃত্যুর আগে রহুকে প্রত্যক্ষ করে। শেষ পর্যায়ে রহু তাদের তৃপ্তি কিংবা দুখ দেয়। পীতেম প্রসন্ন রহুকে দেখেছিল আর জামির দেখে বিষণ্ণ রহুকে, যেমনটি ঠিক দনু দেখেছিল।

লুবিনি শেষ পর্যন্ত গেরস্থ পাড়ায় ভিক্ষা করতে যেত, কখনো কখনো দূরের গ্রামেও। কখনো দু'একদিনের জন্য সে ফিরতও না। শারিবা সেই সময় বড় অসহায় বোধ করত নিজেকে। বাপ রূপা বাজিকর দিনমজুরি ক'রে সংসার চালায়। লুবিনির দেখাশুনা সে করতে পারে না। শারিবার বড় অভিমান হয় বাপের উপর। কিন্তু লুবিনি ব্যাপারটা মেনে নেয়। বলে, তুই যখন যুঁয়া হবি তখন হামাক্ খোয়াবি। উপার তো নিজেরি চলে না।

তারপর লুবিনির দৃষ্টি খুব দ্রুত ঘোলাটে হয়ে আসতে থাকে। যেন কয়েক মাসের মধ্যেই তার বয়স অনেক বেড়ে যায়। সে অথর্ব হয়ে যেতে থাকে ক্রমশ। তখনো রূপা তাকে দেখাশোনার কথা চিন্তা করতে পারে না। লুবিনির তারপর নিয়মিত জ্বর হতে থাকে

শারিবা বলে, নানি, তোর গা এংকা গরম ক্যান? জ্বর হইছে?

লুবিনি নেশাগ্রস্তের মতো উত্তর দেয়, জ্বর লয়রে, শারিবা হামরা ইয়াক 'হাতপাক' বলি। বিগা মাই বিরাগ হলে এংকা রোগ হয়। গলা থিকা 'লোই' উঠে, খাশি হয়, তবি ইয়ার নাম লোই রোগ। ইতো বাজিকরের নিয়তি।

রোগ যত বাড়তে থাকে, লুবিনি তত প্রাচীনা ও অপরিচিতা হতে থাকে শারিবার কাছে। মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙলে শারিবা নানির বিড়বিড় শুনতে পেত। নানি বলত, ঠাকুরজি, হারুয়ানে যাই। ওলা মাই, কালি মাই, বিগা মাই, হারুয়ানে যাই।

শারিবা এসব শব্দ বুঝতে পারত না। পরে সে জানতে পেরেছিল, এইসব অজ্ঞাত

দেবতা বাজিকরের রাস্তার সংগ্রহ, তার নিজস্ব কিছু নয়। লুবিনি এইসব দেবতার কাছে আত্মার শান্তি না মৃত্যু-ভয় থেকে নিষ্কৃতির জন্য প্রার্থনা করত কে জানে? জ্বর যখন খুব জাঁকিয়ে আসত, লুবিনির তখন বিকারের লক্ষণ দেখা দিত। চাটাইয়ের উপর উঠে বসে সে শারিবাকে টেনে কাছে এনে দূরে পাতালুর বাঁওরের দিকে কাঁপা কাঁপা হাত তুলে দেখাত।

—কি, নানি? কি?—

শারিবা, হুই দেখ, রহু।

জামিরকে সে সারাজীবন লড়াই করতে ও হারতে দেখেছে, যেসব স্মৃতি তাকে প্রবল হতাশায় সেইসব সময় ও এখন এই শেষ সময়ে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। তবুও সে শারিবাকে কিছু কথা বলে যা পীতেম ও জামির ভাবত ও বলত।

—শারিবা ভয় পেয়ে বলত, কি বলিস? কি বলিস, নানি?

লুবিনি তখন আধা সম্বিতে আসত। বলত, তুই খুব সুন্দর নওরা হবি, শারিবা। তোর বিয়েতে বহু দূর থেকে, সিই গোরখপুর ঠেঙে নওরি আনব। তারপর বলত, বিহা লয়, ইওয়া। হামি মরার আগে বাজিকরের বুলিগুলা শিখ্যে লে, শারিবা। হামি তো ডম, বেহুদ্দা বুড়া, আজ বাদে কাইল মরি যাব। তা'পর শ্বশুরঘরের লোকের সাথ কথা বলবার পারবি না, তখুন সি বড লাজের কথা হোবে।

তারপর জ্বরের ঘোরে আপনমনে লুবিনি যেন শারিবার বিয়ের অনুষ্ঠান সাজাত। মাঝখানে মাটির বেদিতে নওরা-নওরি বসে, চারদিকে চারটে কঞ্চি পুঁতে তাতে বিনিপাকের লাল সুতো দিয়ে ঘিরে ফেলছে লুবিনি, আর তার গলা থেকে তখন মৃদু অথচ উচ্ছল গান উঠত।

দেও আওয়েতো দেওরে ভাই
বান্ধনা তো সরিমাদে
দেও আওয়েতো দেওরে ভাই
মাকারানা সরিমাদে
দেও আওয়েতো দেওরে ভাই
বান্ধনাতো সরিমাদে
দেও আওয়েতো দেওরে ভাই
সাপানারা সরিমাদে।

এবং সে দুইহাতের আঁজলায় যৌতুক দেওয়ার ভঙ্গি করত নাচের মুদ্রায়। এই তোর ইওয়া হইছে, রে শারিবা। ইবার তোক্ আর তোর নওরিক্ হালদি মাখামু।

এ সে হালদি লাগিরে, এ তো মায়েরি
তেল মেগুরে লুড়ে, এ তো মায়েরি।

নানি তারপর উচ্ছল হাসত, হাসতে হাসতে কাশত এবং কাশতে কাশতে লোই তুলত।

৪৩

এইভাবে একদিন লোই তুলে নানি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শারিবা তার বুকে গরম সেঁক দিয়েও আর উষ্ণ করতে পারল না। বাজিকরদের একটি যুগকে শেষ ক'রে লুবিনী মরল। তারপর নতুন যুগ শুরু হল। কেননা তখন চৌধুরী সাহেব ঐ কথাটি তুলেছে, তুরা হিদু না মুছলমান, অ্যাঁ? মহিমবাবু প্রশ্ন তুলেছে, হাঁই বাপু, তোরা গরুও খাস, শুয়ারও খাস, ই কেম্‌কা জাত রে বাবা!

এসব কথা তখন ওঠার কারণ ছিল। তখন সাহেবরা যাব যাব করছে। হিন্দুস্থান পাকিস্তান হব হব করছে। সবচেয়ে বড কথা, এই তাবৎ অঞ্চল জুড়ে তেভাগা নামে চাষিদের একটা বিরাট লড়াই হয়ে গেছে। এই লড়াইয়ে চাষি মরেছে অনেক সন্দেহ নাই, কিন্তু জোতদার জমিদারও মরেছে, এটাও ঠিক। আধির উপর দখল কায়েম রাখার জন্য আধিয়াররা সংঘবদ্ধ হয়ে আছে।

এই শেষ ঘটনাটিই সবচেয়ে বড বিপত্তির কারণ। কেননা যুদ্ধের বাজারে বাঁশ কাঠের দাম চড়া ছিল। কাজেই মহিমবাবু ও চৌধুরী সাহেব লালমিয়াঁ জঙ্গল ও বাঁশবন পরিষ্কার করেছে বাজিকরদের দিয়ে। কেননা এত কম মজুরিতে অন্য কোনো মানুষ পাওয়া যেত না। জামিরের সঙ্গে একটাই মৌখিক চুক্তি ছিল, তা হল জঙ্গল খালাস হলে জমিগুলো বাজিকরদেরই আধি দিতে হবে।

মহিমবাবু কিংবা লালমিয়াঁর আপত্তি কিছু ছিল না। কারণ, তখনো তো হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয় নি। তখনো তো 'তেভাগা চাই' আওয়াজ শোনা যায় নি। তখনো তো আধিয়ারের দাবি বলে কোনো অদ্ভুত কথা কেউ কোনোদিন শোনে নি!

কাজেই দু'দুটো বছর বাজিকররা সেই নতুন জমিতে শিক্ষানবিশি করল। এতদিন চাষের কাজে তারা আংশিক সময়ের শিক্ষানবিশি করত, এখন পুরো সময়ের। যা ফসল ফলল, তা অতি সামান্য। তবু তারই অর্ধেক মালিককে দিল, অর্ধেক নিজেরা খেল। একটা নতুন আনন্দ, যা জামির বাজিকরের মৃত্যু পর্যন্ত বোধ, আর স্বপ্নই থেকে গেছে। এইভাবে তারা চাষের কাজ পুরোপুরি শিখল। জীবনের নতুন স্বাদ, সবরকম রঙের উজ্জ্বলতা তারা খুব ভয়ে ভয়ে অধিকার হিসাবে গ্রহণ করতে শিখল। যাবতীয় অনাস্বাদিত সুখের খোলা দরজার সামনে তারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এইবারে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি মিলে গেছে। গৃহস্থের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিকতার অধিকার যেন আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। যাযাবরের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে শক্ত খুঁটোর ঘর বাঁধা। তারপর জীবন বয়ে যাবে স্বাভাবিক স্রোতের মতো। অনির্দিষ্টের মধ্যে আর ঘুরতে হবে না। জমি হচ্ছে স্থিতি—

দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক। লুবিনি বলত, শারিবা, তুই বুঝবি না, বাজিকরের যুয়া রেজা রেজানিওর বিয়ে দেওয়া বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই গোষ্ঠীর মধ্যে এই ছয় পুরুষ ধরে ক্রমাগত রক্তের সম্বন্ধ হচ্ছে। এলা ঠিক কাম নয়। এতে মানুষের সাথ কুৎরিও বা ওয়াদঁরুর, কুকুর বা বাঁদরের তফাত থাকে না। হিন্দু তে মাক্ সামাজে লিচ্ছে না, মুসলমান তোমাক্ একসাথ ওঠবস করায় না। অংকা কথা তোর নানা ভাবিছিলো। কিন্তু শেষ দিশা করবা পারে নাই। তবি ভাবিছিল জমিন হল্যে থিতু হবে, থিতু হল্যে সব হবে।

সেই থিতু যখন হাতের কাছে, তখনই লালমিয়া, মহিমবাবু চরম প্রশ্নটি করে। ইয়াসিন তখন বাজিকরদের সর্দার বা মণ্ডল। লালমিয়া আকর্ণ বিস্ময় প্রকাশ করে।

– নাম তোর ইয়াসিন, আর তুমু মুছলমান লও?

– জী মালিক, হামি বাজিকর।

– জুম্মা জিয়াপৎ করো না?

– ওলা জানি না, হুজুর।

– ধম্মোকম্মো কি কর?

অভিজ্ঞ ব্যক্তিটি দলের মানুষের কাছে বেকুব হয়ে যায়, এদিক ওদিক তাকায়।

– ঠাকুর দেবতা কিছু আছে?

– ওলা মাই, কালী মাই, বিগা মাই, এলা সব আছে।

– তবি তো তুমাদের হিন্দুর সঙ্গ?

কিন্তু মহিমবাবু বলে, ক্যারে, ওলা মাই, কালী মাই তো বোঝ্নো, কিন্তু বিগা মাইটা কি বস্তু?

– অংকা ঠিক জানো না, মালিক।

– পূজা আচ্চা হয়?

– থানে সিঁদুর, ধুপ দেবা হয়, হুজুর। আর গান হয়।

—আবার গরুও খাস?

মৌনতা।

– আবার শুয়ারও খাস?

নিরবিচ্ছিন্ন মৌনতা।

– কি বেজাত রে বাবা, ভাবা পারি না?

তৃতীয় বছরে খালাসী জমি ভাদুই ধানে হেসে উঠেছে। বাজিকর তখন আর বলদকে বারাদ বলে না, ভইসকে হেলো বলে না। স্থানীয়দের মতো বলদ আর ভইসই বলে। বেশ কয়েক ঘরে বলদ ও ভইসের হাল হয়েছে। জীবন স্বচ্ছন্দ নয়, কিন্তু পায়ের নিচে চোরাবালিও নেই। নরম মাটি শক্ত হচ্ছে।

কিন্তু শক্ত মাটিতেও ধস নামে। যার ধর্ম নেই তার সঙ্গে আবার ন্যায়নীতির সম্পর্ক কি? যার সমাজ নেই তার সঙ্গে সামাজিক চুক্তিও হয় না। এসব লাল

মিয়াঁ এবং মহিমবাবু চিরকাল ভালো বোঝে। সুতরাং ভাদুই ধান কাটার আগেই ইয়াসিন ও রূপার জমি বেহাত হয়ে যায়। রূপা কিংবা ইয়াসিন কিংবা বাজিকরদের অন্য কেউ মহিমবাবু বা লালমিয়াঁকে সঠিক চিনত না।

কিন্তু শারিবা চিনত। তাকে চিনিয়েছিল আকালু। আকালু পোলিয়াদের ছেলে, সাক্ষাৎ আকাল। তিন বছর বয়স থেকে সে অনাথ। এখন তার চোদ্দ বছর বয়স। শারিবার থেকে বছর দুয়েকের ছোটই হবে। অবশ্য বয়সের হিসাব শারিবা কিংবা আকালুদের সমাজে কেউই করে না। অন্তত নিয়মমতো করে না। তাদের বয়সের হিসাব শ্রমের মাপকাঠিতে, যথা—চ্যাংড়া, যোয়ান কিংবা বুঢ়া।

লুবিনির মৃত্যুর পর আকালুই শারিবার বন্ধু হয়। আকালু সেই তিন বছর বয়স থেকে পৃথিবীর সঙ্গে একা লড়ে যাচ্ছে। সুতরাং পৃথিবীকে সে ভালোই চেনে সেই অবুঝ বয়স থেকেই তার পেশা হাপু গান। হাপু একটি দীর্ঘ ছড়া, গান ও আবৃত্তির মাঝামাঝি একটি সুরে গাওয়া হয়। অনুষঙ্গে থাকে গায়কের হাতের একটি মোটা পাঁচন লাঠি আর মুখ, নাক ও বগল ইত্যাদি নির্গত বিভিন্ন বিকৃত শিৎকার ধ্বনি। গানের সঙ্গে বা সমে লাঠি দিয়ে গায়ক তার সর্বাঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে আঘাত ক'রে শব্দ সৃষ্টি করে। যে সব জায়গায় আঘাতের শব্দ অধিক হয় সেসব জায়গাতেই লাঠি বেশি পড়ে। অভ্যাসে ক্রমশ জায়গাটি নির্দিষ্ট ও ক্রমাগত আঘাতে চিহ্নিত হয়ে যায়। এই জায়গাগুলো হচ্ছে পিঠের উপরের দুই বাহুসন্ধি, পাছা, জানু. শিরদাঁড়ার ঢালু অংশ। এই সমস্ত অঞ্চল ক্রমশ কড়া পড়ে শক্ত ও তামাটে রঙের হয়ে যায়। গানের শেষাংশে লাঠির বারি এমন দ্রুত ও ভয়াবহ শব্দ হতে থাকে যে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ অনেক সময় ছুটে এসে হাত চেপে ধরে লাঠি কেড়ে নেয়।

আকালু অনেক দিন পর্যন্ত বুঝতে পারে নি মানুষ এই গান শুনে এবং লাঠি পেটা দেখে পয়সা দেয় কেন। তার এই বিচিত্র পণ্যের একজন নিয়মিত ক্রেতা ছিল মহিমবাবু। সপ্তাহে দু'তিনবার আকালুকে সে ডেকে পাঠোত ও হাপু শুনত। অনেক দিন, অনেকদিন পরে আকালু ধরতে পারে যেন এই রহস্য। হাপু শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে মহিমবাবুর মেদবহুল শরীরের বিভিন্ন অংশ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকত, চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে ঠেলে বেরোতে চাইত, নাকের পাটা ফুলে উঠত এবং শেষের দ্রুততায় আকালু লক্ষ করত মহিমবাবু হাঁফাচ্ছে।

আকালুর আরো কিছু বাঁধা খদ্দের ছিল। দুপুরে শুয়ে বসে আলসেমি করে এমন কিছু স্ত্রীলোক, যাদের বউ অন্য পুরুষের সঙ্গে নষ্টামি করে এমন কিছু পুরুষমানুষ, আর তাড়ির গদিতে বা ভাটিখানায় যারা অনেকক্ষণ বসে নেশা করে তারা। আকালু লক্ষ করেছে, এই ধরনের মানুষ তার "হাপু শুনবে—, হা—পু-উ—" এই হাঁক শুনলে চঞ্চল হবেই।

এইভাবে সে তার বিচিত্র গান, শব্দ ও প্রহারের সঙ্গে মানুষের অন্য এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়বৃত্তির সম্পর্ক ভাসাভাসা ভাবে ধরতে শেখে। ব্যাখ্যা সে করতে

পারে না। কিন্তু মহিমবাবুর সঙ্গে বাগোলা হাটের সেই গেরস্থ মানুষটার তফাত বোঝে। সে মানুষটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক ভাঁড় তাড়ি গলায় ঢালছিল। লাঠির শব্দে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আকালুকে একনজর ভ্রূ কুঁচকে দেখে। তারপর ভাঁড়টা নামিয়ে রেখে দ্রুত এসে লাঠিটা আকালুর হাত থেকে কেড়ে নেয় এবং ছুঁড়ে পগারে ফেলে। মুখে বলে, ছিয়া, ছিয়া, এলা বেটাছাবালের কাম? খাইটে খাবার পার না?

আকালু কোনো প্রতিবাদ করতে পারে নি। কেননা লোকটার মুখে একটা শক্তিশালী ধিক্কার ও ভৎর্সনা ছিল। কাজেই মহিমবাবুর সঙ্গে এই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষটার তফাত বোঝে সে।

ইদানিং শারিবা আকালুর সঙ্গে সর্বত্র ঘোরে। শারিবা বলে, তুই যি অংকা পাণ্টি দে আগাপাশতলা বারাস্, লাগে না?

— লাগে তো।

— তবি?

—কি তবি? না বারালে মান্‌সি পায়সা দিবে? হাঁই দেখ্ মহিমবাবুক্। হামাক্ বারাবা দেখলি ওঁয়ার শরীলে স্বোয়াদ লাগে। অরুচি তো!

— অরুচি? তোক্ বারাতে দেখলি স্বোয়াদ লাগে!

— লাগে, লাগে। এলা তুই বুঝবু না।

সেই আকালু শারিবাকে আগেই বলেছিল, তোরাদের আধি জমিগুলান বেহাত হোই যাবে।

— ক্যান্?

—অাংকাই। আমুনি যায়।

এসব দার্শনিক কথা শারিবা বোঝে না। সে বলে, তোর মাতা। মহিমবাবু, লাল মিয়াঁর কত্তো জমি। আরো জমি নে' কি করবি?

আকালুর জিহ্বায় অশ্লীল কথা খুব স্বাভাবিক ভাবে আসত। সে বলে, আর আর মানসের অ্যাটাই ইয়া থাকে। লালমিয়াঁ আর মহিমবাবুর কড়া জানু?

— কড়া!

— পাঁচ পাঁচটা ক'রে।

— হেই!

— বিশ্বাস যাচ্ছো না চাঁদু। দেখলি তবি বুঝ্তা।

— তুই দেখিছিস?

— নালে তোক্ অ্যাকাই ক'ছি?

— ধুর্, মিছাই হামাক্ বোকা বানাছে।

আকালু হি হি ক'রে হাসে।

কিন্তু পরে শারিবার ধারণা হয়েছিল, এরকম একটা অস্বাভাবিক উপায় গুচ্ছে অস্তিত্ব না মানলে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় কি ক'রে ?

দিগিন মণ্ডল নামে এক অবস্থাপন্ন জোতদার মহিমবাবুর কাছ থেকে রূপা ও ইয়াসিনের আধি জমিগুলো কিনে নেয়। সে মাঠ দু'খানায় তখন ভাদুই ধানে সবে রঙ ধরেছে। দিগিন দুই বাজিকরকে ডেকে বলল, তিন দিন সময় দিলাম ধান কেটো মাঠ ফাঁকা কর।

—ক্যান্ ?

—জমিটা হামি কিন্যাছি।

—কেন্তু ধান তো মোট্যে পাক ধরিছে।

—ওলাই কাটবা হোবে। হামি আমন লাগাব, বেছন বুড়া হই যাছে।

দু'জনে তখন মহিমমবাবুর কাছে গিয়েছিল। মহিমবাবু তখন আকালুর আথাল-পাথাল পান্টির বারি খাওয়া দেখছে ও মুখের বিচিত্র 'হোক্কা-হোক্কা' আওয়াজ শুনছে। তার শরীরে তখন স্বেদ কম্প এই সব হচ্ছে। তার তখন কথা শোনার সময় নেই। পুরো না শুনেই বলল, আরে জমির অভাব হছে ? পাশের জঙ্গলটা খালাস কর্যে লেও। এলা কি অ্যাটা মোকদ্দমা ?

ইয়াসিন, রূপা দিগিনের কাছে সাতদিনের সময় চায়। দিগিন হাঁ-না কিছুই বলে না ও তিনদিন পরে মাঠে হাল মই নামিয়ে দেয়। রূপার যাযাবর রক্তের আকস্মিক ক্রোধ ঝলসে ওঠে ও একজন তার হাতে খুন হয়। তারপরেই আঁড়ালের চিরকালের ভয়ার্ত মারখাওয়া বেদিয়া সারা দুনিয়াব্যাপী অন্ধকার দেখে। পালায় সে, ক্রমাগত পালায়। পিছনে পড়ে থাকে দুই পুরুষের অর্জিত অধিকার, প্রিয়জন, আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত ঘর-গেরস্থালির পরিকল্পনা।

তারপর যা হয়, তখন তা হামেশাই হতো। এখন যাকে একটা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস মনে হবে, তখন সেটাই স্বাভাবিক মনে হতো। দুই কুঠিবাড়ির দুই হাতি বাজিকরদের ঘর ভাঙে। ভাদুই ফসলের জমিগুলোকে দাপিয়ে কাদা করে। ঘরে আগুন লাগে। বাজিকর রমণীরা বয়স নির্বিশেষে ধর্ষিতা হয়। ইয়াসিনের মেয়ে পলবি নিখোঁজ হয়। তারপর এই ছিন্নমূল মানুষগুলোকে তাড়িয়ে অনেকদূর পার ক'রে দেয় মহিমবাবু, লালমিয়াঁ ও দিগিন মণ্ডলের লোকেরা। এসব উপভোগ করার মতো দৃশ্য তখন হামেশাই হতো। বাচ্চা-কাচ্চা, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে মানুষ ছুটছে দিগ্বিদিগ্‌, জ্ঞানশূন্য হয়ে, পিছনে তাড়া ক'রে যাচ্ছে আরেকদল ক্ষিপ্ত মানুষ, ছুঁড়ছে ঢিল।

তখন বর্ষার দিন। মানুষগুলো নদীর পাড় ধরে এগোয়, কেন না নদীর পাড়ে কাদা কিছু কম, পলি অঞ্চল। তারা এগোয় পশ্চিমের দিকে। রাস্তায় আট-দশটি শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মরে। মরে দু'জন আসন্নপ্রসবা রমণী। এইভাবে তারা পুবে চল্লিশ মাইল সরে এসে পাতালু নদীর ধারে মোহর হাটখোলায় আদের বোঝা নামায়।

তাদের জীবন হয় আরো আদিম, আরো নির্মম। তাদের রমণীরা তখন গ্রাম্য হাটুরে মানুষের মনোরঞ্জন ক'রে খুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করে। পুরুষরা চুরি জোচ্চুরি ক'রে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। আবার ঢোলকের চামড়ায় কাঠি পড়ে, আবার রক্ত চণ্ডালের হাড়ে তেল সিঁদুর লাগে, অনভ্যস্ত পায়ে টানটান দড়ির উপরে হেঁটে যায় বাজিকর বালিকা। আবার তার মধ্যেই কখনো আনুষ্ঠানিক গান ওঠে—

এ সে হাল্‌দি লাগিরে
    এ তো মায়েরি
তেল মেগুরে লুড়ে
    এ তো মায়েরি।

পরবর্তী ছ'মাস বাজিকরেরা মোহরের হাটখোলায় প্রায় খোলা আকাশের নিচে থাকে। এর মধ্যে পাঁচবিবি আর মোহরের এই চল্লিশ মাইল দূরত্বের মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় সীমানা চিহ্ন হয়। পাঁচবিবি পড়ে পাকিস্তানে, মোহর ভারতে। মোহরের উপর নতুন মানুষের চাপ বাড়ে। জমি বদল হয়, জমি দখল হয়। জমির দাম বাড়ে, মানুষের দাম কমে। দেশের মানচিত্রে ও শাসনযন্ত্রে নানারকম পরিবর্তন হয়।

কিন্তু বাজিকরদের বিগত পঞ্চাশ বছরের জীবনের সঙ্গে পরবর্তী তিরিশ বছরের কোনো তফাত হয় না। পঞ্চাশ বছর আগে জামিরের নেতৃত্বে যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল, ইয়াসিনের নেতৃত্বে আবার নতুন ক'রে তা শুরু হয়। গত পঞ্চাশ বছরে যে অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার থেকে আর রেহাই পায় না বাজিকর। বাজিকর আর পুরোপুরি বাদিয়া বাজিকর হতে পারে না। খেলা দেখায়, ভিখ মাঙ্গে ঠিকই, কিন্তু প্রাচীন জীবনে সে আর ফিরে যেতে পারে না। তুই পুরুষে পৃথিবীর রাস্তা তার কাছে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, পা সীমাবদ্ধ পরিচিত পথের মাপে।

কাজেই আজুরা মণ্ডলের আনাগোনাকে কাজে লাগাতে হয়। আজুরা ভয়ংকর মুখাকৃতির ছোটখাটো চেহারার মানুষ। হঠাৎ মুখ দেখলে ভীষণ বলিষ্ঠ মনে হয়। পাশবিক মনে হয়। কোনোকালে হয়ত সারামুখে অজস্র ব্রণ হতো। এখন হয় না। কিন্তু অতীতের সেই ক্ষত মুখটাকে উঁচু নিচু একটা খসখসে কর্কশ রূপ দিয়েছে। তার চোখ স্থির, খুনীর মতো। সে প্রচুর জমির মালিক, কিন্তু সে পাঁচবিবির অবস্থাপন্নদের মতো হাতিপোষা বড়লোকি করে না। কারণ পাঁচবিবি মোহর থেকে অনেক এগিয়ে। আজুরা মোহরের মাপের মানুষ। আজুরার ভোগবৃত্তি সবই মোহরের মাপের। দিগেন মণ্ডল পলবিকে লুঠে নিয়ে ভোগ করে, আর আজুরা সরাসরি বাজিকরের পাতার ঘরে আসে, গল্প জমায়, সরাসরি প্রস্তাব ও লেনদেন করে।

হাটখোলায় হাটুরে রসিকরা আসে, আজুরা আসে, কেরোসিনের লম্ফ জ্বলে, নেভে। পুরুষেরা কেউ এ নিয়ে কথা তোলে না, মেয়েরা এ নিয়ে পাত'লুর নদীর ঘাটে গিয়েও আলোচনা করে না। কোনো আলোচনা না করেও সবাই ধরে নেয় পথচলতি রাস্তার একটা অত্যন্ত আবর্জনা ভর' বাঁক। এ বাঁকটা পেরোলেই ভালো, পরিষ্কার রাস্তা পাওয়া যাবে। কেউ এ আশ্বাস দেয় নি, তবুও।

ছ'মাস পরে মোহর হাটখোলা ছেড়ে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার তু'পাশে

বাজিকরেরা তাদের নতুন বসত করে। নতুন ক'রে কাদামাটির দেয়াল তোলে। আজুরা তাদের সহায় থাকে, কাজেই বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হয় না। আজুরার জঙ্গলাকীর্ণ বিশাল ভিটা জমি সমতল হয়ে আবাদি জমি হয়। ওপার থেকে ক্রমাগত মানুষ আসতে থাকে। জমির ব্যবহার বাড়ে। ফসলের দাম দ্বিগুণ হয়। আজুরা তৈরি জমি বিক্রি করে ও বাজিকরদের সহায়তায় পতিত জমি উদ্ধারে মন দেয়। অলিখিত শর্ত থাকে পাঁচবিবির মহিমবাবুর মতো। অর্থাৎ বাজিকরেরা— সেই পুরানো স্বপ্ন দেখে, খালাসী জমির আধি পাওয়ার স্বপ্ন। এইভাবে তারা আজুরার আশ্রয়ে থাকে। আজুরা একথা ভেবে শ্লাঘা বোধ করে ও বাজিকরেরা তার প্রতি কৃতার্থ থাকে। আজুরার সঙ্গে বাজিকরদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয় যখন সে লছমনের মেয়ে নসীবনকে তার পাঁচ নম্বর উপপত্নী করে।

রাস্তার পাশের নতুন বাড়িতে এসে শারিবার মা মধ্যবয়সী শা-জাদী মধ্যবয়সী ইয়াসিনের ঘর করতে চলে যায়। কেন না রূপার ফেরার আর কোনো আশা থাকে না। পলবির মা পাঁচবিবি থাকতেই লোই আর হাতপাক রোগে মারা গিয়েছিল। শা-জাদী যদিও ইয়াসিনের চাচাতো বোন, তবুও এ নিয়ে কোনো সমাজ হয় না। কেন না বাজিকরেরা চিরকালই নিজস্ব গোঠীর মধ্যে বদ্ধ। এখন একেবারেই নিরুপায়। পার্শ্ববর্তী কোনো সমাজই তাদের গ্রহণ করে না। কাজেই জান্তব জৈব অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে প্রায় স্বজন গমনই তাদের মেনে নিতে হয়।

মানুষ যেহেতু যে কোনো জানোয়ারের থেকে অনেক বেশি পরিশ্রমী সেকারণেই বাজিকরেরা নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে পারে। আর বাজিকরদের পরিশ্রম আজুরাদের বড কাজে লাগছে, কাজেই তারা বেঁচে থাকে। কিন্তু জীবন বিবর্ণ, এত বিবর্ণ যে জন্মে কোলাহল হয় না, মৃত্যুতে হাহাকার নেই। অথচ যে কোনো স্তরের জীবন ধারণের সংগ্রামে এই উচ্ছ্বাস দু'টি থাকে, এমনকি পশুদেরও।

শারিবা আজুরা মণ্ডলের পতিত ভিটা জমির উঁচু নিচু মাটি চটিয়ে সমতল করে অন্যদের সঙ্গে এবং বিশ্রামের সময়ে এসব চিন্তা করে। এখন তার বয়স বিশ বছরের কাছাকাছি। শক্তসমর্থ যুবক শরীর তার। সে চিন্তা করে, কেননা লুবিনি তার ভিতরে চিন্তার বীজ বপন ক'রে গিয়েছিল। সে বোঝে চিন্তা সবাই করে না, চিন্তা কাউকে কাউকে করতে হয়। জমির বাজিকর চিন্তা করেছিল, লুবিনি চিন্তা করেছিল, শারিবা এখন চিন্তা করে।

একপাশে গাছের তলায় তার প্রায় সর্বসময়ের সঙ্গী আকালু বসে থাকে। আকালু তাদের সঙ্গেই দেশান্তরী হয়েছিল। সে পরিশ্রমের কাজ করে না, অথবা করতে পারে না। তার শরীর শীর্ণকায়। এখনো সে হাপু গায় এবং বাজিকরদের কাছে শেখা নানারকম হাত সাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে।

আকালু বলে, চ্যাতনে আছিস, শারিবা? কি ভাবিস সদাই?

—না, ভাবি না।

—পলবির কথা?

—থাম্, শালা বেজাত! থাম্কা একোই চিন্তা।

অথচ চিন্তাটা খামোখা নয়, এবং জানে একমাত্র আকালুই। যে বয়সে শারিবা পলবির প্রতি আকৃষ্ট হয় সে বয়সে শারিবা পলবির দৃষ্টিতে শিশু। সর্বত্রই, সব সমাজেই অষ্টাদশী পলবিরা ষোল বছরের শারিবাদের শিশু ভাবে। অথচ এরকম ঘটনা হয়, সব জায়গাতেই।

আকালু বলে, ইয়াসিন তোর মামা লাগে না?

শারিবা ইঙ্গিতটা বোঝে। মাথা নাড়ে। এ শুধু তাদের দু'জনার অন্তরঙ্গ সংলাপ; শুধু তাদের দু'জনার।

—তোর মায়ের আপন চাচেরা ভাই? •

শারিবা নিশ্চুপে মাথা নাড়ে।

—তোদের মাঝে এম্কা হয়, হামারদের বম্মনদের এম্কা হয় না।

—হামারদেরও এলা আগে হোত না। এখন হয়, রূপায় কি?

—তোরা তো হামারদের সাথ কুটুম করবি না। মুসলমানরাও করবে না। বাজিকরের ঘরোৎ বিয়া-সাদি ঝকমারি হোই গিছে।

—ক্যান্? আজুরা তোদের সাথ কুটুম করল লয়?

—কুটুম? ওলা কুটুম কয়? আন্ লোকের কথা ছাড়, আকালু। তুই বিহা করবি বাজিকরের বিটিক?

—হামি? তোর মাথা খারাপ? হামাক্ কোন্ মেয়া বিহা করবে?

—ক্যান্? মেয়ার অভাব?

—না না, সিটা কথা লয়। হামাক্ ভাল করি গ্যাখ, ভাই শারিবা। হামাক যি মেয়া বিহা করার চাবে, তাক্ হামি কেম্কা বিহা করমো?

—ক্যান্?

শরিবা ধরতে পারে না রহস্যটা।

—হামার জুটি যি হবি শারিবা তাক্ কোন্ মরদ বিহা করবার চাবে?

—মজাক্ ছাড়, আকালু। সিধা কথা ক'। বাজিকরের মেয়া বিহা করবি?

—হামার তো জাত নাই। হামি বেজাত। কেন্তু হামাক্ দি কি আসে যায়?

পল'বি নিখোঁজ হয়, নসীবন চেমনি হয়, শা-জাদী তার চাচেরা ভাইয়ের ঘরে উঠে যায়। শিশু মৃত্যু, অকাল মৃত্যু বাড়ে। একই রক্তের মধ্যে বারবার মিশ্রণ হয়। উপায় কি? নিদান দেওয়ার মতো বয়োবৃদ্ধ কেউ বেঁচে নেই।

এরকম একদিন অতি ভোর বেলায় শারিবা পাতালু নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওপারে সূর্যোদয় দেখে। ওপারে নদী একসময় পুব থেকে পশ্চিমে বয়ে আসত, এখন গতিপথ পরিবর্তন ক'রে উত্তর থেকে দক্ষিণে এসে এই জায়গায় পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। ফলে পুবের পরিত্যক্ত চড়া এখন দীর্ঘস্থান জুড়ে বালিয়াড়ি, প্রায় উদ্ভিদশূন্য। সূর্য ধীরে ধীরে ওঠে, সেই বালিয়াড়িতে নানাবর্ণের প্রতিফলন ফেলে। বালির উপরে শুয়ে থাকা শিশিরবিন্দু ঝলমল করে। শারিবার এই সূর্যকে মনে হয় লুবিনি-বর্ণিত 'তরক'-এর মতো। রক্তাক্ত বৃহৎ যাযাবরী 'তরক' যেন পরিচিত সূর্য নয়। এবং সেই তরকের ভেতর থেকে যেন নেমে আসে একটি হেলো, মহিষ নয়। গলা লম্বা ক'রে বাড়িয়ে দিয়ে সেই হেলো ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে, পিছনে সূর্য। ক্রমে স্পষ্ট হয়। হেলোর পিঠের উপরে একজন মানুষ আড়াআড়ি বসে। আরেকজন মানুষ পাশে পাশে আসে।

আকালু ও শারিবা আগন্তুকদের দেখতে থাকে। নদীর পাড়ে এসে তারা থামে, তারপর নদী পার হয়। এপারে এলে শারিবা পরিষ্কার চিনতে পারে রূপাকে। যদিও লাল জমকাল লুঙ্গি তার পরনে, গায়ে নীল সার্ট, মাথায় হলুদ রঙের রুমাল কপালের উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে টেনে বাঁধা। তবুও বাপকে চিনতে ভুল হয় না শারিবার। ঘোষের পিঠের উপর বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের তীক্ষ্ণ চেহারার এক যুবতী। তার দুই পাশে দড়ির শিকলিতে ঝুলিয়ে রাখা তিন তিন ছ'টা সাপের ঝাঁপি।

রূপা প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে, তারপর নিঃসংশয় হয়, তারপর আবেগ ও গর্ব তাকে আপ্লুত করে।

—শারিবা! হামার বেটা!

শারিবা নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে থাকে।

রূপা তার মুখে গায়ে হাত বুলায়, তার হাত কাঁপে, মুখের পেশী কাঁপে। সে আবার বলে, শারিবা! হামার বেটা!

শারিবা দাঁড়িয়ে থাকে।

রূপা তাকে ছেড়ে তার সঙ্গিনীর কাছে যায় দ্রুত। তার হাত ধরে টেনে নামায় তাকে।

—শারিবা, হামার বেটা।

তার সঙ্গিনী দু'হাত উপরে তুলে ক্লান্তি ভাঙে শরীরকে মুচড়ে। ক্লান্ত অথচ কলহাস্য করে, বিস্ময় তার কণ্ঠে।

—বাব্‌বা! এংকা যুয়ান বেটা তুমার!

রূপা আবার শারিবার কাছে আসে, কিছুটা বিহ্বল, কিছুটা সলজ্জ। সে সঙ্গিনীর পরিচয় দেয়।

শারিবা, ইয়া–ই–হইল শরমী।

সবার অলক্ষে আকালু গ্রামে ছুটে গিয়েছিল।

খুনী রূপা, পলাতক রূপা ফিরে আসে রঙ্গিলা রূপা হয়ে। এই হল যাযাবরী স্বভাব। আচমকা কথায় কথায় ছুরি ঝলসে উঠতে পারে, পরক্ষণেই আবার হয়ত হো হো হাসি, পানপাত্র হাতে। দাম্ভিক, হামবড়াই যাযাবর। আসল সাহসিকতাব কাজে ধৈর্যের কাজে, কষ্টসহিষ্ণুতার কাজে সে নেই।

জামির চেয়েছিল সেখান থেকে তাকে তুলে আনতে। শক্ত মাটির পৃথিবীতে তাকে দাঁড করাতে চেয়েছিল। সে বলত, যাও সব, যাব য'ব ঘরেব ছামুতে গাছ লাগাও। নদীব চড়ায় বাস, বালির রাজ্যি। আকাশের এক তরক জমিনে হাজার তরক জ্বালায়। গাছ লাগাও, ছেঁয়া হোবে। গাছ লাগাও খড়ি হোবে, গাছ লাগাও তক্তা হোবে।

যাযাবর বলে, হেই, কবি গাছ ঢেঙা হোবে, তাবাদে তাব পাত ঝাপ্‌বা হোবে, তবি সি গাছে ছেঁয়া হোবে। ওলা আমাব কাম লয়।

জামির সেই যাযাবরকে শাসন করেছিল।

আবাব সেইসব অনুশাসন যা বাজিকরকে অর্থহীন ক্ষুদ্র গণ্ডিব মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাইত, জামির তাও ভেঙেছিল।

—হেই তুমি বিটি ছেল্যা হয়্যা কাপড নাইড়ে দিয়া আন্ জাগাৎ গেছ, আন্ কাপড পিন্‌ধে আইছ, তুমার সামাজ বন্ধ হইল। হেই জামিব, তুমু ইয়াব দণ্ড দেও। ইয়ার সাজা বিধান কর।

—না, ইয়ার দণ্ড হয় না। অংকা বিচার হয় না।

—আঃ মোগুল, এলা তুমার কি বিচার! বাজিকবের বিটি ছেল্যা বেভার করা কাপড কামিজ ফেল্যে ঘুব্যে বেড়াবে? বিগা মাইয়ের বাসাত লাইগবে সি কাপড়ে, সমাজের অকল্যাণ হোবে, চ্যাংড়া মইববে, ধরতি মাই গুসা হোবে, ঝড, ভুঁইকম্প হোবে। শনিবারের ভূঁইকম্প সোরন কর, জামির বাজিকর।

—না, অংকা বিচার হয় না। ওলা মাঠ-ঘাট-বাস্তার বিচাব মাট-ঘাঠ-বাস্তাব রাইখ্যে আসিছি। এখুন ঘর-জমিন আর ফসলের বিচার, লতুন বিচাব, নতুন আইন।

অনেকে আহত হয়, আশংকিত হয়।

আবার সেই জামির মতিনকে বলেছিল, না, পাসরা, তুমার বুনের বিটি, উয়াক তুমু বিহা কইরবা পারব না।

—তবি হামি কাক্ বিয়া করমো? হামার বিহা হোবে না?

—তুমু আন্ মেয়া খোঁজ, মতিন। পাসরা তুমার আপন বিটির পারা, তাক্ বিহা করা সাজে না।

সমস্যাটা তখনই জটিল হয়ে উঠেছিল। বাজিকরের ছেলেমেয়ের বিয়ের সমস্যা সবাইকে ভাবাচ্ছিল। অকালমৃত্যু বাজিকরদের দ্রুত সংখ্যা হ্রাস করছিল। কাজেই উপযুক্ত সময়ে পাত্রের পাত্রী ও পাত্রীর পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া হাল-লাঙল-জমি নিয়ে যে সমাজ তাতে বিয়ে একটি বিশেষ ব্যাপার। বিয়ে সমাজকে প্রশস্ত করে, পরিধি বাড়ায়। সবচেয়ে বড় কথা, বিয়ে কম হোক বেশি হোক, জমিকে নাড়াচাড়া করায়। কর্মী লোকের জমি বাড়ে। কিছু থাকলে তুমি খেটে তাকে বাড়াতে পার। সামান্য কিছুও পরিশ্রমের তেজে তাপে বাড়ে। কিন্তু আদিতে তো সেই সামান্য কিছু চাই। কিছু-না থেকে কিছু নাই বেরোবে। জামির এসব বুঝত। বুঝত, অন্য সমাজের সঙ্গে কুটুম্বিতা চাই। যাও মতিন, আন্ সমাজের বিটি বিহা করি আন।

কিন্তু সেসব জামিরের স্বপ্নই থাকে। পার্শ্ববর্তী কোনো সমাজের পাত্র বা পাত্রীকে বাজিকর ছুঁতে পারে না। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দূর করতে পারে না কেউ। অতি কদাচিৎ কেউ নিজ বাজিকর পরিচয় গোপন ক'রে দূর থেকে বাজিকরের থেকেও হা-ঘরে নিরন্ন ঘরের মেয়ে নিয়ে আসে। জানাজানি হওয়ার পর অশান্তি হয়, দাঙ্গাও হয় কখনো কখনো। শেষপর্যন্ত জামিরকে অতি দুঃখে নিদান দিতে হয়, বাপসকল, জানবার হয়ো না। অর্থাৎ কন্যাস্থানীয়া কিংবা পুত্রস্থানীয়কে বিয়ে কোরো না। চেষ্টা রাখবা, যাতে বিটিরা দূরে যায় আর বেটারা দূর থিকা আনে। শোগর, মরি আর ইওয়া – জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ এই তিনকে হিসাবের মধ্যে রাখ, নিয়মের মধ্যে রাখ।

আর জামির বলত, বাজিকরের বেটারা, তুমরা বাদি'। বটে, কেন্তু সি কথা এখুন বিসোরণ হই যাও। আঁছোতে লোই লাচাবা না। না করবা মাথা গরম। কেন কি ইটা আমাদের থিতু হোবার সোমায়। মাথা ঠাণ্ডা রাখ বাপসকল।

—তথাপি দেখ শারিবা, হামি কি কাজ করলো। হামার বাপ জামির বাজিকর কত বুঝদার আদমি ছিল। হামি বাজিকরদের থিতু উচ্ছেদ করলো। হামি বাজিকর বালবাচ্চাকে মারা করলো। ই সব হামার দোষে রে শারিবা। আর ই দেখ, এখুন পালাই বেড়াই। হোথা যাই, হেথা যাই, ফির বুঝি বাদিয়া বনে যাই। ই হামার সদাই ডর।

—না, তুমার সি ডর নাই। দেশ ভাগ হোই গিছে। সি দ্যাশের আইন সিথাই থাকি গিছে। ওলা আইন হেথায় আর তুমাক ছোঁবে না।

—হাঁ, সিটা বুঝেই ফিরলো। এখুন ইয়াসিন হামাক রাখে, হেথা থাকমো। লয়তো চলি যামো, ফির বাজিকর হোই যামো।

রূপা শাজাদীর কথা একবারও জিজ্ঞেস করে না। নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হয় বলে বোধহয় ছেলের কাছে সংকোচ লাগে। শারিবার পর শাজাদী আরো তিনটি

সন্তান রূপাকে উপহার দিয়েছিল, তার একটিও এখন আর বেঁচে নেই। শেষটির, জুম্মনের মৃত্যু হয় পাঁচবিবি থেকে পালানোর সময় রাস্তায় সাপের কামড়ে। রূপা এখানো সে কথা জানে না। মোষের পিঠের উপরে ঝোলানো সাপের ঝাঁপিগুলোর দিকে শারিবা যতবার তাকাচ্ছে ততবরই কথাটা তার মনে হচ্ছে। জুম্মন এখন থাকলে বছর দশেকের হতো। শারিবা আশংকা করছে কখন রূপা প্রশ্নটা করে।

—হ্যাঁ শারিবা, জুম্মনরা কেম্‌কা আছে?

শারিবা চুপ ক'রে থাকে। রূপা জিজ্ঞেস করে 'জুম্মন'রা কেমন আছে। সে শাজাদীর খবরও এই কৌশলে জানতে চায়। এই শরমীর উপস্থিতি তাকে কি পীড়িত করে?

—হাঁ শারিবা, জুম্মন কত বড়টা হইছে?

শারিবা থমকে থামে, অথবা সে থামে না, কেউ তাকে থামায়। সে আগে আগে চলছিল, অন্যরা পিছনে। সে ফিরে দাঁড়ায়। তার দৃষ্টি আবিষ্ট, দূরবর্তী। পাঁচবিবি থেকে মোহরের পথে এখন তার অস্তিত্ব। একটা পরিত্যক্ত মাঠকোঠা বাড়িতে তাড়া-খাওয়া মানুষগুলোর রাতের অবসন্ন আশ্রয়। অভুক্ত ঘুম। ভাই, হামাক্ কিসে কাটল? হায় ভাই, হামার হাত জ্বলি যায়।

শারিবা লাফ দিয়ে উঠেছিল। অন্ধকার বর্ষণসিক্ত রাত। মাটির মেঝেতে ধাবমান ইঁদুরের ভয়ার্ত চিৎকার। তার সঙ্গে ধাবমান সাপের ক্রুদ্ধ গর্জন। কি অন্ধকার! ভাই, কিসে কাটল হামাক্? হায় ভাই, হামার হাত জ্বলি যায়!

দিগিন মণ্ডল তাড়া করেছিল রূপাকে। তার হাতে ছিল দেড় মানুষ দৈর্ঘ্যের একটা বল্লম, যার ধাতব অংশটাই ছিল এক হাত। রূপা পালিয়েছিল।

খাদ্য ও খাদকের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল জুম্মনের ঘুমন্ত হাত। কালান্তক যম ভেবেছিল এ বোধহয় এক প্রতিবন্ধকতা। হায় ভাই, হামার হাত জ্বলি যায়।

কাঠখড়ির আগুনটাকে উস্‌কে তুলেছিল শারিবা। তারপর জুম্মনের দ্রুত কিন্তু চার ঘণ্টাব্যাপী মৃত্যু। ভাই, হামার সারা গাও রবশ লাগে ক্যান? মাও, হামাক্ ধইরে উঁচা কর্। হামি কেছু দেখবা পাছি নাই ক্যান্?

শতাধিক মানুষ নিঃশব্দে ঘিরে রাখে জুম্মনকে, কেউ কোনো শব্দ করে না। যেন শব্দেরও মৃত্যু হয়েছে। যেন সবাই নিঃশব্দে ঐক্যমত হয়েছে নৈঃশব্দ্যে। যেন শুধু শব্দ ও ধ্বনি উচ্চারণ করবে এখন জুম্মন, যেহেতু আর কোনোদিন সে বাতাসের বিরুদ্ধে তরঙ্গ তুলবে না।

তারপর যখন জুম্মনের ঘোলাটে চোখের কোণা ফেটে রক্তের ফোঁটা জমে, কান থেকে গড়িয়ে নামে রক্ত, মুখের কশে ফেনা, যখন সে শেষবারের মতো গোঙায়, হেই মাও, তোর মুখ দেখি না ক্যান্? তখন শাজাদী বাঁধ ভাঙে। হাহাকার ধ্বনি

যার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, এমন শব্দ। যা রাত্রিকে খান খান করে। যাবতীয় আবদ্ধ যন্ত্রণাকে একবারেই ছড়িয়ে দিতে পারে সমস্ত পৃথিবীতে এমন নিরেট সীসের টুকরোর মতো ভারি শোক।

তারপর সেই শতাধিক মানুষ একসঙ্গে সন্তাপ করে। সারারাতব্যাপী অভুক্ত, ক্লান্ত শোক। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অসংখ্য রুদ্ধ নিরুপায় শোক এখন গতিশীল হয়। যে রাত শেষ হয়ে কখনো সূর্যোদয় হয় না, যে রাতের অন্ধকার শুধু লবণাক্ত জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, সেই রকম রাত পার ক'রে দেয় এই সব মানুষ।

—শারিবা? জুম্মন?

—নাই। সাপকাটি হয়্যা মরিছে।

ক্লান্ত মোষটা ঘাসে মুখ দেয়। শারিবা মুখ ঘুরিয়ে আবার চলে, পিছন ফিরে তাকায় না। যেন তার পিছনে কেউ নেই। যেন তার কোনো অতীত নেই। যেমন বাজিকরের যে কোনো অতীত জামির ভেঙে ফেলে শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রেখে গেছে তার বংশধরের জন্য।

চারদিকে হাটুরে মানুষের ভিড গোল হয়ে। মাঝখানে ছ'টি সাপের ঝাঁপি। একটির মুখ খোলা। তার ভেতর থেকে মাথা তুলে আছে এক বিশালকায় গোক্ষুর, স্থানীয় ভাষায় গোমা। রূপা ঢোলকে কাঠি মারে, ঘুরে ঘুরে ভিড়ের বৃত্তকে বড করে। শরমীর কাপড় হাঁটুর উপরে তোলা। পায়ের চেটোয় ভর দিয়ে বাঁ উরু আন্দোলিত করে গোক্ষুরের সামনে। যুবতী নারীর ভরাট উরু। মানুষের ভিড বাড়ে। গোমা তার উত্তোলিত দেহ বাঁকা করে পিছন দিকে, আরো পিছনে। শরমী হাতের মুদ্রা করে। গোমা ছোবল মারে, শরমী হাঁটু সরিয়ে নেয় এবং একই সাথে বাঁ হাতে সাপের গলার নিচে হাত দিয়ে সাপকে প্রতিহত করে। একটা পূর্ণ-বয়স্ক গোক্ষুরের ছোবলের শক্তি মাঝারি শক্তির ঘুষির মতো। শক্ত মাটিতে ছোবল আছড়ে পডলে সাপ জখম হবে। শরমী বলে, খা—খা—খা, বক্কিলাক্ খা, কিপুনাক খা—।

রূপা ঢোলক রাখে। মাথার রঙিন ফেটি খুলে আবার নতুন ক'রে বাঁধে। রক্তাভ বিশাল তার চোখ, পাকা গমের মতো গায়ের রং, বলিষ্ঠ চেহারা। অচিন মানুষকেও সে আকৃষ্ট করতে পারে। ঝুলির ভেতর থেকে একটা শুকনো শিকর সে বের ক'রে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে সে বলে, এই যে ভদ্দরলোক—ইয়ার নাম মণিরাজ গাছ। -তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে স্বরগ্রাম উঁচুতে নিচুতে উঠিয়ে নামিয়ে সে অনর্গল কথা বলে। যে কোনো শব্দের সঙ্গে যখন তখন একটা বিসর্গ যুক্ত ক'রে সে তার পেশাদারী ঢঙটি বজায় রাখে।

ইয়ার নাম মণিরাজ গাছ।
আস্তক মুনি কামনা মণিরাজ সাপের মাথার মণি।
মহাভারতের ফরমা(ঃ') ন।
হামার ওস্তাদ আপার আসামে থাকেন—
কামরূপের লোক উনিহ্।
জাতে গারো লোক—
না(ম হা ম—রামলাল গারোলী।
বয়স—একশৎ পঁচিশ বছ্ছর।
তবি এটাই কথা মোনৎ রাইখবেন,
ভদ্দর নোক—
দুইটা, চাইরটা পায়সা সাপ দেখায়া হামি
রোজগার করবা চাই না ':।

হামার এটাই দাবি, ভদ্দর নো(হ)ক.
ওস্তাদের হুকুম—
বছরে দুই মাস হামি বিনা পয়সায়
সাপ দেখায়া বেড়াই।
মাত্তর দুই মাস।
আর এই মণিরাজ—
ভদ্দরনো—হোক,
ডাক্তারে, অষুধে, কবিরাজে
কাম হয় নাঃ।
সাপকাটি দংশন ঘণ্টা পারাবে না,
জানা আছেঃ—
বেজিৎ-সাপেৎ জঙ্গলে লডহাই—
তাবাদে বেজি ডাক্তার কোবরাজের কাছে যায় ?
নাঃ
যায় এই গাছরার কাছে।
মণিরাজের শিকর,
ওস্তাদের আদেশ—হুকুম—
ভদ্দরনোক মাফ কইরবেন,
কুনো পায়সা দি' লয়,
ওস্তাদের হুকুম।
ইয়াই হামার শ্যাষ কথা।
তবি এটা কথা মোনৎ রাখেন ,
ই গাছরা আপনার বেবাক বেমারি ভাল করবা পারে নাঃ
খালি সাপকে দুরে রাখবা পারে—
এই গাছরা।
ভদ্দরনোক—
আপনার ঘরোৎ এঁদুরে বড বড় গত্‌থ করে—
সি গত্‌থে এঁদুর খাওয়ার লোভে
যম আসে, আপনার যম !
বেবাক ভাই জানেন,
আতোৎ ঘরের আঁগনাৎ শোওয়া ভাই জানেন,
কানের নিচে মাটির নিচে
সর্‌সর্‌ শব্দ করি যি যায়—
সি আপনার যম।

কেন্তু রূপায় ?
নাই ।
মাটির ঘরে গত্‌খ হবেই ।
এঁদুর এসবেই ।
সাপ এসবেই ।
সি সা —(হা) প —
মানষির গায়ের গরমে ডিম পাড়ে,
সি সা — (হা) প —
দুই থিকা দু হাজার হোবার পারে ।
আর অসাবধানে —
আপনাক কাইটবে ।
এক ঘড়ি যাবে না —
তার আগে এ — ই সাপের রঙ পাবে আপনার চামড়া ।
আস্তক মুনি, মণিরাজ
সাপের মাথার মণি :) —
এই গাছরা —
আপনার ঘর বাইনধবে,
সাপকে রাইখবে দূরে দূরে
আপনাক্ বাঁচাবে ।
আ (হা) র —
যি সব বাচ্চা চেংড়া শোঁকর শুঁকরি,
ঘুম গেলে দাঁত কিড়্ মিড়্ করে,
মুখ দিয়া গেঁজলা তুলে ,
ভদ্দর নো — (হো) — ক,
এই গাছরা মাদুলি কইরো ?
লয় ।
ভরা কলসির এক বদনা জলোৎ
একবার, খালি একোবার ঢুবায়া
সি জল পিলাবেন সি চ াংড়াক্ ।
আর হামার যুঁয়া ভাইদের,
এটা কঠিন বেপার আছে ।
আতোৎ ঘুমির মধ্যে —
শয়তান যার ঘাড়োৎ চাপে,
মোনৎ শয়তান ঢুকে বসে,

সি যুঁয়া ভাই, কু স্বপন দেখে,
যাক্ হামরা ক'হি—খারাপ স্বপন।
ই গাছরা ধারণ কইরবেন, আইজ্ঞা।
ই হামার শেষ কথা।
তবি মোনৎ রাইখবেন,
তামা, সিসা, দস্তা, সোনা, রূপা,
হাঁ, সব ধাতুর মাচুলি চইলবে।
ওস্তাদের হুকুম।
না, মাফ কইরবেন আইজ্ঞা,
পায়দা নিই না।
ওস্তাদের হুকুম দুই মাস,
আর ই গাছরা এংকাই দি,
পায়সা নিই না
তবি যদি বলেন,
সি মাচু ল কইরবা গেলে
আপনার খরচ লাইগবে তিন টাকা, পাঁচ টাকা।
ভদ্দর নোক, গরীব ভাই,
আপনার হুজ্জতি রেহাই,
ঠগবাটপাড রেহাই,
মণি াজ আস্তক মুনি কামনা,
মহাভারতের ফারমা(: ন.
হামার ওস্তাদ—
এই গাছরা যা জ নে খালি বনের বেজি,
পাঁচ টাকা লয়, তিন টাকা লয়,
দুটাকা লয়, এক টাকা লয়,
কেবল বারো গণ্ডা পয়সায়
সি মাচুলি —
মোনৎ রাইখবেন, খালি মাচুলির দাম—
গাছরার লয়
খালি বারো গণ্ডা পয়সা।
ই হামার শেষ কথা।
তবি ভদ্দর নো—(হো) ক—
হামি মরা মানুষি বাচাবার পারি না।

হামার ওস্তাদ রামলাল গারোলী,
কড়ি চালান দি'
সাপ ধইর‍্যে আনে।
সাতদিনের সাপকাটি বাসি মরা
জিয়ায়।

তবি ভদ্দরনোক,
আপনাদের দোয়া মাঙ্গে রূপা বাজিকর।
ওস্তাদের সাচ্চা চেলা য্যান্ হোবার পারি।

তারপর শরমা ঝাঁপির ঢাকনায় তাবিজ ফেরি করে, ফাউ হিসাবে ক্রেতার সঙ্গে দুই একটা রঙ্গ রসের কথা বলে। এদিকটায় ব্যাপারটা খুবই অভিনব। মানুষ দেখে মুখের কাছে তাবিজ ধরলে, গাছরা ধরলে অমন কালান্তক গোমা আলাদ্ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর সাপকে ডরায় না কে? মানুষ বারো আনা পয়সা খরচ করতে পিছপা হয় না। রূপার রোজগার ভালোই হয়। তিন বছরের পলাতক জীবনে সে সঞ্চয় করেছে এই নতুন পেশা, খেলা ও তার সঙ্গে এই পাটোয়ারি বুদ্ধির ব্যবসা। চেহারা তার চিরকালই আকর্ষণীয়। এখন সেই চেহারাও তার কাজে লাগে। বাজিকর সাপ নাচায় না, জামির একথা বলেছিল কোন এক প্রাচীন কালে। তারপর জামির একথাও বলেছিল, থিতু হওয়ার জন্য সব কাম করবা হোবে। রামলাল গারোলী তার গুরু ঠিকই। শুধু সাপধরা আর সাপ খেলাই শেখে নি রূপা তার কাছ থেকে শিখেছে আরো অনেক কিছু। সাপ ধরো, রামলাল শেখাত, লোহার শিক গরম কর‍্যা ধরো তার মুখোৎ, সাপ তার স্বভাবদোষে খুবলাবে সি গরম শিক। একবার, দুবার, পাঁচবার তাবাদে? তাবাদে তার মুখোৎ খ্যাংড়ার কাটি ধরো, মুখ ঘুরায়ে লিবে সি। ইবার তুমি সি ছাই-পাশ দি তাবিজ বানাও, মাদুলি বানাও, মানষি কেনবে।

আকালু বলে, বাপ তোর বেপসাটা ভালই শিখ্যেছে।

—ব্যাপসা ক্যান? অযুদের দাম লাগিচ্ছে না, খালি মাদুলি।

—ই রে শারিবা, এক সিকার মাদুলি বারো আনা। মানুষ অংকা বোকা লয়, বুঝে সোবই।

—তবি লেয় ক্যান্?

—লেয় সাপের ডরে। যাক্ মানুষ যত ডরায়, তাক্ মানুষ তত দেখবা চায়। সাপের চ্যায়ড়ার দিকি তাকা, চোখ ফেরাবা পারবু না। কি চিকন কালা দ্যাহখান! মাজা তুল্যে ব্যামন দাঁড়ায়, চোখ তাঁকায়া দেখ জানওয়ারটাক্—কেমন রাজা রাজা দেখায়। লয়?

—সিটা ঠিকোই। তবি বাপের অযুদের কুনো গুণ লাই?

—বাপকে শুধা।

শুধোতে হয় না। সাপের আকর্ষণ মানুষের কাছে তীব্র। সে আকর্ষণ শারিবাও এড়াতে পারে না। কাজেই রূপা যখন তাকে বলে, সাপ ধরাটা শিখ্যে লে, সে এগিয়ে আসে। তারপর রূপা তাকে প্রথমেই সাপের গতিপ্রকৃতি বোঝায়, মাথা হেলানোর অর্থ বোঝায়, আঘাতের তীব্রতার মাত্রা বোঝায়। রূপা বোঝায় আর শরমী হাতে কলমে দেখায়, ই দেখ বাবু, ভাল করি নজর ক'র দেখ, উরাৎ পাশে হিলালে সাপ কি করে আর উপর-নিচ হিলালে সাপ কি করে। ই দেখ বাবু, সাপ ক্যান্ গলা ফুলায়, না, দম ল্যায়, দম ভরে বুকোৎ, ইবার পুরা মার মারবে, পুরা জোরের মার।

রূপা বলে, সোরন রাখ শারিবা, একহাত খাড়া মাজা তো হাড় হাততক্ পুরা বিষ ঢালবে, দুহাত ফণা উঁচা তো তিনহাত তক পুরা খুবলাবে।

– তবি উ তাবিজ গাছরা কুন্ কামে লাগে ?

রূপা হাঁ ক'রে থাকে, শরমী খিলখিল ক'রে হাসে।

– ওলা তোর জন্যি লয়, ওলা যারা সাপ লাচায় তাদের জন্যি লয়, বাপ। যারা সাপ দেখলি বিশ হাত দূরে পলাবে, ওলা তার জন্যি।

শারিবা সাপ নাড়াচাড়া করতে শেখে, নাচানো শেখে, ধরা শেখে। রূপা পুরো বাজিকর মহল্লায় একটা নতুন আলোড়ন আনে। পয়সা রোজগারের নানান ফন্দি ফিকির খোঁজে বাজিকরেরা। আজুরা মণ্ডলের জমি খালাস হয়। শাজাদী ইয়াসিনের ঘরেই থাকে ও সম্ভবত তার শেষ সন্তানের জন্ম দেয়। আজুরার রাখনি নসীবনও পরপর দু'টি সন্তানের জন্ম দেয় ও ক্রমে হতশ্রী হয়ে আজুরার কৃপা হারায়। তবুও তার মহত্ব কীর্তিত হয়, কেননা নতুন খালাসি জমির দু'বিঘা সে নসীবনকে দলিল ক'রে দেয়। সেই শক্তিতে বলীয়ান-নসীবন খুবলাল নামক এক বিগতদার বাজিকরের ঘরে ওঠে।

রূপার পরে পলবি ফিরে আসে। কিন্তু পলবির আর লুঠ হবার মতো চেহারা থাকে না। বিগত সাত আট বছরে সে এত বেশি লুঠ হয়েছে যে এখন আর ছিঁচকে চোরও তার দিকে হাত বাড়াতে রাজি নয়। তার দাম্ভিক যাযাবরী মুখমণ্ডল এখন আর হাসিতে গালে টোল ফেলে না। চোখের চাহনি মুহূর্তেই উচ্ছলতা ছুঁড়ে দেয় না। তার চেহারায় ছিল অসামান্য আকর্ষণ, সহজাত বন্যতা, যার জন্য সে একসময় সদাই সন্ত্রস্ত থাকত। এখন সে নির্ভার।

এই সময়ের মধ্যে সে তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এই সব সন্তানেরা দিগিন মণ্ডলের, মহিমবাবুর, মহিমবাবুর শালা হেলার, না লাল মিয়ার তা সে নির্দিষ্ট ক'রে বলতে পারবে না। বলার প্রয়োজনও আর নেই। কেননা একজনও দু'বছরের বেশি বাঁচে নি শেষপর্যন্ত সে লাল মিয়ার বাড়িতে খলালির কাজ করত। ওখানে থাকার শেষ তিনবছর। খোলাম পরিস্কার করা, ধান ঝাড়া, ধান শুকানো, গোয়াল কাড়া, এসব খলালির কাজ।

তখন দিগিন মণ্ডল ছিল না, মহিমবাবু ছিল না। পাঁচবিবিতে তখন একা লাল মিয়ার রাজত্ব। শান্তাহার রেলস্টেশনের দাঙ্গার পর লালকুঠি লুঠ হয়, মহিমবাবু পালিয়ে বাঁচে। দিগিন মণ্ডল অসম বিনিময়ে এপারে এসে যা জমি পায় তাতে হীনবল হয়ে পড়ে।

—তমো তো সেথা খাবা পাতি। হেথায় আলু ক্যান্?

—ডরে।

—ডর! আর কি ডর?

—সুখী বুড়ি যি মরি গিল হয়।

—তো কি?

—দুদিন গোহালের পাছুৎ মইরে পড়ি ছিল। বাস ছড়াতে সোব্বার খ্যাল হয়।

—ইথে তোর কি?

-হামার?

এর থেকে বেশি আলোড়ন সোহরের বাজিকর পাড়ায় পলবি আর তুলতে পারে না। দু'দিনে সুখী বুড়ির চোখ নাক ছুঁচো আর পিঁপড়েতে খুবলে খেয়েছে। অথচ সুখী ত বিশ বছর চৌধুরী বাড়িতে খলালির কাজ করেছে।

—হেথায় খাবি কি?

—ক্যান্ কাজ কইরে খামো।

অথচ পলবি জীবনটাকে বাঁধাবার কথা কি মনেও ভাবে না? বাজিকর পাড়ায়

একজন পুরুষও কি সে পাবে না? কিছুদিন স্বস্তিতে থাকলে কি সে পুরনো দিনের এমন কিছুই ফিরে পাবে না? এখন নসীবনকেও তার ঈর্ষা হয়, যে নসীবন তার দ্বিগুণ বয়সী এক পুরুষমানুষের ঘর করে। যে নসীবন তার নিজস্ব দু'টি জারজ ছাড়াও আরো তিনটি কংকালসার মনুষ্য সন্তানকে সামলায়।

ফলে কয়েকমাসের মধ্যেই সে বাজিকর পাড়ায় সমস্যা সৃষ্টি করে। তার মানসিক জগতে শনিবারের ভূমিকম্পের থেকেও জোরালো কোনো ভূমিকম্প মারাত্মক ভাঙচুর ক'রে দিয়ে গেছে। বিপর্যস্ত জীবনকে আবার যাহোক কিছু একটা গ্রহণযোগ্য পরিণতিতে আনতে সে শ্লীলতা, শিষ্টাচার ও বচারের মধ্যে রাখে না। বিপর্যস্ত বিচারবোধে বাজিকর পাড়ার কোনো সমর্থ পুরুষমানুষই তার আহ্বান থেকে বাদ যায় না, এমন কি আকালুও নয়, এমনকি সামর্থ্য যার প্রান্তিক সীমায়, এমন মানুষও নয়।

পুরুষেরা প্রথমে সহানুভূতিতে তারপর বিরক্তিতে তাকে এড়িয়ে যায়। মেয়েরা প্রথমে তার দুঃখে সহমর্মিতা বোধ করত, তারপর তাকে রসিকতা করত, শেষপর্যন্ত তাকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দেওয়া শুরু করল।

পলবি শাজাদীকে ধরে, তুমার ব্যাটাক বল হামাক্ বিহা করবা।

আচমকা এরকম প্রস্তাবে শাজাদী একটু হকচকিয়ে যায়। তারপর বলে, তুই-ই বল।

—হামার নাজ নাগে।

—কেন্তু শারিবা তোর ছোটই হবে, লয়?

—য়েঃ, অত্তোবড় যেঁয়া!

—হামি বয়সের কথা ক'ছি, পলবি।

—ছোট হোবে নাঃ, সোমান সোমানই হোবে।

—ইটা কি হামার বলা ঠিক? ছাওয়াল যুঁয়া হইছে না?

—ছাওয়াল তুমার, তুমু ছাড়া ক'বে ক্যায়?

—ঠিক আছে, ছাওয়ালের বাপেক্ বলি দেখম'।

তখনকার মতো নিষ্কৃতি পায় শাজাদী। সেদিন বিকেলেই সে রূপার বাড়িতে আসে।

—শারিবার বাপ ঘরেৎ আছে?

শরমী খেজুর পাতার চাটাই বিছায়।

—বসেক্ দিদি, বসেক্।

—শাজাদী বসে। বলে, না বুন, বসার সোমায় নাই হামার। সিদ্ধ ধান শুকাচ্ছে হামার, কুটবা হোবে। রূপা এলে সোজাসুজি শাজাদী তার মুখের দিকে তাকায় না। একটু পাশ হয়ে থাকে। বলে, এত্তোদিন তো ঘুরি বাড়ালে বাজিকর, ছাওয়াল হামি পালনো।

—ঘুরি বাড়াই নাই, শারিবার মাও, পালাই বাড়ছি।

—হঁ, সিতো দেখবাই পাছি। একা পালাই বাড়ানোতে জুৎ হছিল না, তাই কার ঘরেৎ সিদ কাট চিড়িয়া ভাগালেন আর দোকা হলেন হয়।

রূপা বলে, ই দেখেন, ই দেখেন, এলা কথা এখুন আবার ক্যান। ছাবাল কুন্ঠি বা আছে। ইসোব কথা কানেৎ গেলে শরম যাবি।

—হঁ, ছাবাল শরম যায় যাক্, বাপের শরম না গেলেই হয়, লিলাজ বাজিকর!

হাটে মেলায় যে রূপা অমন লম্বা বক্তৃতা করে, এখন একেবারে কোণঠাসা হয়ে যায়। শরমী খালি হাসে। রূপা বলে, এই দেখেন, মেয়া মানষির মুখেৎ আগল নাই।

—তো সি যাক্, এখুন কথাটা কি শুনি?

—ছাবালের বিহা দিবার হোবে না? না সিটাও হামি দেখম'?

—হঁ তো, সিটা তো ঠিকোই। তো নওরি দেখ।

—নওরি হামি দেখম' আর লতুন 'বিয়ের' ঘরেৎ তুলবা তুমু বাজিকর? লতুন 'বিয়ের' তুমার সেবা কইরবে, যতন কইরবে, তুমু কোলেৎ শোকর' লাচাবা, লয়? বাজিকর এমুন স্বার্থবাদী হয় বটে!

- না, না, হামরা সোব্বাই খোজম'।

—কুনঠি? বাজিকরের ঘরেৎ মেয়া নাই। যি ক'টা আইবুড়া আছে তারাদের মাও-বাপ আগভাগেই বেটার বাপদের সাথ কথা করি রাখিছ। তাবাদে আরো পাঁচটা আবিয়াৎ য়ুঁয়া আছে, তার মাঝে হামার শারিবা এটা। ইয়াদের নওরি কুনঠি জুটবে? ইসোব হিসেব হামার করা সারা।

—তবি তো ভারি গোল!

—ই গোলের লিদান হামি দিম'? ছাবালের যতোদিন মাও ছিল, ছিল। মাও গেল তো বাপ আলো তালুই হ'য়া। শারিবার কপালেৎ বুঝি আর নওরি জুটল না, হায়!

—হঃ ভারি হামার বুঝদার হছেন। মেয়ার আবার অভাব! এমুন য়ুঁয়া বেটা হামার বিটিগুলা হামলাছে—

—মুখেৎ আগল আঁটেন, বাজিকর। কথা যিটা বলনো, খ্যাল রাখেন আর সর্দারের সাথ শলা করেন।

—ই ক'বছর বাজিকর পাড়ায় বিটি ছাবালের মড়ক চইলছে। অনেকগুলা মেয়া এধার ওধার হোই গিছে। হিঁদু সমাজ হামরাদের লেয় না, মুছলমান সমাজও হামরাদের লেয় না। কুন্ঠি যাম' হামরা? ইসব কথা এখুন ভাবা করেন, বাজিকর।

ওঠার আগে শাজাদী শরমীকে বলে, তুমাক্ এটা কথা বলি যাই, বুন। পলবি আবাগী বড় ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রবা লাগিছে। ছাবালের খোরৎ ওক্ আগুবা দিবানা।

মোহর গ্রামে চার ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ, ছয় ঘর কায়েত, নতুন বসতির বাজিকররা বাদ দিলে বাকিরা সদগোপ, মাহিষ্য ও কৈবর্ত। কৈবর্তদের মধ্যে আবার দুই ভাগ আছে, একদল হালুয়া, অন্যদল জালুয়া। একমাত্র জালুয়া কৈবর্তরাই 'জলচল' নয়। অবশ্য বাজিকরদের বিষয় একেবারেই স্বতন্ত্র। মোহরের পাশের বাদা-কিসমৎ নমোশূদ্র ও মুসলমানপ্রধান গ্রাম। বাজিকরদের বসতি এই দুই গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায়, দুই গ্রামেরই প্রত্যন্তে। নমোশূদ্ররাও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে জলচল নয়, কিন্তু বাদা-কিসমতের ভৈরব মণ্ডল ইত্যাদি কয়েকজন নমোশূদ্র বেশ বর্ধিষ্ণু এবং দাম্ভিক। ভৈরবের বা ভায়রোর কয়েক পুরুষের রেহানী কারবার, এখনো তেজী। ভায়রো এখনো ঘোড়ায় চড়ে মহালে যায়।

চার ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে তিন ঘরই বর্তমানে ভূস্বামী। চার ঘরই এখানে ভাগ্যান্বেষী হয়ে এসেছিল। মাত্র এক ঘর এখনো যজমানী করে, অন্য তিন ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ। সবারই সম্পদের উৎস যজমানী এবং সুদের কারবার।

এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই আছে কয়েক ঘর ক'রে সাওঁতাল কিংবা ওরাওঁ বসতি।

এই বিন্যাসে যে যার নিজস্ব বৃত্তে থাকে। ব্রাহ্মণ ও কায়েতরা যেহেতু সংখ্যায় কম, কাজেই অন্যদের সঙ্গে সামাজিক বিরোধ এড়িয়ে চলে। সবচেয়ে শক্তিশালী ভায়রো তার সমাজের বাইশ 'দিগর'-এর মাথা। দিগরের মজলিশ কিংবা জমায়েতে সে এখনো বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করে। বল্লাল হামরাদের জাত মারি রাখি গিইছে। হামরা তো জাত-মরা ছিলাম না। বল্লাল হামরাদের সাথ আঁটবা পারছিল না, তাই জাতে মারে। শোনা যায় তার পাঁচ হাজার বিঘা জমি। অবশ্যই তার সম্পদের মূলে মাথা হিসাবে এই বাইশ দিগর ও তার বাইরের নমোশূদ্রদের শোষণ। কিন্তু জাত প্রীতি তাকে তার দিগরের সঙ্গে একাত্ম রাখে ও সম্প্রদায়ের মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখে। নমোশূদ্র হিসাবে হীনমন্যতা নেই। সে কারণেই আরো অনেকের মতো সে 'সরকার' কিংবা 'দাস' হয় নি, এখনো মণ্ডলই আছে। অবশ্য মণ্ডল থাকার একটা সুবিধা এই, জলচল মাহিষ্যদের থেকে অজানা লোক পৃথক করতে পারে না।

ওমর নামে বাজিকরদের একটি তরুণের সঙ্গে নমোশূদ্র পাড়ার মালতী নামে একটি মেয়ের গোপন প্রণয় হয়। অবশেষে যুগলে পালায়, কেননা তাদের সামনে স্বাভাবিক পরিণতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। নমোশূদ্র যুবকেরা বাজিকর পাড়া তছনছ করে এবং শেষপর্যন্ত মালতীকে না পেয়ে ইয়াসিনকে ধরে নিয়ে আসে ভায়রোর কাছে।

ভায়রোর সমাজ যদিও 'জলচল' তবুও তার বিরাট বিস্তৃতি আছে। কাজেই ঠিক মহিমবাবু কিংবা লাল মিয়াঁর মতোই সেও জানতে চায়, তোমরা হিঁদু না মুছলমান। সেই পুরনো প্রশ্ন। সেই প্রশ্ন, যাকে বাজিকর সিঁদুরে মেঘের মতো ভয় পায়।

ভায়রো আবার বলে, তুমার ঘরের এটা ছেড়া হামার ঘরের এটা ছেড়িক্ নিয়া পালাবা পারে, ইকে বয়সের দোষ, কি, বয়সের গুণই কবা পার। কেন্তু সিটা কথা লয়, বড় কথাডা হল, তুমরা হিঁদু না মুসলমান?

এ প্রশ্নের উত্তর বাজিকর দশ বছর আগেও দিতে পারে নি, এখনো পারে না। ইয়াসিন চুপ ক'রে থাকে।

ভায়রোই আবার বলে, কোন বল্লাল তুমাদের জাত মারোছে, হামার জানা নাই। তবি মারগা বড কঠিন বটে।

ইয়াসিন জানত, নমোশূদ্র উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে বেজাত। সে শেষপর্যন্ত একটা মূর্খের মতো আবেদন করে, হামরাদেব আপনার জাতে তুল্য লেন, মালিক। শুন্যাছি আপুনি দিগরের মালিক। সমাজ আপনার কথা শোনবে।

ভায়রো প্রচুর হাসে। বলে, বাইশ দিগব হামাক্ নমোশুদদুর বানাবার হক্ দেয় নাই বাজিকর। হিন্দুধর্মে এমুন হক্ কেরো নাই। তুমু বাম্মণ, কায়েৎ, মাহিষ্য, সদগোপ, নমোশুদদুর কেছুই হবা পারবা না। তুমু ইসব জাতের হয়া জম্মাবা পার, হবা পাবো না।

ইয়াসিনের সঙ্গে বাজিকর পাড়ার কয়েকজনও এসেছিল কর্তব্যের খাতিরে। তাদের মধ্য থেকে শারিবা এগিয়ে এসে বলে, সবই তো বোঝনো, মালিক। এখুন বিচারটা করবা হয়।

ভায়রো লঘু পরিহাস ছেড়ে তার দিগরের নেতৃত্বের ভূমিকায় মুহূর্তেই ফিরে আসে। গলা চড়িয়ে বলে, বিচার হামার করাই আছে। মেয়াক খুঁজি আনা করাও আর উ মেয়ার বিহার যা খরচা লাইগবে, তা উ বাজিকরের বেটাক্ জরিমানা দিবার হোবে।

কথা বলে লাভ নেই। তবুও শারিবা বলে, মালিক, বাজিকর নেংটা গরীব। ভিখমেঙ্গে খায়। অত্তো টাকা কুনঠি পাবে? ইবারটা মাপ করি দেন।

- টাকা দিবে আজুরা মণ্ডল। সি তো তুমাদের বসত্ করাইছে। তবি কি কড়ারে দিবে সিটা তার সাথ বুঝ কর।

কি সর্তে আজুরা টাকা দেবে, তা জানে শারিবা। জানে অন্য সব বাজিকরেরাও। মুখ নিচু ক'রে ফিরে আসে সবাই। শেষ চেষ্টা, আজুরা যদি মধ্যস্থতা করে ভায়রোর সঙ্গে।

কিন্তু আজুরা তাতে রাজি হয় না। ভায়রো সর্দারকে সে ভালোমতোই চেনে, ভয়ও পায়। আর তাতে তার লাভই বা কি?

দিন সাতেক পরে রাতের অন্ধকারে ওমর শারিবার কাছে আসে।

—শারিব', হামাক বাঁচা।

শারিবা চুপ ক'রে থাকে।

আকালু বলে, তুমার বাঁচন নাই।

—শারিবা, হামরাক্ বাঁচা।

এবার শারিবা চোখ তুলে তাকায়।

—মেয়াটা ফিরোৎ যাবি না ?

—না শারিবা, না !

—তোর সাথ থাকবি ?

—মাইরে ফালালেও মালতী ফিরোৎ যাবি না।

—ভায়রো অ'কা হোবার দিবি না। ভায়রো তোর লাহাশ ফে'ল দিবি।

আকালু বলে, ভায়রোর জাতের অহংকার বড় ভোয়ানক !

দিগরপতি ভায়রো নিজের জাতের মধ্যে কোনো বেচাল সহ্য করবে না। দিগরের বিশাল অঞ্চল জুড়ে তার রেহানী কারবার। সুদ আদায়ের ব্যাপারে সে নির্মম, কিন্তু তার সামাজিক অনুশাসনও মানতে হয় তার জাতের প্রত্যেকটি লোককে। শারিবা এ সমস্যার কথা আগে বোঝে নি। মালতীর ফেরত যাওয়া নিয়ে যে সমস্যা দাঁড়াতে পারে, একথা সে চিন্তা করে নি। আছিস কুনঠি !

—দহের ভাঙা নৌকায়।

ওমর ফিসফিস ক'রে বলে। মাইল দু'য়েক পুবে জনহীন প্রান্তরের মধ্যে অনেকখানি অঞ্চলকে ভেঙে বাঁক নিয়েছে পাতালু। পাতালু সেখানে গভীর। জেলেদের দু'খানা ভাঙা নৌকা সেই বাঁকে পড়ে আছে। সাপের ভয়ে মানুষ সেখানে যায় না। ওমর সেখানে লুকিয়ে থাকে মালতীকে নিয়ে !

—খাস কি ?

—একবেলা মাও যায় সুক্‌কে।

—আজ ফেরৎ যা। কাল হামি যাম'।

পরদিন শারিবা ভায়রোর কাছে যায়। অনেকক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয়। কেননা সকালের এ সময়টা ভায়রো বিনোদ সরকারের কাছ থেকে রেহানীর হিসাব বোঝে। হিসাব বোঝা শেষ ক'রে বাইরে আসে সে। হঠাৎ শারিবা ভয় পায়। ভায়রো সর্দারের চেহারাটা বিরাট। লম্বা কাঁচাপাকা চুল পিছনে খোঁপা ক'রে বাঁধা। কপালে লম্বা সিঁদুরের তিলক। চোখের দৃষ্টি এত তীব্র, মনে হয় ভিতর পর্যন্ত দেখে ফেলছে। প্রথম প্রশ্নতেই শারিবা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

—খোঁজ পাওয়া গেছে ?

শারিবা চুপ ক'রে থাকে। ব্যাপারটা সে গোপন রাখতেই মনস্থ করেছিল। কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে এই ভীষণ লোকটা মুহূর্তেই সব কিছু বুঝে ফেলে।

—কুন্‌ঠি আছে ?

শারিবা আরো দুর্বল হয়ে যায়। তার গা ঘামে, হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

—রাও কাড়ে না, ঠসা নাকি ?

ভায়রো গর্জন ক'রে ওঠে। যেন বাঘের সামনে শারিবা, যেন বুদ্ধি নষ্ট শারিবার। সে স্থির হবার চেষ্টা করে। ভায়রোর চোখের দিকে তাকায় চোখ তুলে। চোখ নামায়।

—খোঁজ পাই নাই, মালিক। শারিবা কথাটা বলে একটু সাহস ফিরে পায় যেন। একটু দম নেয়, তারপর আবার বলে, কেস্ত খোঁজ পালেও মুশকিল, মালিক। আজুরা মণ্ডল টাকা দিবার রাজি হছে নাই।

—হা-রা-ম-জা-দা !

ভায়রো চুলের মুঠি ধরে শারিবার। মাটি থেকে টেনে শূন্যে ওঠাতে চায় যেন।

—হারামজাদা, মিছা কথা হামার কাছে !

একটা চড়ে শারিবার মাথার ভেতরের সব কিছু নড়ে যায় যেন। কোথাও মাথার শিরা-উপশিরায় সাপের ছোবল লাগে তার।

—কুনঠি আছে ?

শারিবাকে ছেড়ে দিয়ে দৈত্যের মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ভায়রো। শারিবা এবার সোজাসুজি তাকায়। তার চোখে যাযাবরী হলকা আগুন কাঁপছে।

—হামার জানা নাই, মালিক।

—জানবা হোবে। আজ ছাড়ি দিলাম। দু'দিনের মধ্যে খবর চাই !

শারিবা কয়েক পা পিছিয়ে আসে, তারপর হাঁটতে থাকে। ক্রমশ তার হাঁটা দ্রুত হয়, তারপর সে ছুটতে থাকে। সমস্ত শরীর তার অপমানে জ্বলছিল। সে দিশেহারার মতো দৌড়াচ্ছিল সামনের দিকে। কোথায় যাচ্ছে, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই।

বাদা-কিসমৎ একটি যুক্ত গ্রাম। এর বাদা অংশে নমোশূদ্রদের প্রাধান্য আর কিসমৎ অংশে মুসলমানদের। নমোশূদ্র পাড়ায় যেমন ভায়রোই একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ, মুসলমান পাড়ায় তেমন নয়। সেখানে বেশ কয়েকজন অবস্থাপন্ন গেরস্থ আছে। তার মধ্যে দু'ঘর হাজী। দেশভাগের ফলে বেশ কয়েক ঘর গেরস্থ ওপারে চলে গেছে জমি বদল ক'রে, সেখানে কয়েকঘর হিন্দু এসেছে। এতে মুসলমান পাড়ায় মুসলমান প্রাধান্য কিছুটা কমেছে। ভালো অবস্থার কোনো গেরস্থই দেশ ত্যাগ করে নি। উভয় সম্প্রদায়ের স্মৃতিতে শান্তাহার রেলস্টেশনের দাঙ্গা এখনো গোপন ত্রাস।

কিসমতের হাজী খেসের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। নদীতে ওজু করতে গিয়ে সে শারিবাকে নির্জনে বসে থাকতে দেখে। কায়িক পরিশ্রমে যারা বেঁচে থাকে এরকম আধ্যাত্মিক নির্জনতা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

—কে তুমু, বাপো?

—শারিবা, শারিবা বাজিকর।

—চোখেৎ পানি ক্যান্, বেটা?

চোখের জল এরপরে আর কোনো বাধাই মানে না। হাজী শারিবাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

দেশভাগের পর সমষ্টিগতভাবে মুসলমান এদেশে দুর্বল হয়ে গেছে। উপরন্তু, ওপার থেকে যেসব হিন্দুরা এসেছে তাদের আক্রোশ ও জ্বালা নিভবার কোনো লক্ষণ নেই। উসকানি দেবার লোকের অভাব কোনোদিন কোথাও হয় না। হাজী খেসের সমাজ-প্রধান হিসাবে সদাই শংকিত থাকে। শারিবাকে সে বোঝায়, ইসলামে জাতপাতের বালাই নেই। কাজেই বাজিকর মুসলমান হলে ধর্ম পাবে, সমাজ পাবে, স্বজন পাবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কিবা অর্থ হয়! তুমার বাপকে বল, ইসমাইলোক বল, সবে বুঝ করি রাজি হও তো মৌলভী বুলা করাই, কলমা পড়ার বেবস্থা করি।

একজন বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করলে হজ্জের সমান পুণ্য। কিন্তু হাজী খেসের-এর নজর সেদিকে নয়। স্বজন কমে গেছে, বাড়বে না, কিন্তু স্বধর্মী বাড়বে।

শারিবা বলে, ওমর-মালতীর কলমা পড়াবা পারবেন, হাজীসাহেব?

মালতীর কথায় খেসের বিপন্ন বোধ করে। দিগরপতি ভায়রোর সঙ্গে বিরোধ করতে যাওয়া কোনোমতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মালতী-অপহরণ বৃত্তান্ত এ অঞ্চলে সবাই জানে। তার সঙ্গে ভায়রোর শর্তের কথাও জানে। এসব ব্যাপার ক্রমশ বেশি বেশি ক'রে সম্মানের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ভায়রোর রোখ বাড়ছে। এতক্ষণ

শারিবার সঙ্গে কথা বলে খেসের এসব বুঝতে পারে।

—মালতীকে ছাডবা হোবে, বেটা। তুমরা মুসলমান হল্যো কেরে' কেছু যাবে আসবে না, কেন্তু মালতীর বেলায় সি কথা খাটে না।

—ক্যান্?

তার সোমাজ আছে, নিয়ম আছে।

—হামার নাই!

—দুঃখ করে না, বাপো। নিজের কাছে শুধাও!

ওমবের কাছে যাওয়া হয় না শারিবার। কি আশ্বাস নিয়ে যাবে? খেসেরকে বলে, আপনকার কথা বাপোক্ কমো, সর্দারোক্ কমো।

সন্ধ্যার পর অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে পাডায় ঢোকে শারিবা। শারিবা ভায়রোর কাছে মার খেয়েছে, ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই এখবর চাউর হয়ে যায়। রূপা সহ কয়েকজন তাকে খুজতে বেরিয়েছিল। শারিবা ফিরতে রূপা নির্বাক হয়ে বসে থাকে। শারিবার মুখ নিচু! কতকাল আগে জামির বাজিকর মার খেয়েছিল? পাট খেত নিডানি ঠিকমতো দিতে না পারার জন্য মার খাওযা, মোষের পায়ে চোট দেওয়ার জন্য মার খাওয়ার সঙ্গে আজকের মার খাওয়ার তফাতটা সবাই বুঝতে পারে। তার সঙ্গে যেন একটা অপরাধবোধ ছিল, যা মানুষকে অনেক অত্যাচারও মেনে নিতে সাহায্য করে। আরো ছিল জামিরের রোখ।

সময়ের স্রোত অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে এসেছে। জামির বাজিকরের তৃতীয় পুরুষ শারিবা নিজেকে কখনোই এখন আর যাযাবর ভাবতে পারে না। শ্রমের মধ্যে নিয়োজিত অস্তিত্বকে সে বিপন্ন দেখতে পারে, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে আর ভবঘুরে কল্পনা করতে পারে না।

অন্ধকার আরো গাঢ হলে প্রায় সবাই আসে রূপার অঙিনায়। ইয়াসিন বলে, এমুন দিন এসবে, জানতাম। বুঢাগুলা তো আগেই ব'লি গিছে। তুমার বাপ বলিছিল, বাজিকরের বেটাবা, জানবার হয়ো না। তা ইবার বোধ হয় বাজিকর জানবারই হোই যাবে। একজন তরুণ বলে, ক্যান্? বাজিকরের ধরম নাই! এথো-বড দুনিয়ার বেবাক মানষিকে হয় ভগবান, লয় আল্লা, লয়তো যিশু বানাইছে। তো ই বাজিকরগুলা কি এ'ক। আসমান ফুডা বারাইছে? আরেকজন বলে, বাজিকরের বিটিক্ পাট খাতে চিৎ করা চলে, বাজিকরের বিটিক্ লুঠ করা চলে, ঢেমনী বানাবার চলে, আর বাজিকরের ব্যাটাক্ জামাই করা চলে না।

—আঃ থাম্। শরমের কথাগুলো নিয়া চিল্লাইস না!

—নাঃ চিল্লাবে না, মুক করো্যে থাকবে!

—হাঁ মুক্ করো্যে থাকবু, হারামজাদা। চিল্লায়ে কুত্তি যাবু? মোনেৎ নি, পাঁচবিবি ঠেঙে কুত্তাখেদা কেমন হলু?

শুধু রূপা চুপ ক'রে থাকে। শারিবার গায়ে হাত ব্যাপারটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। তার চোখে রক্ত ঝলসে উঠছে বারবার। আঃ শারিবা, ভায়রো সর্দারোক ছাড়েন নাই! সে মনে মনে এমন চিন্তা করছিল। তার যাযাবর রক্ত তাৎক্ষণিক চরিতার্থতা চাচ্ছিল। পাঁচবিবির রক্তাক্ত স্মৃতিতে সে তর্পণ করছিল এবং তার স্বভাব অনুযায়ী ঘটনার গতি ধরে আগাম চিন্তা করতে সে রাজি ছিল না।

ইয়াসিন এবং তার সমবয়সীরা রূপাকে চেনে। রূপার নির্বাক ছটফটানি তারা দেখে ও শংকিত হয়। পাঁচবিবির দগদগে ঘা এখনো শুকোয় নি।

—রূপা কেছু কতা কও না যি?

—কি কমো?

—দশঝনে বসি এ্যাটা বিহিত কেছু করবা হয়।

—কি বিহিত করবা? ভায়রো সর্দারের সাথ বিবাদ করবা?

—ভায়রোর সঙ্গে বিবাদ! পাগল না হলে একথা কেউ ভাবে না।

—না, বিবাদ লয়—

—তবি কি আশনাই?

এভাবে কথা হয় না। রূপার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ। শারিবা বলে, মামা, খেসের হাজী এ্যাটা কথা কলেন। কথাটা ভাবা লাগে।

— কি কথা, বেটা?

—হিঁদু সামাজ হামরাদের নেবে না, কেন্তু মুছলমান সামাজ নেবার পারে।

—কেম্‌কা?

—কল্‌মা পড়ি মুছলমান হল্যে—

—খবরদার, শারিবা, ওলা কথা মুখেৎ আনবুনা। হামি হিন্দু, হামার ঘরোৎ বিষহরির ঘট আছে, হামার বেটা হয়্যে তুইও হিঁদু।

রূপা ফুঁসে ওঠে। তার অজ্ঞাতবাসের জীবনে সে হিন্দু সঙ্গ করেছে, হিন্দু মেয়েকে নিয়ে এখন ঘর করছে। তার সংস্কারের মধ্যে হিন্দুত্ব ঢুকে গেছে। সে বিষহরির গান গায়, ঘট পূজা করে, রাজবংশীদের কালীপূজা এবং গম্ভীরার উৎসবে যোগদান করে। শারিবা চুপ ক'রে থাকে।

কিন্তু ইয়াসিন বলে, ক্যান্, মুছলমান হল্যে দোষ কি। তমো এ্যাটা কোট ধরা থাকে। 'শালো বাজিকর, শালো বেজাত' আর শোনবা হবু না। বেটাবিটিগুলা বিহার ঘর পাবু, হামরা পামো সমাজ।

—এতো সস্তা লয়, এতো সস্তা লয়!

—লয় সস্তা তো, আক্রাই হয়্যলো। কেরমে কেরমে হোবে। মুছলমানের ঘরে ঝামেলা কম, বাছবিচার কম। হামারদের পড়তা হোবে।

বাদবিতণ্ডা এবং কোলাহল শুরু হয়। কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে। ভিড়ের মধ্যে কখন একসময় ওমর এসে স্থান নিয়েছে কেউ টের পায় নি। সে বলে, হামার কি

হোবে, ইয়াসিন চাচা ? হামি তো মর্‌য়ো গেলাম। কেউ একজন তাকে উপদেশ দেয়, তুই মোছলমান হোই যা, ওমর। তবি ভায়রো আর তোক্ ছোবার পারবু না।

—আর মালতী ?

—তাক্‌ও মোছলমান বানা।

শারিবা বলে, সিটা হোবার লয়। বাজিকর মোছলমান হোবার পারে, মালতী পারে না।

—ক্যান্ ?

—আঃ হা!

—তবি ?

—নাজবাব।

—তবি হামি কি করমো ? পাঁচঝনা হামাক্ বাতায়া দ্যান্। পালায়া হামি কতদিন বাঁচমো ? কি খামো ? কুথা যামো ? কি আফশোস। যে সমাজে কোনো বন্ধন নেই, সেখানে কে কার দায়িত্ব নেয় ? যে যার নিজের জ্বালায় জ্বলছে অহর্নিশ, অন্যের হেপা কে সামলায় ?

—ক্যায় কইছিল তুমাক্ হিঁদুর মেয়ার সাথ পিরিত করবা ? শালো হারামজাদ, নিজে ম'লি, হামরাদেরও মজালি !

—ক্যান, কি খারাপটা করুলু হাম ?

—খারাপটা করো নাই শুযারের বাচ্ছা, বাজিকরের ঝন্যি দোতলা দালান বাড়ি বানাবার বেবস্থা করিছ।

চড়ের শব্দ, চিৎকার। ওমরের ভাঙা গলায় আক্ষেপ।

—তুমরা হামাক্ তাড়ায়া দিবার চাছেন, চাচা ? কুন্‌ঠি যামো হামি ?

—যিথায় খুশি সিথায় যাও। মোহরের ই বসতিৎ আগুন জ্বলবার আগে ভাইগে যাও।

—হাঁ ভাইগে যাও, হামরা তুমার খিদমৎ করবা পারমো না। এক উপা বাজিকরের মদ্দানিৎ পাঁচবিবির বাস উঠল হয়, কোত্তোগুলা পরাণ গেল, আর লয়, আর পারমো না।

—তোর পাও ধরি চাচা, হামাক্ মার। করিস না। হেই শারিবা হামাক্ বাঁচা।

—বাঁচামো তুমাক্ ? হারামজাদ, হিঁদুর নাং পুষার সখ হইছে তুমার !

অন্ধকারের মধ্যে প্রহারের শব্দ। ওমরের আর্তনাদ। সব মিলিয়ে সবাই বুঝতে পারে ওমর সত্যিই কতখানি সর্বনাশ ঘনিয়ে এনেছে। বুঝবার বয়সের সবার স্মৃতিতেই পাঁচবিবি এখনো জীবন্ত। আর একবার নয়, আরেকবার কিছুতেই নয়। কয়েকজন নির্মম হয়ে ওঠে, অন্যরা নির্বাক হয়ে থাকে, বাধা দেয় না ওমর মার খায়। শারিবা তুই হামাক্ বাঁচাবু বলিছিলি। তুই হামাক্ দেখলু না। শারিবা মুখ নিচু ক'রে থাকে। ওমর অন্ধকারের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যায়।

ওমর চলে যেতে একটা স্তব্ধতা নামে, একটা লজ্জা ও বিষাদের স্তব্ধতা। শুধু একজন রমণী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে, সে ওমরের মা। একে একে সবাই চলে যায়। অন্ধকারের মধ্যে শারিবা আচমকা রূপাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে। রূপা দ্রুত শারিবার কাছে আসে।

– তুই মোছলমান হবি ?

– কেছু ভাবি নাই।

– ভাবার দোরকার নাই।

– ভাবার দোরকার আছে, বাপ।

—না !

– বাপ, আর কুনঠি পালাবু ?

– আঃ !

– বাপ ?

– ভায়রো সর্দার তোর গায়েৎ হাত দিছে ! ভায়রো সর্দার উপা বাজিকরকে চিনে না !

– বাপ !

রূপা দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে যায়। শারিবা শংকিত হয়। রূপাকে সে চেনে। সে অত্যন্ত অস্থির রক্তের মানুষ। ভয়ংকর কিছু না ঘটলে সে স্বাভাবিক হয় না।

অনেক রাতে শারিবা রূপা ও শরমীর দ্বৈতকণ্ঠে বিষহরির গান শোনে। দু'জনের কণ্ঠেই নেশার ক্লান্তি। বিষহরির গান বাজিকরেরা গায় না। শুধু রূপা গায়। পলাতক জীবনে নতুন সংস্কার নিয়ে এসেছে রূপা সেই সংস্কারকে সে রক্ষা করতে চায়। শারিবা শুয়ে শুয়ে গান শোনে, যে গান সে কিছুই বোঝে না, তবু ভালো লাগে।

মেনকা বলে ওগো বাপ
বড় পালু মনস্তাপ
কেনে আইলে বেললি ছাড়িয়া,
অমূল্য রতন মোর
ভাসিয়া যায় সাগর—
কি ধন আইলেন বাড়ি লইয়া
তোর যত ধন জন
সপ দেখি অকারণ—
কুড়লে চিরিম তোর নাও,
সুন্দরি বেললি মোর
ভাসিয়া যায় সাগর
ছয় পুত্র মোর নাজুড়া গাও

মৎস্য মকর ঘড়িয়াল
শিশু চরে পালে পাল—
উঠিয়ে মৃত্যু খাইবার আশে,
দেখিয়া বিপরীত
হইবে চমাকত—
পরাণ জাড়ি তবাসে।
বাপের প্রাণ ধন
মাইয়ের জীবন—
ভাইএর প্রাণ সোয়াগিনি
হারাইলাম নিধি
আর পাব কুতি—
চক্ষে বহে মন্দাকিনি।

সব বাজিকর জানে 'রহু চণ্ডালের হাড' কথাটাই ঐন্দ্রিজালিক, বুজরুকি। তবুও সব বাজিকরই এখনো বহু চণ্ডালের হাড়ের স্বপ্ন দেখে মনে মনে ও বিশ্বাস করে তার সার্থক অস্তিত্ব সম্ভব।

রহু চণ্ডালের হাড। তার সঙ্গে সম্পর্ক ঘোর অমাবস্যার। শুধু পীতেম ও জামিরের মতো শারিবা জানে রহুর হাড লুকিয়ে আছে কোনো এক ভূখণ্ডের ফলপ্রসূ মৃত্তিকার গভীরে, যে স্থানটি বাজিকরকে খুঁজে বের করতে হবে। সেই স্থানটি খুঁজে বের করবার জন্যই বাজিকরের এই ভূ-পরিক্রমণ। তার সমস্ত স্থিতি, স্থায়িত্ব, স্বস্তি ও শান্তি হবে সেই ভূখণ্ডে। সব বাজিকর নিজস্ব বোধবুদ্ধিমতো সেই হাড খোঁজে।

কেউ খুঁজে না পেলেও পলবি যেন খুঁজে পায় সেই জিনিস। কয়েক মাসের মধ্যে তার প্রেতিনীর মতো চেহারায় আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। রহুর হাড়ের অদৃশ্য স্পর্শে যেন তার শরীরের হারানো সম্পদ ফিরে আসতে থাকে। এত দ্রুত ও অবিশ্বাস্য নিয়মে সে নিজের রূপ-যৌবনকে ফিরে পায় যে এর পিছনে রহুর ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না।

হাড়ের আসল ভেলকি তার পরে শুরু হয়। যেসব রমণী তাকে পরিহাস করত অথবা মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত, পলবি এখন তাদের স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে খেলা শুরু করে মর্মান্তিক খেলা। বাজিকরের সমাজে জামির যেসব বিধি-বিধান ও শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেছিল, সব যেন তছনছ হয়ে যায়। পলবি তার জীবনের যাবতীয় লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে থাকে তার স্বজনদের উপর। সমর্থ সব পুরুষকে সে আকর্ষণ করে এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা সে রাখতে চায় না।

ফলে ঘরে ঘরে অশান্তির অশ্লীল কলহ বাড়ে। বাজিকর যুবকেরা তার স্থূল ঠোঁট, টোল পড়া গাল, ছোট অথচ তীব্র চোখের মধ্যে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়ার আদিম আহ্বান শোনে। পলবি এখন কলহাস্যে কথা বলে, রাস্তা দিয়ে হাঁটে অস্বাভাবিকভাবে, দু' হাত ও শরীরে দোল দিয়ে প্রকাশ্যেই আহ্বানের কটাক্ষ করে প্রত্যেকটি সমর্থ পুরুষকে।

আকালু বলে, শারিবা, রহু চণ্ডালের হাড়ের ভেলকি দেখিছিস?

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে পলবি হঠাৎ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, লাগ ভেলকি লাগ, চোখে মুখে লাগ, হামাক ছাড়ি সব্বাইকে লাগ।

সে অশ্লীলভাবে হাসে।

আকালু বলে, লাগ্যেছে, হামার লাগ্যেছে। কিন্তু শারিবার যি লাগে না পলবি?

পলবির উচ্ছলতা দপ ক'রে নিবে যায়। বলে, লাগবে আকালু, লাগবে। কেবৃমে কেবৃমে লাগবে।

তেমনি দুর্বিনীত ভঙ্গিতে সে হেঁটে যায়। শারিবা অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

শাজাদী পলবিকে বলে, এলা হ'ছেটা কি ?

—কি হ'ছে ?

—বাপের নাম হাসাছো।

—বাপ ? মানুষে যখন মোক্ লুটে নিল, তখুন বাপ কোন্ঠি আছিল ?

—তা এখুন তো ফিরা আসিছ, এখুন দে'ভাল্ কবে বিহাসাদি কর। না, খালি ঘরে ঘরে অশান্তি লাগাছে !

- ক্যান্, তুমার বেটার সাথ সাদির কথা কছিলাম না ? তখন কি কছিলা ?

—ক্যান ? সাত ঘাটের জল খাওয়া মাগীক্ মোর বেটা বিহা করবা যাবে কোন দুঃখেত্ ?

—তো সাত ঘাটের জল খাওয়া মাগীক্ আর ধম্মের কথা না শোনালেই পার। বাজিকরের মেয়ামানষের আবার লাম্বাচওড়া কথা !

—থাম্ হারামজাদী, থাম্। লয়তো বারুণ দে বারায়ে মুখ ভাইঙ্গে দিমো। নিলজ্জ, বেহায়া মেয়ামানুষ—! আসেক আইজ তোর বাপ—

—বাপ আইসে মোর করবেডা কি ? মুই বাপের খাই, না, প র ? হামাক হামার মত থাকবা দি।

শরমী এবং পলবি প্রায় একবয়সী। সেজন্যই হোক্, অথবা দু'জনেই রূপসী বলে হোক, কিছুটা অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তাদের মধ্যে।

শরমী বলে, খালি চাইথে বেডাছেন, ইবার আন্ কথা ভাবেক।

—আন্ কথা ?

—থিতু হবার কথা।

—দুনিয়ার মানুষে এত্তোকাল হামাক চাখল, এখুন মুই তারাদের ছাইডে দিমো ?

—তো কি করবি ? ঘর ঘর আগুন লাগাবি ?

—তোর ঘরেৎ তো লাগাই নাই।

—সাহস আছে ?

—ডর দেখাস না, শরমী। উপা বাজিকর এখুনো বুড়া হয় নাই।

—হঁ, বাপও যুয়ান, বেটাও জুয়ান্, কাক্ ধর্‌বি ?

শরমী পলবির চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে শারিবা সম্পর্কে পলবির দুর্বলতার কথা অজানা নেই কারো কাছেই।

—হঁ, মোর আর কাম কি ? বাপ বেটা য্যান দুই ভাই, দোনোজনকে ভাতাব।

—বাপরে যদি বা পারিস, বেটাকে পারবি না, পলবি।

পলবি ফোঁস ক'রে ওঠে, ক্যান, শারিবা কোন লবাবের বেটা যি এত হুংকার?

শরমী হাসে। বলে, উয়াক্ ছুবার পারবি না, পলবি। উ আল্‌দা মনিষ্যি।

—ক্যান্, উ আল্‌দা মনিষ্যি ক্যান, শরমী? ক্যান্, উ আর দশটা বাজিকরের মত লয়?

শরমী এবার গম্ভীর হয়ে বলে, শারিবাক লষ্ট করবি না পলবি, শারিবা হামার বেটা।

—ইঃ! বেটা! প্যাটের ছাওয়াল!

—প্যাটের ছাওয়াল লয়, তমো শারিবা হামার বেটা।

—মোর কি দোষ? উ ক্যান হামার পানে তাকায় না? তোরা ক্যান্ হামাকি খেদাস?

এসব কথার পরিষ্কার উত্তর শরমী দিতে পারে না। আবার শারিবার সঙ্গে পলবির সম্পর্কের সম্ভাবনাও সহ্য করতে পারে না। স্বৈরিণী বৃত্তিকে সব মানুষই সম্ভবত ঘৃণা করে। পলবির স্বেচ্ছাচারের খুব বড় কোনো কারণ এই মুহূর্তে ছিল না।

পলবি বলে, কিন্তু শারিবা হামাক এক সময় চাইত।

—মিছা কথা।

—সি তুই জানো না। তখুন তুই বা কোথায় আর মোরাই বা কোথায়?

—পাঁচ বিবি থাকতে?

—হঁ।

—সি সব চ্যাংড়া বয়সের কথা ভুলি যা। এখুন তো চায় না।

—তবি কি করমো হামি; কার কাছেৎ যামো?

এ কথারও কোনো উত্তর নেই শরমীর কাছে। সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দৃঢ়স্বরে বলে, সি হামি জানে না। তবি ইখানে লয়, শারিবার চিন্তা ছাড়ান দেও।

কিন্তু এতেও পলবি আশা ছাড়ে না। ওমরের সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে অন্ধকারে শারিবাকে ধরে সে।

—শারিবা?

—কি বেপার?

শারিবার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত এবং বিপন্ন।

—শারিবা, হামার কি দোষ?

—ই কথা হামাক শুধাও ক্যান্?

—যদি তুমাকেই শুধাই?

—হামার দোষ-গুণের বিচারে কার কি যায় আসে?

—যদি কহি, হামার যায় আসে?

—পথ ছাড়, পলবি। হামার কাম আছে।

—শারিবা, হামার কি দোষ ?

—নিজের কাছেৎ শুধাও।

—মানুষে হামাক্ ছিডা খালো—

—তাই কি তুমু এখন মানুষ ছিডা খাও ?

—পলবিরে ঘিন্না লাগে ?

—না, তবে ভালও লাগে না।

পাশ কাটিয়ে শারিবা চলে যায়। আর সেই থেকে পলবি নিজেকে আড়ালে রাখে। যখন তখন কেউ আর তাকে বাইরে দেখে না। পলবির নির্লজ্জ ব্যবহারও দেখে না কেউ। এই পরিবর্তনে মেয়েদের থেকে পুরুষরাই অবাক হয় বেশি। পলবি যাদের কৃপা করেছিল, তারাই এখন সব থেকে ভয় পায় পলবিকে। কিন্তু যার ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই, সেই আজুরা মণ্ডল বাজিকর পাড়ায় আবার আনাগোনা শুরু করে। কোথাও ফুল ফুটলে তার সৌরভ আজুরার কাছে ঠিকই পৌঁছায়। আর আজুরাকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য বাজিকর-পাড়ার কারো থাকে না। পলবিরও নয়।

ভায়রোর বাইশ দিগর কোলমা ও কাপড়া নমোশূদ্রদের নিয়ে। কোলমা অর্থাৎ যারা লেখাপড়ার কাজ করে এবং কাপড়া, যারা তাঁত বোনার কাজ করে, এই বাইশ দিগরের অন্তর্ভুক্ত। হালুয়া এবং জালুয়া নমোশূদ্ররা এই দিগরের বাইরে, যদিও তারাই সংখ্যায় অধিক। ভায়রোর বাপ দিগম্বর সর্দার অবস্থাপন্ন নমোশূদ্রদের নিয়ে এই আন্দোলন শুরু করে এবং হালুয়া আর জালুয়াদের থেকে নিজেদের পৃথক ক'রে নেয়। ভায়রো জন্মগত অধিকারে দিগরের নেতৃত্ব পায় ও দিগরের অনুশাসন আরো কঠিন ক'রে তোলে। কাপড়া নমোশূদ্রদের মধ্যে যারা ছোট দু'একটি তাঁত চালিয়ে শুধু গামছা তৈরি করে, তারাও এই দিগরের অন্তর্ভুক্তি পায় না। দিগরভুক্ত মানুষেরা কখনো দিগরের বাইরে বৈবাহিক ক্রিয়াকর্ম করে না, দিগর-বহির্ভূত নমোশূদ্রদের সঙ্গে একত্রে পানাহার পর্যন্ত করে না। কিন্তু এইসব হালুয়া ও জালুয়া নমোশূদ্রদেরও দিগরের অনুশাসন, দিগরপতির আদেশ ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। দিগরপতির দেহরক্ষীর কাজ কিংবা দিগরের মর্যাদা রক্ষার জন্য যারা সশস্ত্র বাহিনীর কাজ করে, তারা সবাই দিগর বহির্ভূত নমোশূদ্র। ভায়রো যখন কোনো সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যায়, তখন তার ঘোড়ার দুইপাশে চারজন দেহরক্ষী হাতে বল্লম নিয়ে ছোটে। যখন বসে, দেহরক্ষীরা তার দুইপাশে থাকে। ভায়রো যখন কারো মাথা নামাবার কথা বলে, তখন তার মাথা নেমে যায় এখনো। এখনো ভায়রো সামাজিক বিচারে উপস্থিত হলে ডালিতে ক'রে নজরানা আসে। সে রাজার মতো সম্মান পায়।

অথচ যদু চক্রবর্তী যখন তার কাছে টাকা ধার নিতে আসে, ভিতরে ক্ষোভ থাকলেও ভায়রো তার সামনে আসন গ্রহণ করে না। যদু বলে ভায়রো, ঘর থিকা আইগ্নায় নাইমে দাঁড়াও, আমি এট্টু জল খাই। ভায়রো আঙ্গিনায় নেমে দাঁড়ায়। চক্রবর্তী জল খায়। পুরোহিত বাইশ দিগরের পুজো-পার্বণ করে, কিন্তু ছোঁয়া জল-খায় না। বাইশ দিগরের বাইরের নমোশূদ্রদের বাড়িতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত পুজো করে না। তাদের পুজো-পার্বণ করে দিগরের অন্তর্ভুক্ত মৈত্র, ঘোষাল, চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী নমোশূদ্ররা। তারা উপবীতও ধারণ করে এবং অশুদ্ধ হলেও মন্ত্র উচ্চারণ করে।

সুতরাং ওমর-মালতীর ঘটনা এত সহজে মিটে যায় না। ভায়রোর বাইশ দিগর এখনো জলচল নয়। মোহর, বাদা-কিসমৎ ইত্যাদি গ্রামগুলোতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য নেই বটে, কিন্তু ব্লক হেডকোয়ার্টারের আধা-শহর সোনামেলায় আধিপত্য ব্রাহ্মণদেরই। যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম ব্রাহ্মণদেরই হাতে।

সর্বোপরি সমাজের উপরি-কাঠামোর বিন্যাস সর্বত্রই একরকম। দিগরের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এই উপরি-কাঠামোর অন্তর্ভুক্তি ও স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু দিগর এখনো জলচল হয় নি। মাহিষ্য, এমনকি সদগোপ অপেক্ষাও নমোশূদ্রের সামাজিক স্থিতি এখনো নিচে। সুতরাং ভায়রো কোনো বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

ওমর আর মালতী ভাঙা নৌকা ছেড়ে প্রাচীন এবং পরিত্যক্ত এক মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। ওমরের মা ও শারিবা তাদের খাদ্য যোগান দিত। অনেক চিন্তা করেও ওমরের জন্য কোনো সমাধান খুঁজে পায় নি শারিবা। এইভাবে লুকিয়ে কতদিন বাঁচা যাবে, একথা সবাই চিন্তা করত। কিন্তু অন্য কোনো উপায় কারো জানা ছিল না।

তারপর এক জ্যোৎস্না রাতে ওমর যখন তার প্রেমিকাকে নিয়ে নদীর বালি আর জলে চাঁদের আলো দেখে, আকাশে দূরযাত্রী হাজার হাজার হাঁসের পক্ষধ্বনি শোনে এবং শারিবার জন্য অপেক্ষা করে, তখন শারিবার বদলে চাঁদের আলোয় সে নদীর বালিয়াড়িতে অচেনা ছায়া দেখে। অনেক মানুষের ছায়া। অনেক সশস্ত্র মানুষ। তারা ক্রমশ কাছে আসে। তাদের হাতে পনেরো বিশ হাত লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁকানো চাঁদের আকৃতির কোটা হেঁসো, যা দিয়ে দূর থেকে একটি মোক্ষম টানে ধাবমান মানুষের মুণ্ড ধড় থেকে নিমেষে আলাদা করা যায়, আর যার ব্যবহার ও কৌশল একমাত্র স্থানীয় নমোশূদ্রদের মধ্যেই প্রচলিত।

শারিবা মাত্র পঞ্চাশ হাত দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে। সে থেমে একটা ঝোপের পিছনে আশ্রয় নেয়। আট-দশজন সশস্ত্র মানুষ দ্রুত ওমরকে বূ্যহবন্দী ক'রে ফেলে। ওমরের পিছনে পাতালু নদীর গভীর বাঁওর। তিনদিকে অগ্রসর মানুষ। ওমরের ভয়ার্ত চিৎকার – 'না' এবং আরো কিছু অনুচ্চ স্বরবিকৃতি। তারপর মালতীর চিৎকার। তারপর ওমরের আর্ত চিৎকার ও ছুটে পালাবার চেষ্টা। তারপর ওমরের শেষ চিৎকার এবং তারও পরে ওমরের শেষ আওয়াজ বের হয় নাকের ছিদ্র ও ছিন্ন কণ্ঠনালীর বহির্মুখ থেকে। তারপর দীর্ঘসময় ধরে মালতীর হাহাকার নির্জন নদীতীর, বাঁওর আর সামনের আগাছার জঙ্গলের ভেতরে আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে।

শারিবা চাঁদের আলোয় একজনকে শূন্যে হেঁসো তুলতে দেখে ও বোঝে ওমরের মুণ্ড ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হল। তারপর সেই ব্যক্তি হাত দুলিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল মুণ্ডুটা। শারিবা মুহূর্তের জন্য চাঁদের দিকে ওমরের মুণ্ডুর যাত্রা দেখল। নদীর জলে শব্দ। তারপর দু'জন ঘাতক কবন্ধ ওমরকে দুই হাত ও দুই পায়ে ধরে শূন্যে দুলিয়ে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিল। এবার বেশ জোরে শব্দ। এখন আশ্বিন মাস। পাতালু এখন ভরা, টানও খুব জোর। আধঘণ্টার মধ্যে ওমরের দেহ ও মুণ্ড এক দেশ পার হয়ে অন্য দেশে পৌঁছে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে যাবে, একথা শারিবাও জানে।

মালতী এখন সংজ্ঞাশূন্য ও ভূপাতিত। ঘাতকরা নদীতে নেমে হাত পা দেহ ধোয়। তারপর একজন সংজ্ঞাহীন মালতীকে কাঁধে তুলে নেয়। সবাই চলতে শুরু করে।

৫১

আজুরা মণ্ডলের স্বভাবটা কিছু অদ্ভুত। কিন্তু এখানে কারো চোখেই সেটা বিশেষ লাগে না। প্রচুর জমিজমা আছে অথচ শিক্ষাদীক্ষা কিছু নেই এরকম মানুষের সংখ্যা এ অঞ্চলে কম নয়। এইসব মানুষের জীবনে সম্ভোগের উপকরণও খুব প্রাচীন ও গুটি কয়েক মাত্র। বিরাট ভোজ অর্থাৎ এক বা একাধিক খাসি কেটে লোকজন খাওয়ানো, স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি এবং তার জন্য প্রচুর সময় ও অর্থব্যয়, মদ্যপান আর যাত্রা গান। এর বাইরে ভোগের জীবনের যেসব উপকরণ আছে, আজুরার মতো জোতদারদের কাছে তার কোনো আকর্ষণ নেই। দু'তিনশো একর জমির মালিক আজুরার ঘরবাড়ির সঙ্গে দশ-পনেরো বিঘা জমির মালিকের ঘরবাড়ির তফাত মাঘ ফাল্গুন মাস ছাড়া বোঝা যায় না। ঐ সময় আজুরার বাড়িতে ধানের মরাই-এর সংখ্যা থাকে অনেক, দশ-পনেরো বিঘার মালিকের পক্ষে যা কখনোই সম্ভব নয়। তেমনি পোশাক-আশাক, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচার-আচরণ ইত্যাদি কোনো দিক দিয়েই এই সম্পত্তির ফারাক ধরবার উপায় থাকে না।।

আর ব্যবধান থাকে এইসব ভোগের ব্যাপারে। আজুরার যদি কোনো স্ত্রীলোককে নজরে লাগে ও সে যদি সহজলভ্য হয়, তবে আজুরা সরাসরি তার ঘরেতেই উঠে আসে। একমাস, দেড়মাস সেখানে থাকে, প্রচুর মদ আর চালডাল মুরগা আনায়। বন্ধু-বান্ধবও দু'চারজন জুটে যায়। তাস খেলা হয়। আজুরা এইভাবে একমাস দেড়মাস একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। এই সময় তার গোলার ধান ক্রমান্বয়ে বিক্রি হতে থাকে, ধার বাড়তে থাকে, চাই কি দু'-এক বিঘা জমিও বিক্রি হয়ে যায়। যদি সেই স্ত্রীলোক যথেষ্ট লোভনীয় হয় ও যথেষ্ট টাকা-পয়সা খরচ করেও না পাওয়া যায়, আজুরা নিজের লোকজন দিয়ে সে বাড়িতে ডাকাতি করাবে এবং লুঠ ক'রে নিয়ে আসবে সেই মেয়েকে। গোপন জায়গায় রাখবে, নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করবে।

কিন্তু পলবির ব্যাপারে এত সহজে নিষ্পত্তি হয় না। শারিবার প্রত্যাখ্যানের পর পলবি শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই নিজের চোখে নিজের ক্ষমতার সীমানা সে দেখতে পায়। তার ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের জীবনে সে পুরুষমানুষ কম দেখে নি। কিন্তু গত কয়েক মাসে সে যে অসামান্য স্বাধীনতার স্রোতে গা ভাসিয়েছিল, এখন তাকে তার বিকার মনে হয়। এই কয় মাসের জীবন যেন পাঁচবিবির জীবনের থেকেও ঘৃণ্য। আজুরা মণ্ডলকে প্রতিহত করার ইচ্ছা থাকলেও এখন সে বোঝে, বাজিকর গোষ্ঠীতে সে ক্ষমতা কারোই নেই।

কাজেই সে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে। সে একেবারে শীতল হয়ে যায়। এ জন্য

তাকে চেষ্টাও করতে হয় না। শারিবার প্রত্যাখ্যান তার ভিত্ পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে।

আজুরা তিন দিনে ছ'টা মুরগী আনে, এক বস্তা চাল আনে ও চোলাইয়ের বোতলও আনে গোটা কয়েক। কিন্তু এতেও পলবির চোখে মুখে কোনো উল্লাস সে ফোটাতে পারে না। আজুরা যেহেতু মনে করে মুরগী, চাল ও টাকার বিনিময়ে এসব তার স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্য। না পেয়ে বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে-যায়। এ অত্যন্ত বেয়াদপি তার কাছে।

চতুর্থ দিনেও একই অবস্থা দেখে নেশার ঘোরে পলবির মাজায় একটা লাথি মারে আজুরা।

পলবি নিমেষে জ্বলে ওঠে ও ত্বরিতে উপরের মাচায় আটকানো হেঁসোখানা টেনে নামায়। মুখে কিছু না বলে ভীষণ দৃষ্টিতে আজুরার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে সে। আজুরার ভীষণ মুখ ভীষণতর হয়। সে নড়তে পর্যন্ত সাহস পায় না। মুহূর্তগুলোকে মনে হয় অনন্ত। পলবির চোখের পাতা পড়ে না। তার যাযাবরী রক্তের আগুন ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে ওঠে চোখের তারায়।

খানিকক্ষণ পরে হেঁসো ঘুরিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করে পলবি। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, বারাই যান, মণ্ডল। মায়ামানুষ জানোয়ার লয়। আর কুনোদিন বাজিকর-পাড়ায় সেঁধাবেন না।

আজুরা পলবির হাতের দিকে নজর রেখে দরজা পার হয়। তারপর আর পিছন ফিরে তাকায় না।

এসব ঘটনা কোনোকালেই দীর্ঘস্থায়ী সুফল আনে না। বরং বিপদ আরো বাড়িয়ে তোলে। দিন সাতেক পরে ইয়াসিনকে ডেকে পাঠায় আজুরা। প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে তারপর ঘর থেকে বের হয় সে। ইয়াসিন দেখে আজুরার ভয়ংকর আকৃতির মুখ।

আজুরা বলে, রোডের পাশের জমি গুলান হামি বেইচে দিমো হয়, তুমাদের বসত ইবার তুলবা লাগে।

ইয়াসিন এতটা আশা করে নি। সে ভেবেছিল, আজুরা কিছুটা হম্বিতম্বি করবে, ইয়াসিন ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু সেসবের কোনো সুযোগই থাকে না।

—এত্তোগুলা জীবন নিয়া কুন্ঠি যামো, মালিক?

—সিটা হামার দেখার কথা লয়। দশ দিনের সময় দিলাম। জমির খরিদ্দার ঠিক হইছে, বায়না নায়া হইছে, কেন্তু তুমরা উচ্ছেদ না হলে জমি বেচা যাবে না। কাজিই তুমারদের উচ্ছেদ হবার লাগে।

আবার সেই দিন ক্ষণ তারিখের নির্দেশ বাজিকরের জীবনে যা বড়ই অমোঘ।

ইয়াসিন আজুরার পা ধরতে যায়।

—মালিক, এত্তোগুলা জেবন, বালবাচ্চা, বুঢ়াবুঢ়ি। ক্ষমা দেন, মালিক!

কুন্‌ঠি যামো মালিক ?

পা ধরতে দেয় না আজুরা। সরে সরে যায় বলে, ইসব কথা হামাক্ বলে লাভ নাই। টাকার দরকার, জমি হামার বেচবার হবে।

ইয়াসিনের চোখ থেকে জল গড়ায়।

হাজার বছরের অবহেলিত যাযাবর। সেই প্রাচীন পাপের কথা স্মরণ ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে আজুরার পা ধরার চেষ্টা করে।

—ক্ষমা কইরে দেন মালিক। হারামজাদীরে আমি চুলের গোছা ধইরে আপনার পায়ে আনে ফেলাব। কেবল একটি বার কহেন যি মস্‌করা করোছেন হামার সাথ। কহেন যি, ইয়াসিন মজাক করছিলাম তুমার সাথ।

আজুরা তার খর্বাকৃতি পায়ের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ইসাসিনকে। বলে, অ্যাত্‌ক্ষণ বেবাক মজাক্ আর মসকরা মোনৎ হইল তুমার ? ভাল। কেন্তু সময় ওই দশ দিন। তার মধ্যে যা করার করবা।

আজুরা ভিতরে ঢুকে যায়। ইয়াসিন অনেকক্ষণ বসে থাকে সেখানে। চিৎকার ক'রে বলবার ইচ্ছা হয়, জামির বাজিকর, থিতু হবা না, গেরস্থ হবানা। কি দায় চাপায়া গেলা মোর ঘাড়েৎ ? মোরাদের পাপের যি শ্যাষ নাই !

ওমর খুন হবার পর ওমরের মা পাগল হয়ে যায়। তিন দিন সে ঘরে চুপচাপ বসে ছিল। চতুর্থ দিন বিচিত্র বেশে সে রাস্তায় বের হয়। ঘাগরার মতো কুঁচি দিয়ে শাড়ি জড়ানো তার কোমরে। একটা কাপড়ের বোঁচকা তার পিঠে ঝোলানো। হাতে একখানা ঝাঁটা। দু'পা এগিয়ে আবার সে পিছন ফিরে ঝাঁটা দিয়ে পায়ের দাগ মোছে। ঘন ঘন মাথার উপরে তাকায়, চোখের উপর হাত রেখে। মাঝে মধ্যে হাত ঘুরিয়ে গোল হয়ে নাচে, গান গায় অবোধ্য ভাষায়।

ওমরের মাকে এ অবস্থায় দেখে শারিবা থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বুড়ি তার কাছে দ্রুত আসে। ফিসফিস ক'রে বলে, শারিবা অ্যাটা কথা বলি তোক্ শোন। 'তরক' যখন মাথার উপরে থাকে, তখন মানষের ছেঁয়া মাটিৎ পড়ে না তখনই রাস্তাৎ বেরাবি। তার আগে না। আর সাঁঝ হলে, তখন তো বেবাক আন্ধার হোই যায়, তখন বেরাবি, বুঝলু ?

— ক্যান্, চাচি, ক্যান ?

— আঃ, আহাম্মকটা! না'লে জেতের মানষের গায়েৎ ছেঁয়া পইড়বে না হামাদের ? সিটা বড় অমঙ্গল রে, বেটা।

শারিবার নানির কথা মনে পড়ে। নানি বলত, হামরা তো অছুতের জাত রে, শারিবা। গোরখপুরে হামরা অছুৎ ছিলাম। তার আগেৎ যেথায় ছিলাম, সেথা তো হামারদের ছেঁয়া মারানো পাপ। সেথায় অছুৎ জাতকে রাস্তাৎ যাতে হলে ক্যানেস্তারা বাজায়ে যাতে হয়। লযতো, জেতের মানষের গায়েৎ হাওয়া লাগে, ছেঁয়া লাগে। সি বড় পাপ!

— প প! কার পাপ, নানি ?

— অছুৎদের পাপ।

— ক্যান্ ?

— পাপ নয় ? তারা যি অছুৎ!

— অছুৎ ক্যান ?

— সি-ই যি পাপ! পিত্তি পুরুষের পাপ। তাতেই তারা অছুৎ।

— পিত্তি পুরুষের কি পাপ নানি ?

— জানি না, শারিবা। তুই এখন ঘুম যা।

শারিবা তাকিয়ে দেখে ওমরের মা গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে, গান গাইছে, হাতে তালি দিয়ে তাল দিচ্ছে—

দেও আওয়ে তো দেও রে ভাই

বান্দনা তো সারিমাদে
দেও আওয়ে তো দেও রে ভাই
মাকারানা সারিমাদে
দেও আওয়ে তো দেও রে ভাই
বান্দনা তো সারিমাদে
দেও আওয়ে তো দেও রে ভাই
সাপানারা সারিমাদে।

শারিবার আবার নানির কথা মনে পড়ে। দুই হাতের আঁজলায় যৌতুক দেওয়ার ভঙ্গি করত নানি। এই তোর 'ইওয়া' হইছে রে, শারিবা। ইবার তোর 'নওরিক্' হালদি মাথামু—।

শারিবা আর সহ্য করতে পারে না। দ্রুত সেখান থেকে সরে যায়। ইয়াসিনকে নিয়ে হাজীর কাছে যেতে হবে। পরামর্শ ক'রে এর থেকে বেশি কিছু আর মাথায় আসে নি কারো। তবু ঐ একটা মানুষ তাদের কিছু অন্য কথা বলেছিল।

আজুরা মণ্ডলের দশ দিনের তিন দিন পার হয়ে গেছে। সমস্ত লোক তাকিয়ে আছে ইয়াসিনের দিকে, শারিবার দিকে। রূপা-শরমা সাপের ঝাঁপি নিয়ে বেরিয়েছে মাসখানেক হল। শীত নামার আগেই তাদের ফিরে আসার কথা। হয়ত, দু'-এক দিনের মধ্যেই তারা ফিরে আসবে।

হাজী বলে, বসো ইয়াসিন মণ্ডল। বসেক শারিবা। ইসব কথা তো হামি জানতামই। আজুরা মণ্ডলরে তো আইজ লতুন চিনি না। কথাডা আরো একবার চিন্তা করেন তুমরা। মোছলমানের সাথই তুমাদের মিল বেশি। নাম হয় ইয়াসিন, জামির, ওমর। খাদ্যাখাদ্যে হিদুঁর সাথ মেলে না। গরুর গোস্ত খাও। হঁ, হারামও খাও বটে, তবি সিটা শুদ্ধ করি লওয়া যাবে। আবার দেখ, মরার পরে হামার যা তুমারও তা। সিই সাড়ে তিন হাত মাটি। নাই বা থাক কাফনের কাপড়, নাইবা রইল মোল্লা, নাইবা করলা কব্বরের নিচে বাঁশের মাচান, তবু গোর তো বটে, আগুনের সাথ তো সম্পক্ক নাই। ইবার বুম করে অ্যাটা কোট ধইরে লেও। বাঁচাবার বুদ্ধি অ্যাটা বার হোবেই।

ইয়াসিন বলে, সিগ্‌লা তো পরের চিন্তা, হাজী সাহেব। ইদিকে যে দশ দিনের কড়ার পার হয়। মাগ, ছোল পোল, বুঢ়া বুড়ি নি যামো কুনঠি?

তাদের কথার মাঝখানে আরেক ব্যক্তি এসে বসেছিল। সে ব্যক্তি সোনা মিয়াঁ নামে এ অঞ্চলে পরিচিত। বাজিকরদের সাথে তার যোগাযোগের কোনো কারণ নেই। কেননা, সোনা মিয়াঁ এ অঞ্চলের তশীলদার। যারা পরের জমিতে বাস করে—তশীলদারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকে না। এতক্ষণ শুনে সে উৎসাহিত হয়।

হাজী সাহেবের পাকা মাথার তারিফ করে মনে মনে। প্রকাশ্যে বলে, কেন্তু বেপারটা কি ? তুমাদের উচ্ছেদ করে ক্যে ?

— আজুরা মণ্ডল।

— কেংকা ?

— তার জমিতে যি বসৎ করি, সাহেব ?

— তার জমি ? বলিছে বুঝি ?

- তার লয় ?

— তারও বটে, আবার তার লয়ও বটে।

— হেথলি রাখেক, সোনা মিয়ঁা। এটু পস্কের করে ক'ন। — এবার হাজী সাহেবও উত্তেজিত হয়।

— আবি, তবি আর কই কি! ড জমি বেবাক ভেস্ট। বেবাক সবকারী জমি হোই গিছে।

— তোবা তোবা। এমুন খবরটা অ্যাৎক্ষণ চ'পি রাখে দম ফাটাছেন। তবিই দেখো শারিবা, আল্লা কত মেহেরবান।

ইযাসিন বিষয়টা পরিস্কার বুঝতে পারে না। সে আবেগে কাঁপতে থাকে।

— পস্কের করি কহেন, মিয়ঁা সাহেব। ঠিক বুঝা পারি না। সরকারে ভেস্ মানে কি ?

— সরকারে ভেস্ট মানে সবকাবে ভেস্ট। উ জমিতে আজুবা মণ্ডলের আর মালিকানা নাই। উ জমি এখন সবকারের।

— তবি তো সরকারে হামারদের উচ্ছেদ করবে!

— পাগল! হামি আছি না ?

তারপর বুদ্ধি পরামর্শ হয় হাজী সাহেব ও সোনা মিয়ঁার মধ্যে। যত শিগগির পারা যায় দাগ খতিয়ান দেখে প্রতি বাজিকর পরিবারের নামে একটা ক'রে খাজনার রসিদ কেটে দেবে সোনা মিয়ঁা। হাজী বলে, দেখো মিয়ঁা, নেংটা গরীব সব। গলা কাটবা পারবা না তুমরা। ঘর প্রতি দশ দশ টাকা দিবে। তাও কম হবে না, একশতু বাইশ ঘর আছে। ওই দিয়া সাহেব আর আপিস তুষ্ট করবা। ফির, ই কথাটাও মোনৎ রাখেক, ইয়ারা বেবাক আল্লার পেজা হবার যাচ্ছেন।

সোনা মিয়ঁা বলে, ঠিক আছে, কথা দিলাম। সাত দিনের মধ্যে বেবাক কাম শেষ করমো। আর ইয়াসিন মণ্ডল, তুমরা আরেক কাম করেন। কালই থানায় যান, অ্যাটা ডাইরি করেন যি, ভেস্ট জমি থিকা আজুরা মণ্ডল তুমাদের বলপূর্বক উচ্ছেদ করবা চাছে, ভয় দেখাছে, তারসাছে, ইসব।

— থানাৎ যামো!

ইয়াসিনের মনে পড়ে অনেক কাল আগের রাজশাহীর থানা, জামিয়ের বিচার ও জেল, সেই ভীতি।

— ক্যান্, ভয় কিসের ?

— ভয় লয় !

— আরি, সদরোৎ তো আসেন, হামি আছি না ?

শারিবা ধীরে ধীরে বিষয়গুলো বুঝবার চেষ্টা করে। জমি-জমার বৃত্তান্ত খুবই জটিল, এই ব্যক্তি সেই জটিল জগতের একজন। ইয়াসিন কিছুই বোঝে না, তাই সব কিছু জেনে বুঝে নিতে চায় একবারেই।

সে বলে, কিন্তু খাজনার অসিদে হামরার কি হবে, সাহেব ?

- আরি, খাজনার অসিদ হইল চেক। চেক-ফড়ক্ ইসব বুঝা আছে ?

না, সাহেব।

— চেক কাটলা এর মানে হইল, তুমার নামেৎ সরকারী জমা হইল, তাথে তুমার দাবি হইল।

— জমি সরকারের, তবি হামার দাবি কেংকা হয় ?

— আরি আহাম্মক, সরকার ওই জমির পত্তনি দিবে তো, এখুন তুমার নামে চেক-ফড়ক থাকলে, আর তুমার দখল বলবৎ থাকলে পাট্টার দাবি তুমার আগে। তখুন তোমাক্ উচ্ছেদ করে কোন্ –

অনেক নতুন শব্দ শোনে তারা, বোঝে বা বোঝার চেষ্টা করে অনেক নতুন বিষয়ের। দখল, উচ্ছেদ, বলবৎ, চেক-ফড়ক্, পাট্টা, এইসব শব্দ এই দুই বাজিকরই প্রথম শোনে। এখন পর্যন্ত অন্য কোনো বাজিকরের সৌভাগ্য হয় নি এসব শোনার বা এইসব জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তা করার।

হাজী সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসেই তারা রাস্তা তৈরি করার রোলারের শব্দ শোনে, একটানা ঘরঘর শব্দ। ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা এখন পি. ডবলিউ. ডি-র রাস্তা হয়ে গেছে। যে রাস্তার পাশে বাজিকরদের বসতি, সেই রাস্তা পাকা হচ্ছে। সদর শহর থেকে রাস্তা বেরিয়ে সোজা এগিয়ে আসছে। এখন বাজিকর পাড়ার কোনো উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে মাইল খানেক দূরেই কালো ফিতের মত পীচের রাস্তা দেখা যায়। এই রাস্তায় নাকি মোটর-বাসও চলবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা পি. ডবলিউ. ডি-র হাতে এসে পাকা হয়। সদর শহর থেকে বেরিয়ে এসে বাদা-কিসমতের মাঝখান দিয়ে, মোহরের পাশ দিয়ে, ব্লক অফিসের দিকে রাস্তা এগোয়। সেখানে থানাও আছে। সেখান থেকে রাস্তা আরো বারো-চোদ্দ মাইল এগিয়ে বড হাই রোডে গিয়ে পড়বে।

মোহর হাটখোলার মোড়ে চার-পাঁচখানা স্থায়ী দোকান গজিয়ে ওঠে। সকালে একবার এবং বিকেলে একবার চায়ের দোকানের উনুনে আগুন জ্বলে। সবাই আশায় থাকে কবে বাস-যাতায়াত শুরু হবে। এখন শুধু মোহরের হাটের দিনে সদর শহর থেকে একখানা হাট-বাস সপ্তাহে দু'দিন যাতায়াত করে।

রাস্তা তৈরির কাজে প্রচুর মজুর খাটে। অধিকাংশই সাঁওতাল ও ওরাওঁ। ঠিকাদারের লোকের সঙ্গে একদিন কথা বলে আসে শারিবা। বাজিকর-পাড়ার কয়েকজন রাস্তা তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়। অবশ্য ব্যাপারটা এত সহজে হয় না। সাঁওতাল, ওরাওঁ মজুরকে সবাই চেনে। তাদের দিয়ে কতটা কাজ ও কিভাবে কাজ পাওয়া যায়, ঠিকাদার জানে। কিন্তু বাজিকর? এ জাতের নামই শোনে নি সে কোনোদিন। প্রথমে শারিবাকে সরাসরি না-ই ক'রে দেয়। পরে রোড-রোলারের ড্রাইভার হানিফের কথাতে ঠিকাদারের ম্যানেজার পরীক্ষামূলকভাবে দশজনকে কাজে নিতে রাজি হয়। তবে বাজিকর মজুররা আপাতত রেজার রেটে কাজ পাবে, এমনই শর্ত হয়।

শারিবা রাজি হয়ে যায়। নতুন শেখা পাটোয়ারি বুদ্ধিতে হানিফকে কৃতজ্ঞতা জানায়। বলে, আপনার জন্যই কামটা হোল। চলেন, এটু চা খাই।

হানিফ হাসে। বলে, চা খিলাবেন, আমাক? হা—হা—। চলেন, চলেন।

এর মধ্যে হাসির কি আছে শারিবা বোঝে না। হানিফের উচ্চারণে কিছুটা শহুরে বুলির মিশ্রণ আছে। তার চেহারাটা বড়সড, পরনে খাকি রঙের প্যাণ্ট শার্ট।

মোহরের চায়ের দোকানে চা খেয়ে যখন তারা বের হল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হানিফ বলে, চা খায়ে যুৎ হোল না। চোয়ানী পাওয়া যায় না তোমাদের দেশে?

শারিবা বলে, হাটের দিন ছাড়া চোয়ানী পাওয়া কঠিন।

হানিফ একটু হতাশ হয়। বলে, সারাদিন রোদে পোড়া কাম। নেশা না হলে রক্ত সব জল হোই যাবে। তাড়ি পাওয়া যাবে না?

—তাড়িও ভাল পাবেন না এ সময়। তালের তাড়ির সময় তো ইটা লয়। খেজুরের তাড়ি পিইবেন তো বলেন, বেবস্থা করি।

– খেজুরের তাড়ি ? খাই নাই কখনো। কেমন হয় ?

– তালের মত অত ভাল স্বোয়াদ হয় না, এট্টু তিত্‌কুটি হয়।

– নেশা হয় তো ?

– হঁ, নিশা হয়।

– চলো তবে।

তাড়ির জন্য শারিবাকে চেষ্টা করতে হয় না। আকালু আজকাল আর হাপু গায় না। সে এখন পাশীর কাজ করে। তার হালকা ক্ষিপ্র শরীরে কাজটা সে ভালোই পারে। এ দেশে নেশা প্রায় প্রত্যেকটি মানুষই করে। কাজেই তালের তাড়ি যখন নামতে থাকে তখন তার রোজগার খারাপ হয় না। এ ছাড়াও সে মাঝে মধ্যে খড়ের ব্যবসা করার চেষ্টা করে। কারো গরুর গাড়ি ভাড়া নিয়ে খড় কিনে নিয়ে সারারাত গাড়ি চালিয়ে শহরে যায়। শহরে খড়ের ভালো দাম পাওয়া যায়।

শারিবা হানিফকে নিয়ে নিজের ঘরে আসে। মানুষটা বেশ প্রাণখোলা, বেশ ভালো লাগে তার। আকালু তাড়ি আনে। মুড়ি পিঁয়াজ, কাঁচালংকা সংগ্রহ ক'রে আনে। হানিফ নেশা করে। শারিবা অতিথির সম্মান রাখতে আধা গেলাস নিয়ে চুমুক দেয়।

হানিফ বলে, ও কি খাওয়া ? চ্যাংড়ার মতন ঠোট ছোঁয়াছ।

– হামার নিশা খাওয়া অভ্যাস নাই, হানিফ সাহেব।

– কেন ?

– নিশা খালে মাথাটা যুতে থাকে না, পরে খুব বে-আক্কেল লাগে নিজেরে।

– আরে ? সি জন্যই তো মানুষ নিশা খায় ! আজব মানুষ !

শারিবা হাসে। বলে, আপনে খান, সাহেব।

হানিফ তাকে ধমকে ওঠে। বলে, ধেত্‌, সাহেব সাহেব করছ কেন বল তো ? বয়সে তুমার থিকা পাঁচ-সাত বছর বড়ই হব। ভাই বলে ডাক। তুমার নামটা জানা হয় নাই।

– আমার নাম শারিবা।

– শারিবা কি ?

– শারিবা বাজিকর।

– কোন জাত ?

শারিবা চুপ ক'রে থাকে। সেই প্রাচীন প্রশ্ন হানিফও করে।

– হিন্দু, না মোছলমান ?

– হামরা বাজিকর, হানিফ ভাই।

– বাজিকর কোনো জাত নয়।

– তবে হামারদের জাত নাই।

– জাত নাই এমন মানুষ নাই। হয় হিন্দু, নয় মোছলমান, নয় খৃস্টান—

—ইয়ার এটাও মোরা লই।

আধশোয়া অবস্থা থেকে হানিফ উঠে বসে। তার মাথায় তখন নেশা ধরে এসেছে। সে বলে, তাজ্জব! এমন কদাপি শুনি নাই। গরু খাও?

—খাই।

—হারাম—শুয়ার?

—খাই।

—তাজ্জব! তুমি হামার নিশা কাটাই দিলা হে!

সে আবার তাড়ি নেয়। অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ নেশা করে। শেষে আবার বলে, তাজ্জব! এমন মানুষও এ দেশেৎ আছে যার কোনো জাত নাই!

অন্ধকারে পাতালুর বাঁওরের দিক থেকে উত্তরের প্রথম হাওয়া এসে গ্রামে ঢোকে। গাছের পাতা কাঁপায়। খরের চালার পুরানো খড বর্ষায় পচে এখন শুকনো হওয়া পাতার গুঁড়ো উড়ে নিচে পড়ে। অন্ধকার ঘন হয়। ওমরের মা বিনিয়ে বিনিয়ে গান গায়, এ সে হাল্দি লাগিয়ে এতো মায়েরি— পলবি কোনো দুঃসাহসী প্রেমিককে নোংরা গালাগাল দেয়। কাছেই একটা কুকুর ডেকে উঠেই থেমে যায়। ওপাশের ঘরের কাছ থেকে প্রথমে পুরুষ ও পরে নারীকণ্ঠের 'জয় মা মনসা—' শুনে শারিবা বোঝে রূপা-শরমী ফিরে এল। আকালু হাঁড়ির গায়ে নেকড়া লাগিয়ে তাড়ি ঢালে। এতক্ষণ যে অনর্গল কথা বলছিল, সেই হানিফ এখন কোন অজ্ঞাত কারণে যেন থম্ ধরে থাকে ও মাঝে মাঝে গেলাসে চুমুক দেয়।

শেষ গেলাসের নিচের ঘন তলানিটুকু হানিফ বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গেলাসটা সামনেই উপুড় ক'রে রাখে, অর্থাৎ আর নয়। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, জাত থাকলে বেজাতও আছে। যার জাত নাই, তার বেজাতও নাই। তুমরাই ভালো আছেন গো। তুমাদের জাতও নাই, বেজাতও নাই। এই মনে করেন, হামি হলাম মুসলমান জাত, হামার চোখে হিঁদু হলেন বেজাত। হামি বলব, মার শালা হিঁদুকে। ফির হিঁদুর চোখে হামি হলাম বেজাত। মার শালা বেজাত মোছলাকে। তাই, মনে করেন তুমরা, হামার মা আর ভাই খুন হয় আর বুন লোপাট হয়া যায়। আর হামি তখন রোলার গড়ায়ে রাস্তা বানাই। আর সি রাস্তায় বেবাক জাত হাঁটে যায়। তুমরাই ভালো আছেন, তুমাদের জাত নাই, তুমাদের বেজাতও নাই!

লম্ফের আলোয় হানিফের নেশায় ভারী চোখ চিকচিক করে। তার গলার স্বর জড়ানো এবং দূরবর্তী। শারিবা তার কথার কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। কিন্তু কোথাও কোনো ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে, তা বোঝে। ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে সে কিছু বলতে পারে না।

খেজুর পাতার মাদুরের উপরে হানিফ গড়িয়ে পড়ে পুরোপুরি। হাত-পা আলগা হয়ে যায় তার। আকালু তার পা দু'টো টেনে সোজা ক'রে দেয়। হানিফ কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন রূপাকে সঙ্গে ক'রে ইয়াসিন যখন থানায় যায় তখন দশজন বাজিকর পায়ে মোটা ক'রে বস্তা বেঁধে পাথর কুচির উপরে গলানো পীচ ঢালে। তার মধ্যে শারিবা একজন। বাজিকরের ইতিহাসে এই প্রথম একজন থানায় নালিশ করতে যায় অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য। ওমর যখন খুন হয়, আজুরা তখন ভায়রোর বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করতে বলেছিল ইয়াসিনকে। ইয়াসিন রাজি হয় নি। আজুরার সঙ্গে ভায়রোর নিজস্ব কিছু বিরোধ আছে। আজুরা তাই তাকে উসকাতে চেয়েছিল। ইয়াসিন সেটুকু বোঝে। তাছাড়া খুনের কোনো প্রমাণ ছিল না। শারিবা চাঁদের আলোয় সবই দেখেছে বটে, কিন্তু কাকে দেখেছে, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না।

এক এক সময় ইয়াসিনের মনে হয় চতু আর আনোয়ার বাজিকরই ঠিক বলত। বলত বানজারা বাজিকরের সারা দুনিয়াটাই ছিল, সে ছিল সারা দুনিয়ার রাজা। কি যায় আসে তার ?- ছেঁড়া তাঁবু, শতচ্ছিন্ন জামাকাপড, রুগ্ন পশুর দল ? তার ছিল ভরপুর জীবন, বিশাল বিস্তৃতি। চতু আর আনোয়ার তাদের পূর্বজীবন ভুলতে পারে নি। পাঁচবিবিতে থাকতে হরদম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ত তারা। তিনবার লালমিয়ার ঘোড়া চুরি ক'রে উধাও হয়ে গিয়েছিল তারা। ধলদীঘি কিংবা খাগড়ার মেলায় নিয়ে বেচে দিয়ে দীর্ঘদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু দল না থাকলে যাযাবরের কিছু নেই। প্রতিবারই ফিরে আসতে হতো তাদের। প্রতিবার জামির তাদের শাসন করত, রক্তাক্ত করত মেরে।

এখন ইয়াসিন থানায় যাচ্ছে। থানা-পুলিস থেকে বাজিকর চিরকাল দূরে থাকে। পুলিস তার শত্রু। পুলিসকে সে ঘাঁটায় না। ইয়াসিন প্রথম বাজিকর যে নিজের প্রয়োজনে পুলিসের কাছে যাচ্ছে।

সোনা মিয়া ঠিকমত শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়। সঙ্গে একজন মুহুরী দেয় ডায়েরির বয়ান ঠিকঠাক যাতে এরা বলতে পারে সেজন্য।

থানা অফিসার বলে, বাদিয়া মুসলমান, বাজিকর আর পাখমারা নলুয়া এই তিনজাত বহুৎ হারামী। তবে থানায় এসেছ, এটা ভালো লক্ষণ।

মুহুরী বলে, না স্যার এরা গেরস্থ লোক। চাষবাস আর পাইট খাটে খায়। ঝামেলা তো কদাপি করে না। কেন্তু এদানি বড় ঝামেলায় পড়ি গেছে, আপনি যদি না দেখেন -

— কেন ? আমি দেখব কেন ? আমি কোন শালা ?

ইয়াসিন আর রূপা হাতজোড় ক'রে থাকে। শেখানো কথা কিছুই মুখে আসে না। মুহুরী বোঝে, বড়বাবু কিছু স্তুতি শুনতে চায়।

সে বলে, হুজুর, আপনি হলেন দণ্ডমুণ্ডের কত্তা। রাখলেও আপনি, মারলেও আপনি। বাদা-কিস্মতের হাজী সাহেব আপনার কথা কয়ে আমাক্ পাঠালো আপনার কাছেৎ। হাজি সাহেবের বাপের সিই হাত্তির বেপারটা এখুনো তিনি মোনেৎ রাখেন। ফির্ হজে যাওয়ার আগে পাঁচকোটের বেপারে আপনাব কেরামতিও স্মরণে আছে তার। ওঃ ভালো কথা, একেদিন দাওয়াতের অনুমতি চায়ে পাঠাছেন। যদি অনুমতি কবেন, হাজীসাহেব নিজে এসবেন আপনাকে দাওয়াত জানাতে।

মুহুরী পাকা লোক। বডবাবুও কাঁচা নয়। কিন্তু তোষামোদের মজা এই, পাথরও গলে, আর এ তো থানার বডবাবু!

হাজীসাহেবের বাপেব আমলে হাতি ছিল। সে আমলে অবস্থাপন্নদেব হাতি রাখাটা একটা বিশেষ বডলোকী ও সম্মানেব ব্যাপার ছিল। হাতিটা ছিল বুড়ো। মরার আগে হঠাৎ খেপে গিয়ে দু-দু'জন মানুষকে খুন কবে। হাজীসাহেব বড বিপদে পড়েছিল। এই বডবাবু তখন এখানকাব মেজবাবু ছিল। হাজীসাহেবের হেপাটা তখন সেই সামলায়।

বড়বাবু স্তুতিতে কানে আরাম পায়। বলে, হাজীসাহেবকে আমার সেলাম জানাবে। যাব একদিন আমি নিজেই। তা এদের জন্য আমি কি করতে পারি।

মুহুরীর আর বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বিষয়টা পরিষ্কার ক'রে বোঝায়। দারোগা বলে, ঠিক আছে, আমার জানা বইল। জেনারেল ডাইবি একটা দিয়ে যাও। কিছু ঝামেলা হলে আগে ভাগে খবর দিও।

কাজ শেষ হলে ইয়াসিন আর রূপা নিচু হয়ে সেলাম করে। মুহুরী বলে, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, আমি আসি।

ইয়াসিন খুব কৃতজ্ঞ বোধ করে। হাজীসাহেব আর সোনামিয়ার মতো মুরুব্বি না পেলে এ যাত্রা বাঁচা যেত না। ইতিমধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারটা সে পাকা করেছিল হাজীসাহেবের সঙ্গে। রূপা এখনো সেকথা জানে না। ব্যাপারটা গোপনেই আছে। হাজীসাহেব তাকে জানিয়েছে, অঞ্চলের তাবৎ অবস্থাপন্ন মুসলমান এ উৎসবে বাজিকরদের সঙ্গে থাকবে। ষোলই কার্তিক মহরমের দিন বাদা কিসমতের মসজিদে বাজিকররা সদলে মুসলমান হবে। বাজিকররা জাত পাবে, পাঙ পাবে, পোশাক পাবে, আর যাতে থিতু হতে পারে তার জন্য মুসলমান জোতদাররা তাদের নিজ নিজ জমি থেকে বাজিকরদের আধি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

ইয়াসিন মজলিশ না ডেকে প্রতি ঘরে গিয়ে গোপনে শলাপরামর্শ করেছে। সামনে দিশাহারা অন্ধকার। কোথায় যাবে মানুষ? রাজশাহী, আমুনাডা, পাঁচবিবির তাড়া খাওয়া বাজিকর এবার যে কোনো মূল্যে স্থিতি চায়। আপত্তি বিশেষ কেউ করে নি। দু'চার ঘর যারা নিজ পরিচয় গোপন রেখে বাইরে থেকে হিন্দু মেয়ে ঘরে

এনেছে, তারাই কেবল আপত্তি করছে। কিন্তু ইয়াসিনের বড ভয় রূপাকে। রগচটা রূপা কিভাবে এই সিদ্ধান্ত নেবে ভাবতে সে ভিতরে দুর্বল হয়ে যায়। তবুও ঘরে ফেরার পথে রূপাকে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা, এরকমই তার পরিকল্পনা।

সোনামেলা ছাড়িয়ে এসে ইয়াসিন বলে, উপা বাজিকর, এটা কঠিন গপপো আছে।

তার বাচনভঙ্গিতে রূপা থমকে থেমে যায়। ইয়াসিন নরম মনের মানুষ, সে এত গম্ভীর কথা বলে কেন ?

—উপা বাজিকর, তুমু জামির বাজিকরের ছেলা। বাজিকরের বিপদটা তুমার বুঝা লাগে।

—বুঝলাম। সে-ই তাল। মোছলমান হোবার তাল !

—হাঁ, মোছলমান হোবার তাল ! বাজিকরের বেটা তুমু, সব থিকা বড কথা, জামির বাজিকরের বেটা। জামির বাজিকর গোরৎ যাওয়ার আগে হামাক মণ্ডল করি দিয় যায়। আর লিয়মমত বাজিকরের তাবৎ বেত্তান্ত হামাকেই বলে। সেলা কথা তুমার আইজ শুনা লাগে।

—বল, শুনি।

—গোরখপুরের কথা কেছু জানেন তুমু। কেন্তু তার আগ্‌লা কথা জানেন না।

—না, জানি না।

—সি আগ্‌লা দেশে আমরা আছিলাম ডোম আর চাঁডাল, অছুৎ জাত। জাতের মানুষ হামারদের ছুঁয়া মাডাত না। দিনেমানে আস্তাৎ যাওয়া নিষেধ ছিল। গেলে কেনেস্তারা বাজাবার হোত। পাছায় বাঁধতে হোত বারুণ। হামারার কাজ ছিল ভিখ্‌ মাগ্‌গা, ঘোড়া, গরু আর ভইসের পায়েৎ নাল লাগানো, জানোয়াররে খাসী বলদ করানো, শ্মশানে, কব্বরখানায় অছুৎ কাম। খালি আজায়-আজায় যুদ্ধ হলে হামরাদের কিছু কাম বাডত, কেছু কাম পেতাম হামরা। লডাইতে হাজার কাম থাকে। শতেক ময়লা কাম, অছুৎ কাম। সিগ্‌লা হামরা করতাম। আর হামরা গান গাইতাম, লাচতাম, হামরাদের বিটিগুলা ভাল নাচনী আছিল। আর সি সব দিনে খালি লডাই আর লডাই। সি লডাইয়ে আমরা মরতাম দলে দলে। লড়াই শেষে শিকলবন্দি গোলাম হয়া চালান যাতাম দূর দূর দেশেৎ। ই ভাবে হামরা জাতের হুজ্জতি আর লডাইয়ের দাপটে ছাডেখাড হোই গিলাম। মান নাই, ইজ্জৎ নাই, জমি নাই, ঘর নাই। নাচ আছে, গান আছে, জানা আছে হরেক হাতের কাম। ই সব কথা হামাক্‌ বালি বুঢ়াও কহিছিল।

ইয়াসিন চুপ করে। দুই বাজিকরের চোখে বংশপরম্পরায় শোনা ধূসর রক্ত, ঘাম আর অবিচারের ছবি এখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কেননা এসব এখনো সত্য।

রূপা বলে, হামার পিত্তিপুরুষ জানত, বাজিকর হাল ধইলে মাটি ফালা হয়া বালি বেরাবে, জল ডাঁড়ায় জল দাঁড়াবে না, বীজ ফেলালে বিছন গজাবে না।

হামার বাপ ইসব কথা বিশ্বাস যাতেন না। তাই তিনি হামরাদের খিতু করবা চালেন। ইয়াসিন বলে, খিতু হোবার বাসনা হামার সাত পুরুষের মগজেৎ আছিল, কেন্তু সুবিধা হছিল না, তাই। এখুন দেখ, জামির বাজিকর মরি গেলেন, আর হামার মাথাৎ কি দায় চাপায়া গেলেন। সি দেশ নাই, সি দুনিয়া নাই, সি ভাষা নাই, সি নাচ গান ভুলি গিছি হামরা, নাটুয়া বাজিকর, ভানুমতির বাজিকর, ভাল্লু-কুকুর-বান্দর লাচানো বাজিকর কোথায় হারাই গিছে, কেন্তু দুন্নাম পুরাই আছে। ঠগ, জোচ্চোর বাজিকর, কামচোর বাজিকর, অজাত বাজিকর, জড়িবুটি হাতসাফাই-এর বাজিকর, গুণতুক মানুষ ভুলানো বাজিকর, ই বেশাক বদনাম হামরার থাকি গিছে।

রূপা বলে, সর্দার, মালদা টাউনোৎ কাপড় পট্টিতে গুজরাটি দোকানদারের বুলি আর হামরার বুলিতে মিল আছে।

—আছে বালি বুঢার কাছে শুনেছি, হামরা উসব দিকেরই মানুষ। এখুন আসল কথা শোন। হাজীসাহেব হামরার মুরুব্বি হইছেন। বাজিকরের ধরম নাই, জাত নাই। কালী মাই, বিগা মাই, ধরতি মাইয়ের কথা মানুষে ভুলি গেছে। এখুন হামার পরামর্শ হয়লো, এটা কোট ধইরে লওয়া। হাজীসাহেব শক্ত মানুষ। মোছলমান সামাজে উঁচা-নিচার বাচ-বিচার নাই, ছোঁওয়া-ছানির বিচার নাই। একে আরের সাথ একসাথ ওঠবস্ করে, খানা পিনা করে, বিহা সাদি করে। সব থিকা বড় কথা হামরার জমি হবে। হাজীসাহেব ইসব বাত করিছেন হামার সাথ। হামার বিশাস, তুমার বাপ বাঁচে থাকলে ইতে সায় দিতেন। তুমু না করেন না, উপা বাজিকর।

রূপা দীর্ঘ সময় চুপ ক'রে থাকে। অনেক আগেই সে এসব চিন্তা ক'রে রেখেছে। হিন্দু ঘরের মেয়েকে সে ঘরে এনেছে। শরমীর ভিতরে হিন্দু সংস্কার প্রবল। সেই সংস্কার রূপার ভিতরে শিকড় গেড়ে বসেছে। শরমীর হাতে শাঁখা তার চোখে নতুন অভিজ্ঞতার পবিত্রতা আনে। তার ঘরে আছে মা মনসার ঘট। তারা আবেগে বিষহরির পালা গায়। এখন আর তার পক্ষে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। এবং শারিবাকেও সে পৃথক হতে দিতে পারে না। ধর্মের বিরোধ সে জানে। রূপা বলে, সর্দার রূপায় যখুন আর কেছু নাই, বাঁধা হামি দিমো না। তবি হামাক্ জোরাজোরি করেন না। হামার ঘরণী হিঁদু। হামার ঘর বাদ দেন শারিবাক বাদ দেন।

ইয়াসিন আশ্বস্ত হয়। তবুও গভীর বিপদ দু'জনকেই আচ্ছন্ন করে। সারাজীবনের জন্য পৃথক হওয়ার প্রস্তুতি নেয় তারা।

রূপা বলে, আরেক কথা মোনেৎ রাখেন। বাদিয়া মোছলমান, দাই, পাথমারা ইরা সব হামরার বাজিকরের মতন জাত। এখুন মোছলমান। কেন্তু মোছলমান সমাজ তাদের নেয় না। একসাথ ওঠবস পর্যন্ত করে না, বিহাসাদি দূরের কথা।

ইয়াসিন বলে, ঠিক্ কথা। ওলা খোঁজ খপর করিছি হামি। ইয়ারা গুন্ডা

মোছলমান। কোরাণশরীফ ছুঁয়্যা, কাল্‌মা পড়্যা মোছলমান হয় নাই। মোছলমান সমাজের সাথ সাথ থাকতে থাকতে মোছলমান হয়াছে। জাতপাতের বিচার নাই, কিরাকাম করে না, নামাজ-রোজা, জুম্মা-জিয়াপৎ কেছুই মানে না। হামরা সিভাবে মোছলমান হচ্ছি না। ষোলই কার্তিক মহরমের দিনেৎ হামরা কলমা পড়ব, মোছলমান হব। তাবাদে একসাথ নামাজ পডা হবে, একসাথ খানাপিনা হবে। হাজীসাহেব হামরাদের সাথ পাত পাড়বে, আর আর মোছলমান ইমানদার মানুষ হামরাদের সাথ পাত পাড়বে। হামরা উঁচা হব, হামরাদের জাত হবে।

রূপা বিড়বিড় ক'রে বলে, হামরাদের জাত হবে! কি হবে তা মাও বিষহরিই জানে। হামি হিঁদু হলাম, তুমু মোছলমান হলেন। হিঁদু হামাক্ জাতে লেয় না, মোছলমান তুমায় জাতে লিবে, সি বিশ্বাস হামার নাই। বহুৎ দেশ দেখা আছে মোর। তবু রূপায় যখুন নাই, যান তুমরা, হন মোছলমান। এখন তো বাঁচেন, দলকে বাঁচান। তা বাদে যা মাও বিষহরির মোনৎ আছে, তাই হবে। কেবা জানে, হয়ত একদিন তুমার বেটা হামার মাথাৎ ডাং মারবে 'শালো হিঁদু' বলে, আর হামার বেটা তুমার বুকেৎ ফাল্লা বিঁধাবে 'শালো মোছলমান' বলে। জয়, মাও বিষহরি। সন্তানরে দেখেন, মাও।

রূপা কপালে হাত ঠেকায়। দেখাদেখি ইয়াসিনও। দুই প্রৌঢ় যেন শেষবারের মতো একত্রে হাঁটে। যেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত দিয়ে দুই যাযাবর গোধূলিতে নিজেদের তাঁবুতে ফিরছে। আর কোনোদিন সেই তাঁবু থেকে তারা সূর্যোদয় দেখতে বেরোবে না। দু'জনের কেউ আর কথা বলে না। মাঠের ওপারে সূর্য ঢলে পড়ে। গভীর রক্তাক্ত যাযাবরী 'তরক'। দুইজনে সেইদিকে তাকায়। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকায় তারপর। সত্যিই কি ঘরে ফিরতে পারবে বাজিকর? পথ তাকে অভিশাপ দেবে না? প্রান্তর তাকে ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে না?

দু'জনে একটা গাছের নিচে বিশ্রামের জন্য বসে সূর্যাস্ত দেখে। 'সূর্য ডুবে গেলে তারা যেন জামির বাজিকরের কণ্ঠস্বর শোনে, 'বাপাসকল, জানবার হয়ো না। চেষ্টা রাখ্যা, যাতে বিটিরা দূরে যায় আর বেটারা দূর থিকা আনে। শোগর, মরি আর ইওয়া—জন্ম, মৃত্যু আর বিয়ে—এই তিনকে হিসাবের মধ্যে রাখ, নিয়মের মধ্যে রাখ।'

আয়নার খাঁড়িতে স্নান করতে গিয়ে হানিফ জলপরী দেখে। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ে। চারদিকে জঙ্গল, কয়েকটা তালগাছ এবং দু'টো খুব উঁচু মাদার গাছ। জঙ্গল বলতে ভাট আর আসশ্যাওড়ার ঝোপ। তার মধ্যে দিয়ে আয়নার খাড়ি বয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে স্নান করার মতো গভীরতা আছে। হয় মানুষ নিজের প্রয়োজনে ক'রে নিয়েছ, নয়তো বাঁকের জন্য হয়েছে। এই সময় জল থাকে ভালো'ই, মানুষের প্রয়োজনে লাগে। ভারী নির্জন জায়গা।

জলে ডুব দিতে গিয়ে পলবি খেলা পেয়ে যায়। কাপড়ের মধ্যে ঢুকে থাকা হাওয়া বেলুনের মতো ফুলে ওঠে জলের চাপে। পলবি থাবড়ে থাবড়ে সেই হাওয়ার বেলুন ফাটায়। তার যা বয়স, তাতে এ ধরনের ছেলেমানুষি মানায় না। কিন্তু এই নির্জন খাঁড়ির ঘাটে কেইবা দেখে। সব বয়সের মানুষেরই পুতুলখেলা থাকে। সব বয়সের মানুষেরই থাকে নির্ভার মধুর অথবা বেদনার শিশুসুলভ একাকিত্ব। সেখানে সে নিজের সঙ্গে কথা বলে, নিজের সঙ্গে খেলে।

হানিফ একটু আড়ালে সরে আসে, আবার চুরি ক'রে দেখে। লোভ সামলাতে পারে না। পলবি ডুব দেয়, গা মাজে, উদ্দেশ্যহীনভাবে একদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। তার পুষ্ট ঠোঁটে একটু বাঁকা শিহরন বয়ে যায়, অথচ তার চোখ থাকে বিষণ্ণ। হানিফের কাছে মনে হয়, মেয়েটি হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না। সেই সময় সে মেয়েটির নিচের ঠোঁটের নিচে চিবুকের উপর দিকে একটি উল্কি দেখে। মেয়েটি কোনো একটা বিশেষ চিন্তায় অবশ্যই বিভোর। হানিফ আবার চোখ ফেরায় ও পরক্ষণেই ফিরে তাকায়। শরীরের ভার একটু ছেড়ে দেওয়া গোছের হলেও মেয়েটি ভীষণ আকর্ষণ করে হানিফকে। কেন যেন হঠাৎ মনে হয়, এরকমই একজনকে খুঁজছিলাম।

পলবি শেষবারের মতো ডুব দিয়ে উঠে আসে। হানিফ এবার পিছন ফিরে দাঁড়ায়। পলবি যতটা সম্ভব কাপড়ের জল হাত দিয়ে চিপে এগিয়ে আসে।

হানিফ বলে, মাফ করবেন, আপনার গোসলের সময় না বুঝে এসে পরিছিলাম। গলায় কিছুটা শহুরে সৌজন্য আনার চেষ্টা করে সে।

পলবি থেমে যায়। পুরুষ মানুষ তার কছে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু জীবনে সে এই প্রথম শুনল 'আপনি' সম্বোধন এবং 'মাফ করবেন'। সে ভীষণ লজ্জা পায়। যতটা সম্ভব ভিজা কাপড় টেনে গা ঢাকে সে। বলে, তাৎ কি হয়াছে, ইটা তো সোব্বারই গোসল করার জায়গা। আপনি তো হামরাদের শারিবার বন্ধু হানিফ সাহেব ?

হানিফ খুব অবাক হয়ে যায়। বলে, চিনেন আমাকে ?

—খুব চিনি। আপনি তো রোড ডেরাইভার। দেখিছি কদিন শারিবার ঘরোৎ যাবা-আসবা।

হানিফ কেমন আবেগরুদ্ধ হয়ে যায়। শহুরে সপ্রতিভতা নষ্ট হয়ে যায় তার। শুধু অনেক চেষ্টায় বলতে পারে, খুব মেহেরবানী আপনার।

দু'জনেই দু'জনার দিকে খুব নির্জলা দৃষ্টিতে তাকায়। শেষে পলবি বলে, হামার নাম পলবি। ইয়াসিন বাজিকর হামার বাপ। যান, আপনার বেলা হোই যায়। নাহেন গিয়া।

পলবি চলে যায়। হানিফ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে দিকে। এই তাহলে পলবি। এর কথা সে শুনেছে কিছু কিছু।

সারাদিন রাস্তার রোলার চালানোর সময় পলবির কথা চিন্তা করে হানিফ। বাজিকরের বেটি, কেমন বা হবে কে জানে। তার উপরে যা সব শুনেছে তার সম্পর্কে, সে তো একখানা পুরো কিস্‌সা! তবুও প্রথম দর্শন থেকেই তার যেন মনে হতে থাকে, একেই তো খুঁজছিলাম। প্রাণখোলা মানুষ সে। কোনো ব্যাপারেই দেরি সয় না।

সন্ধ্যাবেলা শারিবার ঘরে বসে তাড়ির গেলাস হাতে নিয়ে বলে, নিশা খাওয়ার আগেই এটা কথা বলি, নালে পরে বলবা যে নিশার ঘোরে বেচাল বকি।

শারিবা বলে, কি কথা ?

—তুমাদের ঐ কি য্যান্ বলে, ঐ পলবি নামের মেয়াটা—

—হাঁ, কি করিছে সি আপনাক্ ?

শারিবা শংকিত হয়।

—মারে ফালাচে। একদম সাবাড়।

—মানে ?

—আচ্ছা গাড়োল তো! আরি, উ মেয়াটার কথা আমি কেছু শুনবার চাছি।

শারিবা একটু দ্বন্দ্বে পড়ে। পলবির কথা এ অঞ্চলে সবাই জানে। কাজেই তাকে মানুষের প্রয়োজনের কথা মনে হয় একটা কারণেই। কিন্তু হানিফকে তো এ পর্যন্ত তার সেরকম বেচাল কিছু মনে হয় নি। সে একটু গম্ভীর হয়ে বলে, কি কবার চাছেন হানিফ ভাই, এটু পস্কার করি কহেন।

—উয়ার কথা আন লোকের কাছে কেছু শুনিছি। কিন্তু এখন তুমার কাছ থিকা কেছু শুনবার চাছি।

—ক্যান্ ?

—আরি, আচ্ছা ঝামেলা তো! আরি, আমি এটা অবিয়াত্‌ পুরুষ মানুষ, এটা মেয়ার খোঁজ নিবার পারব না ?"

—পলবিরে আপনে—!

—ক্যান, বিয়া করবার চাইতে পারি না ?

—না, তা লয়। তবি পলবি—

—ক্যান, খুব খারাপ মেয়া ?

—না, মানে—

হানিফ এবার গেলাসে চুমুক দেয়। বলে, শোন শারিবা, আমি হানিফ মহম্মদ, অনেক ঘাটের পানি খায়া এখন সরকারী চাকরি করি। রোড রোলার চালাই। দুনিয়াটা আমার কেছু দেখা আছে। আমি এমন কিছু সাধু ফকীর নই যি ব্যালপাতা আর কোরাণশরীফ খায়া থাকি। তুমিই বলিছিলা যে, বাজিকরের জাতফাত নাই। আমারও এখন এটা সংসার করা দরকার। হা-ঘরে মোছলমানের ছেলা আমি। আমাদের মালদা জিলায়, মনে কর, সব শালাই নাকি নবাব বাদশার ঘর। বিহাসাদির কথা ওঠলেই সব পক্ষ গৌড় আর আদিনায় পুরান ইমারৎগুলা দেখায়। মানে কিনা, সব ঐ সব বংশ। এ ছাড়া আর যা জোটে তাতে আমার মন টানে না। তোমাদের পলবিরে চোখে লাগিছে। তবে সব কথার আগে তোমার কাছ থিকা শুনতে চাই।

শারিবা একটু চিন্তায় পড়ে। হানিফের মতো সমর্থ পুরুষমানুষ বাজিকর মেয়ের কাছে রাজপুত্র। হানিফ কি সব শুনেছে ? সব শুনেও সে কি পলবিকে গ্রহণ করতে পারবে ? যদি পারে, শারিবার বুকের উপর থেকে একটা পাথর নেমে যাবে। বাজিকর পুরুষ হিসাবে পলবির এই অবস্থার জন্য সে কি নিজেকেও অপরাধী মনে করে না ? সে বলে, দেখেন হানিফ ভাই, পলবি বাজিকরের সোন্দরী মেয়া। লুট হয়া পাঁচ হাতে নাড়াচাড়া পড়িছে। ইসব তো আগে আপনার জানা লাগে।

—ওসব আমি জানি, শারিবা। যিটা জিজ্ঞাসা করি সিটার জবাব দেও। আগে বল মানুষটা কেমন ? ঘর করবা চায় ?

—চায়। খুব বেশি করিই চায়।

—আমি মোছলমান বলে তোমাদের আপত্ত হবে না ?

—এটা গোপন কথা কহি, হানিফ ভাই। মহরমের দিন বাজিকর পাড়ার তিন ভাগ মানুষ মোছলমান হবে।

—কি ?

—হঁা। আপনার মালদা থিকা মোল্লা এসবেন। বাদা-কসমতের মসজিদে কলমা পড়া হবে। তাবাদে একত্তরে খানাপিনা হবে।

—তোমরা মোছলমান হবা ?

—তিন ভাগ ঘর বাজিকর মোছলমান হবে, এক ভাগ ঘর হবে না

—তুমি কোন্ দলে ?

—এক ভাগের দলে।

—এ বুদ্ধি কার ?

— বিপদের, পেয়োজনের।

হানিফ অনেক্ষণ চুপ ক'রে থাকে গুম হয়ে। শেষে আবার বলে, তুমি ক্যান হবানা?

— হামার বাপ নিজেরে হিঁদু ভাবে।

— তুমি কি ভাব?

— হামি ভাবি বাজিকরের কোনো জাত নাই।

হানিফ আবার চুপ হয়ে যায়। শারিবা বলে, পলবিরে যদি সত্যিই আপনি সাদি করেন তবিতো জাতের সমস্যা আর থাকল না।

— হাঁ, তা থাকে না বটে তবে আমার বিচার যদি শোন, হিন্দু মুসলমান বেবাক জাত যদি বাজিকরের মতন, মনে কর, বেজাত হয়া যায়, তবে সিটাই ভালো হতো।

শারিবা বলে যাক্ সি কথা। তবি কথাটা গোপন রাখেন। পলবির ফয়সালা আগে করি।

— কর।

— হামি কই, আপনে দু'চারদিন আরো ভাবেন। নিজে ভালো করি বুঝ্ করেন নিজের সাথ। তাবাদে কথাৎ আগান।

হানিফ একটু ভেবে বলে, বেশ তেমনি কর। কিন্তু শারিবা, আমি তোমাদের মোছলমান হবার কথাডা ভাবতেছি। এতে কিবা লাভ হবে? কার লাভ হবে? হিঁদুরই বা কি লাভ? মোছলমানেরই বা কি লাভ? আর বাজিকরেরই বা কি লাভ?

— মোছলমানের লাভ হাজিসাহেব জানে। হিঁদুর লাভ জানি না। কেন্তু বাজিকরের লাভ আছে।

— আছে?

—নাই! বাজিকর যবে থিকা থিতু হাওয়ার বাস্না করল, তবে থিকাই সে সামাজের মানুষের কাছেৎ আপন হবার চায়। কেউ তাক্ আপন করে না। আজ যদি হাজীসাহেব তাক্ আপন করবা চায় তো সি যাবে না?

— তুমি ঠিক জানো, হাজীসাহেব তোমাদের আপন করবা চায়?

— মোছলমান তো করবা চায়।

— মোছলমান করলে তোমরা থিতু হবার পারবা?

—হামার নানি বুড়ি বলত, শারিবা. পিত্তিপুরুষের পাপে বেবাক বাজিকর ঘরছাড়া। অভ্যাসে ঘর তারে আর টানে না। কারণ কি, পথেই তার সব, জনম মরণ হাসি কাঁদা। শয় শয় বছর এংকাই চলি গেল। তাবাদে. দুনিয়ার রাস্তা একদিন শ্যাষ হয়া গেল। রাস্তাৎ আর সুখ নাই, স্বস্তি নাই। পথে বিপদ আগেও আছিল্, বাদে তা হোল সীমাছাড়া। সামাজের মানুষে নানাকারণে বাজিকর বাদিয়াকে ছিড়া খায়। তাই আজ তিন-চার পুরুষ ধরা হামরা থিতু হবার চাছি। কেন্তু থিতু হবার চালেই বাজিকর থিতু হবার পারে না। কারণ কি, তার যি ধরম নাই।

—ধরম থাকলিই তুমরা থিতু হবার পারবা ?

—বাজিকরের কাছেৎ, হানিফ ভাই, আইজের দিনটা।সব থিকা বড় কথা এখুন পয্যন্ত। আইজকার দিনেৎ হামি মোছলমান হয়া বাঁচব। ইয়ার বেশি কেছু জানা নাই।

—বাঁচার রাস্তা ইটাও লয়, শারিবা। আমার সাথ শহর চল, বাঁচার রাস্তা তোমারে দেখায়া দেব।

—নি যাবেন হানিফ ভাই, হামারে শহরেৎ নি যাবেন ?

—যাব। কিন্তু থাকতে পারবা সেথায় ? তোমরা গেরামের ছেলা।

—খুব পারমো। আপনার জল তুলা দিমো, পাক করি দিমো।

—তবে পলবি কবেড়া কি ?

—অ্যাঁ। ওঃ হো হো, সিটা তো ভুলেন না !

—হঁা, সিটা ভুলি না, সিটাই ঠিক।

খাটিয়ায় শুয়ে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে একফালি চাঁদ দেখে হানিফ। নিঃসঙ্গ মানুষ প্রকৃতি থেকেও যে সুখ পায়, এমন নয়। সারাদিন যে মানুষ কাজের ভিড়ে অন্য অনেকের মাঝখানে থাকে, রাত হলে তার নিজের কথা মনে পড়ে। তখন সে পর্দা সরিয়ে চাঁদ দেখে, চাঁদ না থাকলে অন্ধকার আকাশের তারা আর ছায়াপথ দেখে হয়ত আরো একাকি হয়ে যায়।

তখন তার দাঙ্গার কথা মনে হয়, মা ও ভাইয়ের মৃত্যুর কথা মনে হয়, মনে হয় বোনের নিখোঁজ হওয়ার কথা। তখন চাঁদ থেকে হিম ঝরে, তারা থেকে বরফের কণা যেন ছিটকে এসে তার গায়ে লাগে। আলো কিংবা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যদি কোনো পেঁচা ঝাঁপিয়ে পড়ে মাঠের আলে, কর্কশ চিৎকার করে, তখন তার চমক ভাঙতে পারে।

কিন্তু আজ চাঁদ তাকে আবিষ্ট রাখে। সে আয়নার খাড়িতে দেখা জলপরীর কথা ভাবে। ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত সব পরিকল্পনা করতে থাকে সে, যা তার আয়ত্তের এবং সামর্থ্যের বাইরে। পলবির কথা ভাবতে তার ভালো লাগে। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তার বিষণ্ণ মুখ, তার চিবুকের উপরের উল্কি। একসময় নিজের অজান্তেই সে ঘুমিয়ে পড়ে তারপর।

ঘুম ভেঙে গেলে অন্ধকারে নিজেকে মনে হয় ছায়ার শরীর। এতক্ষণ অন্য কোনো জগতেই সে ছিল। আদিনার মিনা করা সুসজ্জিত—মসজিদ, তার পিছনে উঁচু ও চওড়া মাটির জাঙ্গাল। মসজিদের উপর চাঁদ। কোনো মানে হয়? ঠিক যেন ক্যালেণ্ডারেরর ছবি।

সেই জাঙ্গাল, যার অবস্থিতি এখন প্রশস্ত ধান খেত, আর মাঝে মাঝে অকারণ মাটির টিলা, সেই জাঙ্গালই তো! একজন ঘোড়সওয়ার, সে হানিফ নয় কিছুতেই অথচ হানিফ ছাড়া আর কে-ই বা? পাশে যে ইরাণী বেদেনী—হলুদ রুমালে বাঁধা চুল, সে তো পলবি নয়। কি আশ্চর্য, স্বপ্ন এমনই বিস্ময়! পলবিই বটে! আদিনার ধ্বংসস্তূপ কোন মায়া বলে হয়ে যায় সুসজ্জিত মিনার। দুই ঘোড়া পাশাপাশি হাঁটে, দুই সওয়ারে প্রাণবন্ত প্রেমের সংলাপ বলে।

তারপর উল্টোদিক থেকে ঘড ঘড শব্দ আসে। অশ্বারূঢ় হানিফ দেখে জাঙ্গালের উপর দিয়ে রোড রোলার আসছে। খাকি সার্ট, খাকি প্যান্ট পরা ড্রাইভার তো হানিফই বটে। মাডগার্ডের উপর আড় হয়ে বসে কে ও? পলবি? নীলের উপরে সাদা ডুরে পালপাড়ার তাঁতের শাড়ি পরে গেরস্থ মেয়েটি।

ঘুম ভেঙে যায় তার। কি যে মানে হয় এসব স্বপ্নের! তবু দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে ভেসে থাকে বিষণ্ণ ভালো লাগা। বার বার মনে আসে খুন হওয়া মা আর ভাই, নিখোঁজ বোনের কথা। অথচ বাজিকরেরা মুসলমান হবে শুনে সে কেন উল্লসিত বোধ করে না? সে কি এইজন্য যে সে হাজারে হাজারে ছিন্নমূল মানুষকে ওপার থেকে এপারে আসতে দেখেছে? অথবা, সেকি এইজন্য যে শহরের বিজয় বাবু, মতিবাবু, শহীদুল ভাই তাকে কিছু বই পড়িয়েছে, কিছু কাণ্ডজ্ঞান দিয়েছে?

এখন আর এরকম মনে হয় না। এখন মনে হয় যে তার বাপ ছিল একজন নির্ভেজাল মানুষ। যেমন গাই বলদের মুখের মধ্যে একবার হাত ঢুকিয়েই সে তাদের নির্ভুল বয়স বলে দিতে পারত, তেমনি ব্যক্তি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তার ধারণাগুলোকে অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে আনতে পারত সে। এতেও তার বিশেষ ভুল হতো না। কাজেই দাঙ্গার গল্পে সে অযথা বিভ্রান্ত হয় নি। আবার ওপারে গেলে অনেক বেশি জমি পাবে তার এখানকার অল্প জমির পরিবর্তে, এই লোভের ফাঁদেও সে পা দেয় নি! শুধু সেই সব অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটনের দিনে যখন তখন বিরক্ত হয়ে উঠত আর বিড়বিড় করত – জানোয়ার সব, সব জানোয়ার!

অথচ সে ছিল এক নিষ্ঠাবান মুসলমান। নিয়মিত গরুর জাবনা দেওয়া, মাঠে হাল নামানো ও নামাজ পড়া, এই তিন কাজের কোনোটার গুরুত্বই তার কাছে কম ছিল না। আবার দেখ, সেই মানুষটা যখন পেটের শূল ব্যথায় মরে, তার আগে হানিফকে বলেছিল, দেখ হানিফ, কেউ যদি বলে তুমি হারাম খাও তবে তোমার ই বেথা কমবে, তবে তাই খাই! তবে তাই খাই!

সুতরাং বিজয় বাবু, মতিবাবু, কিংবা শহীদুল ভাই নয় – হানিফ এখন বোঝে সেই মরা বাপ এখনো তার বিবেকের উপরে পাহারা দেয়, অথবা সেই বাপ তাকে যা দিয়ে গেছে তাই সত্য, আর কিছু নয়।

তারপর আবার তার ঘুম আসে। ঘুমের মধ্যে হানিফ রোলার চালায়।

ইংরেজি ছেষট্টি সালে এ অঞ্চলে অস্পষ্ট দুর্ভিক্ষ যেন। আশ্বিন কার্তিকের অভাব এমনই তো আবার এমন কখনো নয়। একথা গ্রামের মানুষের কাছে প্রতিবছরই মনে হয়। বাজিকর রমণীদের আমানির বাটি ফুল্লরার মতোই নিষ্করুণ! এখন প্রত্যেকের দৃষ্টি কার্তিকর মহরমের দিনটির প্রতি। কি এক পরিত্রাণ যেন সেই দিনটি নিয়ে আসবে। কেননা এ সময়ের একমাত্র আশা পাট অতিবৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট।

পাটের সঙ্গে বাজিকরের সম্পর্ক কি? তাদের জমি না থাকলেও পাট গরীবের বড সহায়। পাট পচানো ও পাট ধোয়ার ভীষণ কষ্টসাধ্য কাজটা এ সময় তার এক কাজ। সারাদিন ভাদ্র-আশ্বিনের গুমোট গরম ও চড়া রোদের মধ্যে কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে পাট ধুতে হয়। আর সেই বিষাক্ত পচা জলে না আছে কি? কিন্তু এবার সে কাজ নেই। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বৈশাখ থেকেই, নাগাড়ে বৃষ্টি। পাট চারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘাস বেড়েছে, ক্ষেতের মাটিতে সারা সময়টাই ছিল থক-থকে কাদা। কাজেই পাট নিড়ানির কাজের সময়ও কাজ পায় নি কেউ। ক্ষেতে জলকাদা থাকলে পাট নিড়ানো যায় না। কাজেই সে সময় ও মার খেয়েছে জল-পাট, এখনো মার খায়। এখন শুধু মহরমের দিনটির জন্য পেটের ক্ষুধা ও বুকের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করা।

কিন্তু শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা ভবিষ্যতের জন্য এভাবে বুক বাঁধতে রাজি নয়। যে কোনা মূল্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির বন্দোবস্ত তারা ক'রে যায়, হোক সে চুরি, ভিক্ষা বা অন্য কোনোরকম অস্বাভাবিক উপায়।

মুরগি চুরি করতে গিয়ে শাজাদীর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান মহীন ধরা পড়ে যায় নমোশূদ্র পাড়ায়। এ সময় গেরস্থরা সজাগ থাকে। তাছাড়া মহরমের দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও অঞ্চলে গোপন ছিল না।

ইয়াসিনের নমোশূদ্র সমাজে অন্তর্ভুক্তির আবদারে যদিও ভায়রোর কিছু করার ছিল না, তবুও বাজিকরদের সদলে মুসলমান হওয়ার পরিকল্পনায় আর দশজন হিন্দুর মতোই সে শংকিত হয়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে বামুন কায়েতরা এ বিষয়ে পরামর্শ করতে তার কাছেই আসে। কিন্তু শক্তিশালী ভায়রোও একেবারে দরজার সামনে দাঁড়ানো বিপদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থার বিধান দিতে পারছে না। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভারসাম্য আছে, বাজিকরদের সদলে মুসলমান হওয়ার ঘটনায় তা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হবে। এতে সবাই চিন্তিত। সবচেয়ে বড় কথা, রেশারেশিতে হাজীসাহেবের দলবল জিতে

যাচ্ছে, এর থেকে অপমানকর উত্তেজনা ভায়রোদের কাছে আর কি আছে?

খবরটা শেষ পর্যন্ত শহরে গিয়েও পৌঁছায়। সাতষট্টির নির্বাচনের ডামাডোল তখন শুরু হয়ে গেছে। সর্বত্র চরম অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। সামগ্রিক বিচারে থানায় এই মুহূর্তে কোন সম্প্রদায় সংখ্যায় অধিক, তা বলা কঠিন। কিন্তু বিধানসভার আসনটি তপশীল জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। কাজেই শহরের রাজনৈতিক নেতারা এই মুহূর্তে মুসলমান সমাজকে চটাতে কোনো রকমেই রাজি নয়। কিন্তু সংকট উভয়ত। সরকারী হিসাবে যেহেতু এককভাবে তপশীল জাতি ও উপজাতির স্থান এ থানায় প্রথম, রাজনৈতিক নেতারা তাদের তুষ্ট করার জন্য সবচেয়ে বেশি ভাবেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কারণে ভোটের যে ভাগাভাগি হয়, তাতে মুসলমান সমাজকে উপেক্ষা করলে ভরাডুবি হবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। কেননা মুসলমানের সংখ্যা এ থানায় তপশীল জাতির পরেই এবং জয় পরাজয়ের নির্ধারক বিন্দুটি তাদের ভোটেই স্বীকৃত হয়। ভীষণ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। বিষয়টির সমর্থন কিংবা বিরোধিতা উভয় ঘটনাই যে এবার নির্বাচনে ব্যাপক ভূমিক্ষয় ঘটাবে এ বিষয়ে কারো কোনো সংশয় থাকে না।

অথচ এ ঘটনা নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকা যায় না। ভায়রো তার সদরের উকিল-বাবুকে দিয়ে বয়ান লিখিয়ে স্থানীয় অবস্থাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দুদের দিয়ে সই করায় ও প্রশাসনের কাছে প্রতীকার দাবি করে। তাদের অভিযোগ, জোর ক'রে ও লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তর করণ সনাতন ধর্মের প্রতি অবমাননা।

এর পাল্টা হাজী সাহেবের ভাগ্নে মালদা জেলা কোর্টের অত্যন্ত প্রভাবশালী জনৈক আমিনুল হক ছুটি নিয়ে এসে বাদা-কিসমতে আসর জমিয়ে বসে।

ফলে এস. ডি. ও-কে একদিন তদন্তে আসতে হয়। ভোটের আগে, বিশেষ ক'রে সাতষট্টির ভোটের আগে, প্রশাসন যেমন চতুর নিরপেক্ষতা নেয়, তদন্ত রিপোর্টও তেমনি হয়।

সুতরাং ভায়রো, আজুরা কিংবা অঞ্চলের বামুন কায়েতদের উপলক্ষ তৈরি করা ছাড়া উপায় থাকে না প্রথমে বাজিকরদের মজুরের কাজ দেওয়া বন্ধ হয়। কিন্তু সেখানে হাজী সাহেবের দলবল যথেষ্ট উদারতা আগে থেকেই দেখাতে শুরু করেছে। যখন আর কিছুই হাতে থাকে না, তখন 'তোর বাবা জল ঘোলা করেছে' থাকে। কিন্তু বাজিকর স্ত্রী-পুরুষ হঠাৎ নিজেদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সহজেই আর ব্যাপারগুলো মেনে নিচ্ছে না। তাছাড়া যাযাবর জাত হিসাবে তাদের স্বাভাবিক উপস্থিত কূটবুদ্ধির তুলনা নেই।

সেই সময় মহীন নমোশূদ্র পাড়ায় মুরগী চুরি ক'রে ধরা পড়ে ও তার সমুচিত শিক্ষা পায়।

ক্রোধে ক্ষোভে দিশাহারা ইয়াসিন পাঁজাকোলে মহীনকে কোলে তুলে নিয়ে ভায়রোর দাওয়ায় শুইয়ে দেয়। মহীন রক্তাক্ত, অচৈতন্য।

ইয়াসিন বাজপাখির মতো যাযাবরী চোখে তাকায় ভায়রোর দিকে। মুখে বলে, মালিক, এলা কি বিচার ?

তার পিছনে বাজিকর পাড়ার অর্ধেক মানুষ। ভায়রোর চোখ ঘোরে। ক্রোধে রক্তবর্ণ চোখ। এত সাহস !

মুখে বলে, চোরের বিচার। তা এঠি নিয়া আসিছিস ক্যান ?

ইয়াসিন বলে, তুমু দশের মাথা, দিগরের মাথা। ক্ষেতি কিছু হামার বেটা করে, জরিমানা দিমো। কেন্তু দশবছুরা চ্যাংড়ার উপর ইকি অবিচার ?

ছেষট্টি সালেও ভায়রোর কাছে এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা। ভিখমাঙ্গা বাজিকর সোজা চোখে তাকিয়ে বিচার চায় ! সারাদেহে কম্প ওঠে তার, খোঁপা খুলে গিয়ে ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে। ভায়রো আওয়াজ তোলে, যে আওয়াজে গোয়ালের গাই পাল দেয়, এমন জনশ্রুতি। ভায়রো সেরকম আওয়াজ তোলে। আজ তার তেজারতির সেই বিশাল সাম্রাজ্য নেই, নেই অফুরন্ত ধানের উৎস জমি। বিভিন্ন কারণে এসব তার কমিয়ে আনতে হয়েছে, করতে হয়েছে নানা ঢাকচাপ গোপন বন্দোবস্ত। কিন্তু এখনো তার দিগর আছে, আছে তাকে জড়িয়ে ক্ষমতার নানা কিংবদন্তি।

তার লোকজন তৈরিই ছিল। তারা কয়েক পা এগিয়ে আসে।

ভায়রো দ্বিতীয়বার কিছু আদেশ দেবার আগে হঠাৎ শারিবা এগিয়ে আসে। কেমন নির্ভীক অকুতোভয় শারিবা। বলে, মালিক হামারও এটা নালিশ আছে। ওমর নামেৎ হামাদের ঘুঁয়াটা কেংকা হাওয়া হোই গেল, সিটা আমি স্বচক্ষে দেখিছিলাম।

শারিবা সোজা তাকিয়ে থাকে ভায়রোর চোখে। ভায়রো স্তব্ধ, ভীষণ। বলে, দেখিছিলা ? মোনেৎ আছে ?

শারিবা আর কোনো কথা বলে না, নিচু হয়ে মহীনকে পাঁজাকোলে তুলে নেয়। ইয়াসিনকে বলে, ওঠেক মামা। মালিকের কাছেৎ বিচার নাই।

ভায়রোর কাছে এ সমস্তই অসহ্য, অপমানকর। এখনি যদি এত সাহস হয়, আর ক'দিন পরে কি অবস্থা হবে ? সে আবার গর্জন করে এব সমবেত নমোশূদ্রদের কিছু আদেশ করে।

অনেকগুলো উল্লসিত কণ্ঠে পেশাদারী হামলার আওয়াজ ওঠে—'মারো শালোদের' 'খুন করি ফালামো'। কয়েকজন লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে আসে।

পাঁজাকোলে মহীনকে নিয়ে শারিবা সবার সামনে। স্বতন্ত্র যাযাবরী বৈশিষ্ট্যে সে চেহারা অনেক বেশি আকর্ষণ দাবি করে। সবার উপরে চিৎকার ক'রে শারিবা বলে থামেন তুমরা, থামেন ! কথা শুনেন হামার !

যে সব বাজিকরেরা ছুটে পালাচ্ছিল তারাও থমকে দাঁড়ায়। শারিবা বলে, আজ বাদে কালই মানুষগুলা মোছলমান হবে সেলা তুমরা জানেন ! আজ ই মানুষগুলার মাথাৎ ডাং মারলে, কাল সারা থানায় আগুন জলি উঠবার পারে, কি উঠবেই।

হাজী সাহেবের ভাগ্না হক সাহেব হেথায় হাজির আছেন, তাকে তুমরা না চিনেন তুমাদের মালিক চিনেন। দাঙ্গার আগুন কি জিনিস, তুমরা জানেন। তাৎ কার ঘর পুড়ে, আর কার মাথা ভাঙ্গে, আর কার বইন-বিটির ইজ্জৎ লুট হয়, সি তুমাদের দেখা আছে। ই-মানুষগুলা তুমাদের সাথ দাঙ্গা করবা আসে নাই, আসিছিল মালিকের কাছেৎ বিচার চাইতে। কিন্তু মালিকের বিচার নাই। ই মানুষগুলাক যাবার দেন!

শারিবা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে। অন্যেরা তাকে অনুসরণ করে। প্রতি-পক্ষ কি এক দ্বিধায় কর্তব্য স্থির করতে পারে না। বাজিকরেরা চোখের আড়াল হয়ে যায়।

মহরমের তিন দিন আগে গভীর রাতে ভায়রোর বাড়ির পিছনে দু'টি ছায়া কি যেন চক্রান্তে অস্থির হয়ে ওঠে। দু'টি নিঃশব্দ ছায়া মাত্র। একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী, অন্যজন শীর্ণাঙ্গ কিন্তু অত্যন্ত ক্ষিপ্র।

একটা চাকা-খোলা গরুর গাড়ির মাচান, যা যে কোনো গৃহস্থের উঠানেই পড়ে থাকে, এনে মাটির উঁচু পাঁচিলের সঙ্গে মইয়ের মতো দাঁড় করিয়ে দেয় তারা। বলিষ্ঠ ব্যক্তির হাতে একটা মোটা বাঁশ, যার দৈর্ঘ্য হাত পনেরো হবে। যদি ভালো ক'রে দেখা সম্ভব হতো তাহলে দেখা যেত বাঁশটি নিপুণ মসৃণ।

ক্ষিপ্র ব্যক্তি মাচানের মই বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠে দুই পাশে পা ঝুলিয়ে সওয়ার হয়ে বসে। স্থানটি তারা নির্বাচন করেছে একটা গাছের অন্ধকার নিচে। পাঁচিলের উপরে বসা ব্যক্তি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভিতরের সব কিছু দেখতে থাকে।

কেননা শারিবা একদল মারমুখী মানুষকে ভয়ংকর একটা পরিণতির অশুভ ও নির্বোধ দিকটা দেখাতে সমর্থ হলেও, একজন কিংবা দু'জন অন্ধকারে এগিয়ে আসা ঘাতককে আটকাতে পারে নি। ভায়রো সম্পূর্ণ বিষয়টি তার পরাজয় ও দিগরপতি হিসাবে অপমানকর বলেই গ্রহণ করেছিল। এই ঘটনার কোনো পূর্ব নজীর নেই, তার ষাট বছরের জীবনে এ অত্যন্ত নতুন ও ভীষণ।

সন্ধ্যার পরে হানিফকে তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে শারিবার মাথায় লাঠির বাড়ি পড়ে। হয়ত আঘাত অন্ধকারে তেমন জুৎসই হয় নি। শারিবা চিৎকার করে দৌড়ায়, ঘাতকরা তার পিছনে ছোটে, আবার আঘাত করে। শারিবার চিৎকারে রাস্তা তৈরির মজুররা সোরগোল ক'রে লাঠিসোটা নিয়ে দ্রুত এসে পড়ে। তাদের সঙ্গে হানিফ। অচৈতন্য শারিবাকে রূপার ঘরে নিয়ে আসে হানিফ।

রক্তাক্ত ও জ্ঞানহীন শারিবাকে দেখে রূপা উন্মত্ত হয়ে যায়। শারিবা তার একমাত্র জীবিত সন্তান। শরমী এখন পর্যন্ত তাকে কোনো সন্তান দিতে পারে নি। রূপা, ভয়ংকর রূপা, প্রকাশ্যেই সব প্রতিজ্ঞা করে, বিষহরির নামে কিড়া কাটে।

শারিবা সারারাত অচেতন থাকে। পরদিন সকালে পাথরকুচি ফেলতে আসা একটা ট্রাকে ক'রে হানিফ তাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যায়। রূপা যায় তাদের সঙ্গে ও হাসপাতালের দরজায় বসে থাকে।

ডাক্তাররা কোনো অভয় দেয় না। মাথায় আঘাত ও অচৈতন্য। জ্ঞান ফিরে

না আসা পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না। রূপা পুরো দু'দিন দু'রাত অন্নজল ত্যাগ ক'রে হাসপাতালের দরজায় বসে থাকে।

তৃতীয় দিনে শারিবার জ্ঞান ফেরে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ঝাপসাভাবে সে প্রথমে দেখে রূপা ও হানিফকে। কিছুটা আশ্বাস পাওয়া যায়।

আরো তিন-চার দিন পরে শারিবা সংকটমুক্ত হয়। ডাক্তারদের অভয় পেয়ে রূপা ফিরে আসে। তারপর সে আকালুকে বলে একটা মোটা বাঁশ যোগাড় ক'রে আনতে। সে ভীষণ গম্ভীর, তার চোখে যাযাবরী আগুন।

আকালু বাঁশ নিয়ে এলে রূপা গভীর অধ্যবসায়ে কাজে লেগে যায়। আকালুকে কাছে কাছে রাখে। প্রথমে কুড়োলের পিছন দিক দিয়ে বাড়ি মেরে বাঁশটাকে ফাটিয়ে চৌচির করে সে। দরমার বেড়া বানাতে হলে যেমনভাবে বাঁশ ফাটাতে হয়, তেমনিভাবে। তারপর ধারালো কাতা দিয়ে বাঁশের ভেতরের গাঁটগুলোকে চেঁছে পরিষ্কার করে। বার বার বাঁশের ভেতরের ব্যাস মেপে দেখে সে। সবশেষে, উপকরণটি তার পছন্দ অনুযায়ী হলে পাটের সুতলি দিয়ে আগাগোড়া জড়িয়ে সে বাঁধে ওটাকে। তারপর আকালুর উপর আদেশ হয় জলা থেকে একটা সোলার টুকরো নিয়ে আসার।

আকালু সোলা আনলে বাঁশের চোঙার দু'দিকে সে দু'টো ছিপি মাপ মতো কেটে লাগায়। তারপর একদিকের ছিপি বিশেষ প্রক্রিয়ায় একটা লম্বা শক্ত সুতোর সঙ্গে এমনভাবে আটকায়, যাতে বাঁশের গোড়ার দিক ধরে সুতোয় টান দিলে সামনের ছিপি খুলে চোঙার মুখ উন্মুক্ত হয়। পদ্ধতিটি বার বার পরীক্ষা ক'রে সে সন্তুষ্ট হয় ও পূর্ণ দৃষ্টিতে আকালুর দিকে তাকায়।

আকালু রূপার বিশাল রক্তাভ চোখ দেখে ও নিমেষেই এই সমস্ত দিনের পরিকল্পনা ও তার পিছনের যাবতীয় উদ্দেশ্য তার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তার চোখ ক্রমেই বিস্ফারিত হতে থাকে।

রূপা চাপা ত্রাসে বলে, আকালু হারামজাদা কাইটে ফালামো, কয়া দিলাম, বুঝলু?

আকালু ঘাড় নাড়ে, অর্থাৎ সে বুঝেছে। 'কাইটে ফালামো', এই কথাটা কদ্দুর প্রথমেই রূপা শরমীকেও বলেছিল। শরমী প্রথম থেকেই বিষয়টা ধরতে পেরেছিল ও সভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এঁ্যা হচ্ছেটা কি?

আকালুর প্রাথমিক বিহ্বল ভাবটা কেটে যাওয়ায় সেও সমান উৎসাহিত হয়। তারপর রূপা বেছে বেছে একটি ঝাঁপি বের করে। ঝাঁপির উপর দু-তিনবার টোকা দেয় সে। ঝাঁপির মুখ একটু ফাঁক ক'রে রূপা শব্দ ক'রে ফুঁ দেয় দু-তিন বার। ভিতর থেকে সমান জোরে সাপ গর্জন তোলে। রূপা তারপর ঝাঁপির ঢাকনা সরিয়ে নিতে কালো বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে একটা সাপের দেহের উপরিভাগ। রূপা ডান হাত সামনে মুঠো ক'রে ধরে সাপকে বার কয়েক

দু'লয়ে বাঁ হাতে চট্ ক'রে সাপের মাথা ধরে ফেলে ও সাথে সাথেই সাপের লেজ ডান হাতের আঙুলে আটকায়। বাঁশের চোঙাটা ইঙ্গিতে আনতে বলে সাপের মুখটা সে চোঙার পিছনের মুখে ধরে। সাপ অক্লেশে চোঙার ভিতরে ঢুকে যায়। সুতোয় টান দিয়ে এবার চোঙার সামনের ছিপি খুলে দেয় রূপা। বাঁশের উপর দু-একবার চাপড় মারতে সাপ বেরিয়ে আসে সামনের দিক থেকে। তারপর রূপা সাপকে আবার ঝাঁপিতে বন্ধ ক'রে রাখে।

সব কাজ শেষ হলে রূপা আকালুকে আরেকবার সতর্ক করে ও বলে সময়মতো আতোৎ ডাকি নিব, চ্যাতনে থাকিস!

তারপর এই মধ্যরাত্রির অভিযান। রূপা স্থির, কিন্তু আকালুর সর্বাঙ্গে উত্তেজনা। পাঁচিলের উপর ঘোড়ার মতো চেপে বসে দম নেয় আকালু। পরে মাচান বেয়ে উঠে আসে রূপা। দীর্ঘ বাঁশটিকে টেনে উপরে তোলে সে। আকালু বাঁশ হাতে নিয়ে ভিতরের গাছের ডালের উপর উঠে পড়ে। একটা নির্দিষ্ট ডালে সে অবলীলায় এগোতে থাকে। রূপা পাঁচিলে বসে নজর রাখে। আকালুর ডালটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে একটু চেষ্টাতেই সে ভায়রোর গোলাঘরের চালায় উঠে পড়ে। টিনের চালায় মাটির দোতালা বাড়ি।

গোলার চালা বেয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে আকালু দোতালার একটা জানলা ধরে ফেলে। আবছা চাঁদ আকাশে। পকেট থেকে রূপার দেওয়া টর্চ বের করে সে। পাকা কাজ রূপার। টর্চের আলোয় দেখা যায় হাত দশেক দূরে ভায়রোর মশারি ঢাকা বিছানা। এসব হিসাব রূপা আগে থাকতেই রেখেছিল। এখন ধীরে ধীরে জানলা দিয়ে বাঁশটা বিছানায় ঢোকায় আকালু। হাত কাঁপে তার। বাতানো মশারি বাঁশ দিয়ে সরানো মুশকিল। একমাত্র নির্ভরতা ভায়রোর প্রচণ্ড নাকের গর্জন। বড় খাট, মশারি ফাঁকা করতে অসুবিধা হয় না আকালুর। তারপর সুতোর টানে ছিপি খুলে বাঁশের উপর আলতো চাপড় মারে সে। বাঁশ হালকা হয়ে যায়। আন্দাজে বাঁশ দিয়ে একটা খোঁচা মারে সে সাপকে। সাপের ক্রুদ্ধ গর্জন দশ হাত দূর থেকেও সে পরিষ্কার শোনে।

অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতায় আকালু ফিরে আসে। পাঁচিল থেকে নেমে দু'জনে প্রথমেই মাচান সরায়। পঞ্চাশ হাত যাওয়ার আগেই ভায়রোর চিৎকার শোনে তারা, কিসি কাটল হামাক! ওরে পুষ্পর মাও—বিপিনা—এনা আলো আন, ওরে হামাক বুঝি সাপে খালো—

দুজনে একটু থমকে দাঁড়ায়, তারপর নিঃশব্দে মাঠে নেমে ছুটতে শুরু করে। সকাল হতে তখনো ঘণ্টা তিনেক বাকি।

পরদিন রোদ ওঠা পর্যন্ত রূপা জেগে থাকে ও নেশা করে। তারপর ভায়রো ও সাপ উভয়েই মরেছে এ খবর শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে যায়।

তার মা শাজাদী এবং ইয়াসিনকে শারিবাই সুখবরটা দেয়। অবিশ্বাস্য এই প্রস্তাব ইয়াসিনকে দিশাহারা করে। হানিফ বিয়ে করতে চায় পলবিকে! সে দীর্ঘ সময় রুদ্ধবাক হয়ে থাকে। তার ভিতরে আনন্দ, বেদনা, উচ্ছ্বাস, অনেক না বলা কথা একসঙ্গে কোলাহল ক'রে ওঠে। সে কিছু বলতে পারে না। এই সব অনুভূতি স্তিমিত হয়ে এলে ইয়াসিনের মনের ভেতরে একটা অদ্ভুত ভয় এসে বাসা বাঁধে। শেষপর্যন্ত সম্ভব হবে তো?

কেননা তার অভিজ্ঞতায় বাজিকরদের জীবনে এ ধরনের সৌভাগ্য কখনো হয় নি। যতদিন তারা পুরোপুরি যাযাবর ছিল, ততদিন সমাজের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা তারা করে নি। এখন এই দীর্ঘদিন ধরে গৃহস্থ হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে যেতে কিছু কিছু প্রত্যাশা সে করে বটে, কিন্তু দাবি হিসাবে এখনো সে কিছুই প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কাজেই হানিফের প্রস্তাব ইয়াসিনকে খুবই বিভ্রান্ত ক'রে দেয়।

সে বারবার শারিবাকে জিজ্ঞেস ক'রে নিজের সংশয় দূর করতে চেষ্টা করে। বিয়ে করবে হানিফ সাহেব? আর কিছু নয়ত? এর মধ্যে অন্য কোনো দুরভিসন্ধি নেই তো?

পাঁচবিবি থেকে পালিয়ে আসার সময় পলবির কারণে গভীর ক্ষতটা ছিল বুকের মধ্যে। একটা দগদগে ঘা, যা দীর্ঘকাল তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সময়ে সবকিছুই ঠিক হয়ে যায়, ঘা-ও শুকায়। জীবন এরকম স্বার্থপরই বটে। ইয়াসিন কি হাসে নি? ইয়াসিন কি স্বাভাবিক হয়ে যায় নি? সবই আবার যেমনকার তেমন চলছিল। সে ভেবেছিল, পলবির মা যেমন মৃত্যুতে মুছে গেছে, পলবিও তেমন বিস্মৃতিতে হারিয়ে গেছে।

তারপর পলবি যখন ফিরে আসে, ইয়াসিন দেখেছিল ঘা উপরে শুকোলেও ভিতরের ক্ষত এখনো আছে। যেন কেউ সেই পুরানো ক্ষত আবার খুঁচিয়ে দিয়েছিল। পলবি যখন আবার কাঙালপনা শুরু করল, আর তা নিয়ে গোষ্ঠীতে নানাকথা হতে থাকে, তাতে সে দুঃখ পেয়েছিল। শাজাদী তাকে অনুযোগ করেছে, মেয়েকে শাসন করতে বলেছে, সেসব কিছুই পারে নি। সে অনেকদিন আগে থেকেই জানত জামিরের মতো ক্ষমতাশালী মণ্ডল বা সর্দার সে নয়। আবার সে ভাবত, জামির অত শক্ত মানুষ হয়েও কি করল বাজিকরদের জন্য? কিন্তু তবুও তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, ছিল প্রচুর ইচ্ছাশক্তি যা বাজিকরদের নতুন ক'রে বাঁচতে হয়ত তৈরি হয়েছে। ইয়াসিন এসব পারে না। সে শুধু দুঃখ পেতে জানে। মেনেও নেয় সেই দুঃখ।

পলবি শুধু দুঃখ দেবে এ সে মেনেই নিয়েছিল, আর এখন শারিবার কাছ থেকে এরকম একটা প্রস্তাব শুনে সে দিশাহারা না হয়ে থাকে কি ক'রে ? হানিফ, যাকে কিসমতের অবস্থাপন্ন চাষী মুসলমানরাও কন্যা সম্প্রদান করতে পারলে বর্তে যায়, সে কিনা পলবিকে বিয়ে করতে চায় ! সেই অল্প বয়সে দেখা একটি একই রকম ঘটনার কথা কি অসংখ্যবার ভাবে নি ? সোজন বাজিকর ও পাখির কাহিনী বাজিকরদের কাছে উপাখ্যান হয়ে আছে। অল্প বয়সে ইয়াসিনদের কাছে সোজন ও পাখি এক বিয়োগান্ত বিষাদের আকর্ষণ। কতবার কতভাবে তারা এসব আলোচনা করেছে ! সেই পাখির পরিণতিও মানুষ দেখেছে। পলবির জন্য ইয়াসিন কি এরকম কোনো পরিণতি আশংকা করে নি ? পাখির পচা ফুলে ওঠা শব সমস্ত যুবক বাজিকরদের চোখের সামনে চিরকাল পুকুরের জলে ভাসে।

কাজেই ইয়াসিন বিশ্বাস করতে চায় না এসব কথা। শুধু তার জীবনে কেন, সমস্ত বাজিকরের অস্তিত্বকালে এরকম অসাধারণ ঘটনা কখনো ঘটে নি। বাজিকর এতে অভ্যস্ত নয়।

পনেরো ষোল বছর আগে একবার সরকারী লোক এসেছিল তাদের পাড়ায় লোকগণনার কাজে। তারা দেখেছিল তখন চাষীগেরস্থরা কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত কম দামে কনট্রোলের কাপড় কিনে আনত। ইয়াসিন ভেবেছিল, হয়ত কনট্রোলের কাপড় কেরোসিন ইত্যাদির জন্য সরকারী লোক নাম লিখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে সে সবার কাছেই বোকা হয়ে গিয়েছিল। কেননা, সবাই জানত কনট্রোলের কাপড়, কেরোসিন এসব কখনোই বাজিকরদের জন্য নয়। তারও কয়েক বছর পর আজুরা মণ্ডলের সাথে একজন নেতা এসেছিল। খুব কালো একজন প্রৌঢ় মানুষ, ভীষণ রোগা রোগা হাত পা। মানুষটার মাথায় একটা সাদা টুপি ছিল। পরে বাজিকরেরা শুনেছিল, মানুষটা একজন কংগ্রেসী নেতা। সেই মানুষটা তাদের কিছু কথা বলেছিল। তার মধ্যে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, ভোট, গান্ধীজী এই সব শব্দ ছিল। এই শব্দগুলো বাজিকর বয়স্কদের কাছে ভীষণ অপরিচিত ছিল না, কিন্তু খুব একটা বোধগম্যও ছিল না। মানুষটি তাদের জিজ্ঞেস করেছিল, গান্ধীজীর নাম তারা শুনেছে কি না।

ইয়াসিন মাথা নেড়ে বলছিল, হ্যাঁ শুনেছে।

—কে সে ?

ইয়াসিন এর কোনো নির্ভরযোগ্য জবাব দিতে পারে নি। তেমনি অন্য শব্দগুলোর মধ্যেও কিছু কিছু চলতে ফিরতে অবশ্যই শুনেছিল তারা, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো বিশেষ ধারণা তাদের ছিল না।

তখন আজুরা মণ্ডল বলেছিল, দাদা, হেথায় অপিক্ষে কর্যে লাভ নেই। ইয়ারা হামার লোক, হামার কথা শোনে।

তারা অবশ্যই আজুরার কথা শোনে। এর আগে একবার আজুরা তাদের বুঝিয়ে ভোট দিতে নিয়ে গিয়েছিল। ইয়াসিন বোঝে এবারও সেই ভোটের ব্যাপার। হাটে বাজারে চলতে ফিরতে এমন কথাই শুনছে তারা।

সেবার অবশ্য ইয়াসিন আজুরাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এলা কি বেপার? কাগজেৎ ছাপা দিলে কি হবে?

আজুরা তাদের খুব পণ্ডিতের ভঙ্গিতে অনেক কিছু বোঝাবার ভঙ্গিতে বোঝাতে শুরু ক'রে দু-চার কথার পর খেই হারিয়ে বলেছিল, ওলা তুমাদের বুঝবা হোবে না বাপু। ওলা মেলাই কঠিন বেপার, রাজনীতি। যেথায় মারবা ক'লাম ওঠি মাইরে দিবেন, বাস!

পাঁচ বছর পরের ভোটে তারা অন্য আরো দু'একজন নেতাকে দেখেছিল। তারা দেখেছিল আলাদা আলাদা ঝাণ্ডা এবং আলাদা দল কেন, এই প্রশ্ন আর তার উত্তরের বীজ তাদের মস্তিষ্কে রোপিত হয়েছিল। এর অন্য কোনো কারণ নেই, শুধু তাদের প্রয়াসলব্ধ সামাজিক স্থিতি তাদের এই উপলব্ধিটুকু জাগিয়েছিল। খুব ক্ষীণভাবে হলেও এই দুইবারের অভিজ্ঞতায় বাজিকরেরা বুঝতে পেরেছিল, আজুরা, আজুরার প্রতিপক্ষ এবং আশপাশের অন্য আর কিছু মানুষের হয়ত তাদের কাছে কিছু গূঢ় প্রয়োজন আছে। এই বোধ আবার আত্মপ্রসাদ লাভ করার মতো যথেষ্ট ছিল না, কিংবা এই প্রয়োজনকে যে কাজে লাগানো যায় এমনও ইয়াসিন অথবা তার নেতৃত্বাধীন বাজিকরদের মনে হয় নি। কাজেই পরবর্তীকালে কনট্রোল, রেশনকার্ড, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি যেসব বন্দোবস্তগুলো বাদা-কিসমতের মতো গ্রামেও হয়েছিল। বাজিকরেরা তার ভাগীদার কিংবা দাবিদার হওয়ার কথা চিন্তাও করে নি। সামাজিক বিবর্তনের যে স্তরে এলে এই সব বন্দোবস্তের অংশীদার হওয়া যায়, বাজিকর যে কারণেই হোক নিজেকে সেখানে উত্তীর্ণ করতে পারে নি। সম্ভবত, ভীতিই ছিল এর প্রধান কারণ।

তারপর এবারে বাজিকরদের মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে-সব অসাধারণ কাণ্ডকারখানা ঘটছে বাজিকর তার দিশা সব সময় ঠিক করতে পারছে না।

প্রথমে হাজীসাহেবের নির্দেশমত সোনামিঁয়া যখন একগোছা কাগজ ইয়াসিনের হাতে দেয় তখন ইয়াসিন জানত না এগুলোর মূল্য কি। ছক কাটা কাগজে খুদে খুদে ছাপা লেখা, তার পাশে অথবা নিচে পেন্সিল দিয়ে সোনামিঁয়া কি সব লিখে দিয়েছে। সোনামিঁয়া বলেছিল এর নাম চেক। এ নাকি ভীষণ দরকারী দলিল। এখন তুমি মালিক হলে এই বসত জমির ভিটার। কেউ তোমাকে আর উচ্ছেদ করতে পারবে না, এখনই ক্ষমতা এই কাগজের।

হবে না? ছাপা কাগজ, তাতে সরকারের লেখা। সে লেখার ক্ষমতা কি আজুরা মণ্ডলের থেকে বেশি? নিশ্চয়ই বেশি, না হলে হাজীসাহেব এমন নিশ্চিন্ত অভয় দেয় কি ক'রে?

তারপরে আবার ভোটের হাওয়া বইতে শুরু করে। আজুরা এবার আর তাদের কাছে আসে না। তার এক ভাইপো এবার তার বিপক্ষ দলে যায়। সেই আসে, বাজিকরদের বোঝায় অনেক কিছু। মোহরের হাটে মাঝেমধ্যে বাজিকরেরা সভাসমিতি দেখে, বিভিন্ন রঙের ঝাণ্ডা দেখে, মিছিলকে হাট প্রদক্ষিণ করতে দেখে নানারকম ধ্বনি দিয়ে, আদিবাসীরা সেইসব মিছিলে মাদল ও ডুগডুগি নিয়ে সামিল হয়। নতুন নতুন মানুষ বাজিকরদের ভোট সম্বন্ধ বোঝাতে আসে।

তৃতীয়ত, ভায়রো সাপের কামড়ে মরে যাওয়ার পর বাজিকরদের ধর্মান্তরের বিষয়ে বিরোধের উত্তাপও কমে যায়। অবশ্য এজন্য ভায়রোর অনুপস্থিতিই প্রধান কারণ নয়। মানুষ এখানে এই রকমই। কিছু অপাঙ্‌ক্তেয় বাজিকর মুসলমান হল কি খ্রীস্টান হল এতে কারোই বিশেষ কিছু যায়-আসে না। তবুও বিষয়টা হাজীসাহেব ও তার সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য বাজিকরেরা তাদের কাছে সমাদর পায়।

আর সবশেষে হানিফের এই প্রস্তাব ইয়াসিন ও সমস্ত বাজিকর গোষ্ঠীকে ভূমিকম্পের আন্দোলনের মতো নাড়া দেয়—গোরক্ষপুরের শনিবারের ভূমিকম্পও এত শক্তিশালী ছিল বলে মনে হয় না।

কাজেই ইয়াসিনের মতো দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ একেবারেই দিশাহারা ও বিহ্বল হয়ে যায়। সে শুধু শারিবাকে বলতে পারে, দেখ শারিবা, বেবাক দিক যেন ঠিক থাকে।

মহররমের দিন বাদা-কিসমতের মসজিদে ব্যাণ্ড-পার্টি আসে শহর থেকে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের গণ্যমান্য মুসলমানেরা হাজীসাহেবের অতিথি হয়। প্রায় দুশ' জন শিশু, যুবা, বৃদ্ধ নরনারী মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয় কলমা পড়ে। একসাথে নামাজ হয়। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাজিকর মুসলমানদের সঙ্গে পান তামাক বিনিময় করে। প্রত্যেকের নামের মধ্যে কিছু নতুনত্ব আসে। যাদের আগে থেকেই মুসলমানী নাম ছিল, তাদের পদবী বাজিকরের বদলে মণ্ডল হয়। যাদের নামে হিন্দুয়ানীর ছোঁওয়া ছিল তাদের নতুন নামকরণ হয়। নতুন লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরা নতুন মুসলমানদের কিরকম বিহ্বল আর নির্বোধ দেখায়। তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু উপহার পায়। ভোজের প্রস্তুতি চলে। বেশ কয়েকটি গরু কাটা হয়েছে। মসজিদের প্রাঙ্গণ লাল নীল কাগজের পতাকায় সাজানো। চতুর্দিকে মুসলমানী উৎসবের হুল্লোড়। তারমধ্যে ম্রিয়মান লাজুক তিনজন মানুষ, যারা এই মুহূর্তে পুরানো অভ্যাস, পুরানো জীবন, পুরানো স্বজনদের ছেড়ে চলে এসেছে। কেননা ছয় ঘর বাজিকর এখনো আগের জীবনকেই শ্রেয় মনে করছে। তারা চোখের জলে বিদায় দিয়েছে স্বজনদের। এরাও চোখের জল মুছেই এখানে এসেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় শাজাদী রূপার অন্ধকার ঘরে গিয়েছিল। অন্ধকারে রূপা ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল। শাজাদী শরমীকে আড়ালে যেতে বলেও অনেকক্ষণ চুপ থাকে। তারপর একসময় ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, জেবনে চাই নাই কেছু, বাজিকর। খালি পর করি দিলা হামাক্! বার বার হামাক্ পর করি দিলা।

শাজাদী ডুকরে কেঁদে ওঠে। রূপা বলে, শারিবার মাও, বাজিকরের জেবনে দেওয়ার কেছুই নাই। বেবাক ছাড়ি যাবার হয়। বাপ-দাদা-নানা হামারাদের থিতু করবার চালো, থিতু হবার পারি কই হামরা? এক দেশ থিকা আন্ দেশেৎ, এক সামাজ থিকা আন্ সামাজে হামরা যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। হামি ভাবি হামি হিঁদু, তুই ভাবো তুই মোছলমান। আসলে হামরা বেবাকেই সিই বাদিয়া বাজিকরই আছি। দুঃখ করিস না শারিবার মাও, ই হামরাদের পাপের ফল।

শাজাদী আরো কাঁদে। শেষে বলে, এটা কথা দেও বাজিকর—

—কি কথা?

—শারিবাক যাতে দিবা হামার কাছেৎ?

—এলা এটা কথা ! তোর বেটা তোর কাছেৎ যাবে না ?

—ছাবালের বিহা দিবা তাড়াতাড়ি ?

—দিমো।

—দূরে সরি গেলাম বলে মনেৎ দুঃখ রাইখবে না তো ?

—দূরে কেন্ ? কাছেই তো আছি। দেখিস, পর হয়ে যাবে না কেউ।

কি গভীর অন্ধকার। রূপা স্পর্শ করে শাজাদীর হাত। দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

ছয় ঘর মুসলমান হয় নি বটে, কিন্তু ভোজ খেতে রূপা, শরমী এবং এরকম দু' চারজন বাদে আর সবাইই গিয়েছিল। জীবনে ভোজ খাওয়ার সুযোগ বাজিকরের কটাই বা আসে।

শারিবা এখনো হাসপাতালে। পলবি-হানিফের বিয়ে উৎসবের পরদিনই বিশিষ্ট অতিথিদের সাক্ষী রেখে। পরদিন তারা হাসপাতালে শারিবার সঙ্গে দেখা করে।

শারিবাকে আরো দশদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। সেই দশদিন হানিফ-পলবিও শহরে থাকে। শারিবা ছাড়া পেলে হানিফ ছুটি নেয় অফিস থেকে। সে পলবিকে নিয়ে মালদায় নিজের বাড়ি যাবে। যদিও খুব আপন বলতে সেখানে তার কেউ নেই, তবু তো স্বজন কিছু আছে।

বাদা-কিসমৎ আর মোহরের যাবতীয় কথা শারিবা এদের কাছ থেকে শোনে। একদিন রূপা আসে। বলে, ঘরোৎ চল শারিবা।

—ঘরোৎ গিয়া খামো কি?

—হামি জিন্দা আছি, শারিবা।

—তুমু খাটবেন, আর হামি বসে খামো?

—এলা এটা কথা? শরীল সারলে নিজেই খাটবি।

আসলে ভাঙা বাজিকর পাড়ায় এই মুহূর্তে শারিবার যেতে মন চাইছিল না। সে যেকোনো একটা ছুঁতো খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত রূপাকে সরাসরিই বলে, তুমু ফিরা যান, বাপ। হামি হানিফ ভাইয়ের কাছেৎ কেছুদিন থাকমো। এটা কাজ কি চাকরী যদি পাওয়া যায়, সি চেষ্টাই দেখমো।

রূপা একটু শংকিত হয়। বলে, তুই কি হামাক্ পর করি দিবার চাছিস, শারিবা?

শারিবা উঠে এসে বাপের দু'হাত নিজের হাতে নেয়। বলে, এক্‌না ভাবেন ক্যান্, বাপ? কাজ কাম তো খুঁজি নিবার হবে। হানিফ ভাই সরকারী লোক, ভালোও বাসেন হামাক্। কেছুদিন দেখবা দেন। শরীলটা এটু সুস্থ হলে দেখা করি আসমো সবার সাথ।

একটু থেমে আবার বলে, আরেকটা কথা, হামার মাওরে বলেন, হামি তারই বেটা আছি, পর হই নাই।

রূপা শারিবার কথার বাস্তব দিকটা মেনে নেয় অগত্যা। হানিফকে বলে, জামাই তুমার হাতেৎ রাখি গেলাম হামার পরাণের পরাণ। দেখ-ভাল করবা আর ফিরোৎ দিবা।

হানিফ তাকে অভয় দেয়। রূপা ফিরে আসে।

মালদায় যাওয়ার পরই হানিফ একত্রে দু'টি চেষ্টা করতে থাকে। প্রথমত, শারিবার একটা গতি করা, আর তারপরে নিজের বদলীর ব্যবস্থা। তার বিভাগীয় অফিস যেহেতু মালদাতেই, বদলীর ব্যাপারে খুব একটা বেগ পেতে হয় না তাকে।

শারিবাকে নিয়ে তারপর সে যায় একটা রাস্তার পাশের চালাওঠা মোটর গ্যারেজে। চার-পাঁচজন যুবক সেখানে নানা ধরনের কাজ করে। মোটরের চাকায় পাম্প করা থেকে ওয়েলডিং অবধি অনেক কিছুই সেখানে হয়। অথচ গ্যারেজ বা দোকানটি অত্যন্ত আগোছাল, যেন দু দিনের জন্য ব্যবস্থা। এক বৃদ্ধ গোলগোল কাচের চশমা নাকে, একটা বড় মাপের খাকি জামা গায়ে, যার দু'টো হাতাই বগলের কাছ থেকে নেই, তদারক করে যুবকদের। যতই আগোছাল হোক, কাজের ব্যস্ততা খুবই।

হানিফ বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বলে, চাচা, আসলাম।

সে একটা খাটিয়ায় বসে পড়ে বৃদ্ধের পাশে। বৃদ্ধ চশমার মোটা কাচে ঠাহর ক'রে বলে, কোন্ শালারে, সকালবেলা গলায় মধু।

—আমি হানিফ, চাচা। অনেকদিন তুমার গাল শুনি না, তাই কলজেটা কেমন ড্য ম্প ম'রি গিছে। দাও, দুটা শুনাও তো!

—ওরে আমার শালারে, সকালবেলা, বিনিপয়সায় গাল শুনবে! ছাড় শালা, সিগ্রেট ছাড়, চা বল সব্বার জন্যে।

চা, সিগারেট, খোশগল্প হয়। হানিফের বিয়ের কথা শুনে আরেক প্রস্থ গালি শোনায় চাচা হানিফকে। শেষে শারিবাকে দেখিয়ে বলে, এ গাঁওয়ার ধর্মেন্দরটাক কুন্ঠি থিকা আনলি?

—ও শারিবা, আমার শালা।

—শারিবা! তুই কি হিঁদু বিহা করিছিস নাকি হানিফ?

—আরে না না হিঁদু নয়, মুসলমানই। সিই তোমাদের উকিলবাবু আমিমুল সাহেব গেল না বাদা-কিসমতে মুসলমান করাতে, সেই মুসলমান!

—নতুন মুসলমান? কামাল কল্লিরে, শোরের ছাও।

—এখন কথাটা শোনো। শারিবারে কাম শিখাতে হবে, মেকানির কাম।

—পারব না, আমার লোকের দরকার নাই!

—তোমার পয়সা খোরাই খাবে ও। নিজে খাটে খাবে। এখন কামটা তো শিখাও।

—হ্যাঁ, ওই বলে আমার ঘাড়েৎ চাপায়। নিজে ফুড়ুৎ হবা। ওসব তাল আমি বুঝি না!

শেষ পর্যন্ত চাচার দোকানে শারিবার শিক্ষানবিশী শুরু হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, কখনো কখনো রাতেও কালিঝুলি মেখে শারিবা চাচার কাছ থেকে কাজ শেখে। ইঞ্জিন, চেসিস, কারবুরেটর, পেট্রল, ডিজেল এসব অদ্ভুত শব্দ শেখে। চেনে ক্লাচ, গিয়ার, ব্রেকের নিখুঁৎ কারিকুরি। চাচার কাছে গাল খায়, চড়চাপড়ও খায়। এইভাবে দিন মাস পার হয়ে বছর গড়ায়।

দু'বছর পরে শারিবা বলে, হানিফ ভাই, একবার বাড়ি যামো।

পলবি বলে, আম্মোও যামো। কতদিন বাপরে দেখি না, আপন মানুষ দেখি না।

একবছরে বাদা-কিসমতে পরিবর্তন কিছু হয়েছে। রাস্তা আরো দীর্ঘ হয়েছে। মোহরের হাট আরো বড় হয়েছে, আরো অনেক স্থায়ী দোকান হয়েছে। এখন নিয়মিত বাসও আসে।

বাজিকর পাড়ায় হিন্দু-মুসলমান পার্থক্য আবছা হলেও চোখে পড়ে। কিন্তু মানুষগুলো একই রকম রয়ে গেছে। সেই একই নিরন্ন হাঘরে বহির্ভূত অসহায় বাজিকর।

—কেমন আছেন, মামা?

ইয়াসিন এক বছরে অনেক বৃদ্ধ হয়েছে। বলে, বাপ যেমন ছিলাম তেমনই আছি। তোর বাপই ঠিক বলিছিল, হামরা পাখমারা আর বাদিয়া মোছলমানের মতোই বেজাত মোছলমান হোই গেলাম।

—বেজাত মোছলমান!

—হাঁ! হাজী সাহেব কহেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, মোছলমানের কিরাকাম মানো, হাদিস মানো, তবিই তুমু সাচ্চা মোছলমান হবা। জাতে উঠবা। তা বাপ, সবই তো করি, কেন্তু জাতে তো উঠি না!

—জাতে উঠেন না!

—না বাপ, বেটি গুলার বিহা হয় না। মোছলমান হয়া হামরাদের ঘর তো ফের কমি গেল।

—হাজী সাহেবেরা একসাথ ওঠ্ বস্ করেন না?

—নামাজ পড়া বখি একসাথ ওঠ্ বস্ হয়, তো সিটা করে, আর কেছু লয়।

—খানাপিনা?

—ইয়াসিন মাথা নাড়ে।

—কাজ কাম দেয়?

—এনা দেয়, যেংকা ছিল।

—আধি জমি?

—আধি জমি রেকড হবার কথা শুনা যাচ্ছে। কাজিই এখন আর আধি নয়, এখন আলগা চুক্তি, মুনিষ-মাহিন্দর কি দিন-পাটা।

শারিবা চুপ করে বসে থাকে।

শাজাদী বলে, ছাড ইসব ছিড়া কথা, আন্ কথা ক'। টাউনোৎ খুব খাটান তোর, না? তাই মুখটা এনা কালা হইছে?

শাজাদী বলে, বয়স কত হোই গেল রে শারিবা, ইবার বিয়া সাদি করবি না?

শারিবা তখন অন্য কথা ভাবে। শারিবা ভাবে তার নানির কথা। তার নানি যেসব প্রাচীন কথা বলত, সেই সব পাপপুণ্যের কথা। বাজিকরদের নসীবের কথা। লুবিনি ধূসর চোখে পাতাল্ নদীর বাঁকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকত জ্যোৎস্না রাতে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে শারিবাকে অলীক সব দৃশ্য দেখাত। লুবিনি বলত, হাঁই দেখ শারিবা, হাঁই দেখ রহু।

—রহু কি করে, নানি?

—রহু বাজিকরদের দেখে।

—হামি দেখার পাচ্ছি নাই, নানি।

নমনকুরিতে পীতেম বলত, হাঁই দেখ লুবিনি, হাঁই দেখ রহু।

—রহু কি করে নানা?

—রহু বাজিকরদের দেখে।

—হামি দেখার পাচ্ছি নাই, নানা।

রাজমহলের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অশরীরী দমু বলত, হাঁই দেখ পীতেম, হাঁই দেখ রহু।

পীতেম দেখতে পেত রহুকে, দেখতে পেত জামিরও। কিন্তু সেই কিশোরী বয়সে লুবিনি রহুকে দেখতে পায় নি, অথচ মরার আগে সে রহুকে দেখত। আবার সে যখন শারিবাকে দেখাত, শারিবাও রহুকে দিশা করতে পারত না। এখন তার মনে হয় এদের সবার মতো সেও হয়ত একসময় রহুকে দেখতে শুরু করবে। এতে তার ভয় হয়। নানির বলা অসংখ্য কথা সে একসময় আবিষ্ট হয়ে শুনত এবং বিশ্বাস করত নানির বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে। এখন যদিও শারিবা এসব কথার কোনো অর্থ পরিষ্কারভাবে ধরতে পারে না, তবুও কেন ভয় হয় অন্য আর সবার মতো একদিন রহু তাকে দেখা দেবে বিষণ্ন মূর্তিতে।

রহু বলবে, তুমি কে?

—আমি শারিবা।

—শারিবা কি?

—শারিবা বাজিকর।

—তবে তো তোমার খুব দুঃখ।

শারিবা বলবে, হ্যাঁ আমার বড় দুঃখ, আমার দুঃখের আসান নেই।

অথচ এখন তো শারিবা লুবিনির অসংখ্য গল্পকথার মধ্যে অন্ত অর্থ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে। সমাজ তাকে কেন ত্যাগ করল? কেন এখনো গ্রহণ করে না? এখন এসব চিন্তা সে সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা করে। গ্যারেজে দুবছর শ্রমিকের কাজ ক'রে তার হীনমন্যতা অনেক কেটে গেছে। শহরের জীবন যদিও অনেক জটিল কিন্তু তার বিস্তারও অনেক বেশি। মোহরের হাটখোলায় চায়ের দোকানে এখনো সম্প্রদায়ভিত্তিক কাপ ও কাচের গেলাস আছে, শহরে নেই। এখানে আর কিছু থাক আর নাই থাক, জাতের কথা গায়ে লেখা থাকে, শহরে অন্তত এরকম অশ্লীলভাবে থাকে না।

ঘরে ফিরে এলে রূপা বলে, দেখে আসলি বেটা কেমন মোছলমান হয়েছে? আগে বলি নাই? তখন কেও হামার কথা শোনল না!

শারিবা এ কথারও উত্তর দেয় না। রূপা ও শরমী আরো ধর্মপ্রাণ হয়েছে, আরো আবেগ দিয়ে তারা বিষহরির পাঁচালী গান করে, বিষহরির ঘটের জন্য আলাদা একখানা চালা তুলেছে—সেখানে ফুল, বেলপাতা, ধূপদীপ দেয়। রূপা এবং শরমীর আরো উন্নতি দেখতে পায় শারিবা। দুজনের গলাতেই হলুদ রঙের নতুন তুলসীর মালা। সন্ধ্যাবেলা রূপাকে সে নতুন গানও গাইতে শোনে—

শুনেছি রাম তারকব্রহ্ম
নয় সে মানব জটাধারী;
মহাপাতক হইয়াছ তুমি
করি লক্ষ্মীকান্তের লক্ষ্মী চুরি।

এবং পরদিন এক বৈরাগী ঠাকুর এলে শারিবা দেখে রূপা ও শরমী বড় অকুণ্ঠ সেবা যত্ন করে তার। বৈরাগী তাদের ইহকাল পরকাল ও পাপপুণ্য নিয়ে অনেক রহস্যময় ও অজানা কথা বলে। তারা সেসব মনোযোগ দিয়ে শোনে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হয়েছে আকালুর। পাসী আকালু এখন আর নিজে গাছে ওঠে না। অসংখ্য তালগাছ ইজারা নেয় সে। তাড়ির গদি সরকারের কাছ থেকে ডেকে নেয়, দোকান খোলে। চৈত্র মাস থেকে তার ব্যবসা কয়েক মাস রমরমা থাকে। সে ভালো টাকাই রোজগার করে। শীতের দিনে খেজুর গাছ ইজারা নেয় সে গৃহস্থের কাছ থেকে। রস নামিয়ে গুড় তৈরি করে। এতেও ভালো পয়সা থাকে তার।

আকালু স্থানীয় একটি পোলিয়া মেয়েকে বিয়ে করেছে। বাজিকর পাড়ায় থাকলেও তার ঘরদোরেই লক্ষ্মীর শ্রী আছে। এত তাড়ি নামায় সে, কিন্তু নিজে কখনো এক চুমুক মুখে তোলে না। তার বউ খুবই কাজের মেয়ে, ভালো গুড় জ্বাল দেয়।

শারিবা বলে, তবি তুই বাজিকরের বিটি বিহা করলু না।

কথায় কি আকালু হারে। বলে, বাজিকরের বিটি হামি বিহা করমো, তো' বাজিকরের বেটাগুলা যাবে কুন্‌ঠি ?

মোহর হাটখোলা এখন একটা বাজারের চেহারা নিয়েছে। আকালুর সেখানে একখানা মুদি দোকানও আছে। সে আজকাল লোককে টাকাও ধার দেয় সুদের বিনিময়ে। মোহর হাটখোলা এখন সরগরম জায়গা। সারাদিনে এদিকে ওদিকে চারখানা মোটর বাস যাতায়াত করে। লোকজন হরদম শহরে যায়, শহর থেকে আসে। শারিবা শুনে অবাক হয় বাজিকর পাড়ার কয়েকজন যুবক শহরে মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখতে যায়।

পাড়ার মধ্যে পথ চলতে শারিবা ওমরের ঘরখানার সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের দাওয়ায় বছর তিনেকের একটি শিশু খেলছে। আসার দিনই রূপার কাছে সবার খোঁজ খবর নিতে গিয়ে সে শুনেছিল ওমরের মা বছরখানেক হল মারা গেছে। এই শিশুটিকে দেখে সে কিছুই চিন্তা করত না, যদি না পরক্ষণেই মালতী ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত। মালতীকে দেখে শারিবা স্থাণু হয়ে যায়।

মালতীকে এখন তপস্বিনীর মতো দেখায়। তার একমাথা রুক্ষ চুল, দীঘির মতো বিশাল চোখ ও সমস্ত শরীরে কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য একটা টানটান তীক্ষ্ণতা।

মালতী শারিবাকে দেখে, কোনো কথা বলে না। খেলতে খেলতে শিশুটি উঠোনে নেমে এসেছিল। শারিবা তার মাথা স্পর্শ করে, শিশু অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়। তারপর শারিবা আবার রাস্তা ধরে চলতে শুরু করে।

হাঁটতে হাঁটতে সে মোহরের আকালুর দোকান আসে। আকালু তাকে মালতীর বৃত্তান্ত বলে।

হ্যাঁ, শিশুটি ওমরেরই ছেলে। মালতীর বাপ-মা চেষ্টা করেও তার আর বিয়ে দিতে পারে নি। প্রথমত, বাজিকরের ছোঁয়া মেয়েকে বিয়ে করার লোকের অভাব। আর দ্বিতীয়ত, মালতী কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হয়নি। তারপর মালতীর বাপ মরে। এতদিন যদি বা কোনোমতে চলছিল, কিন্তু এখন ভাইদের সংসারে মালতী তার শিশুকে নিয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া, মালতীর মতো মেয়ের কাছে পুরুষ মানুষ গোপনে আসতে চাইবে, এও তো স্বাভাবিক। কিন্তু মালতী তার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলোর কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যা পায় নি কারো কাছ থেকে। কাজেই একদিন সন্ধ্যার পর তিক্তবিরক্ত হয়ে সে এক ব্যক্তিকে দায়ের কোপ মারে। ঘটনাচক্রে সে ব্যক্তি বাইশ গিসরের অন্তর্ভুক্ত, যা মালতীর বাপ ছিল না।

এতে ভীষণ গণ্ডগোল হয়। ভায়রো যদিও ছিল না, তাই বলে বিসর একেবারে ভেঙে যায় নি। মালতীর ভাইদের উপর চাপ আসে নানারকমের।

সুযোগ বুঝে ভাইবউরাও এই কাঁটা উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করে। মালতীর বড় ভাইয়ের মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু দুই দুই ঘর পাত্রপক্ষ মালতীর অজুহাতে কথাবার্তা বেশিদূর এগোতে দেয় নি।

কাজেই মালতীকে ঘর ছেড়ে আসতে হয়। কাউকে কিছু না জানিয়ে সে ওমরের জীর্ণ ঘরখানা দখল করে। খবর পেয়ে ইয়াসিন এসে তাকে বলেছিল, একি বেপার? তুমি এঠি থাকবা কেংকা?

মালতী এ ঘর তার স্বামীর ঘর হিসাবে দাবি করেছিল, তাতে বাজিকর পাড়ায় বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে যায়।

কিন্তু ইয়াসিন আবার ঝামেলার ভয় করেছিল। সে মালতীর দাদাদের কাছেও গিয়েছিল। তারা এ সম্পর্কে ভালোমন্দ কোনো কথাই বলে নি। ইয়াসিন তারপর দিগরের মাতব্বরদের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও ভাঙন শুরু হয়েছে। এসব ছুটকো ব্যাপার নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাতে বিশেষ রাজি ছিল না। মালতী সেই থেকে এখানেই আছে।

শারিবা বলে, আছে তো, খায় কি? খোয়ায় কি চেংড়াটাক?

—ক্যান্ কাম করে। মালতী চাষের কাম জানে, খেলানের কাম জানে। আয় খুব পয়-পরিষ্কার। যা রোজগার করে মা-বেটা দুজনার চলি যায় কোনো-মতে। আর সবাই যখন পাকুর পাতা নাজনা পাতা খায়, সেও তাই খায়।

দোকান থেকে ওঠার সময় এক প্যাকেট বিস্কুট কেনে শারিবা।

আকালু বলে, মালতীর কাছে যাবি?

শারিবা বলে, আজ নয়, কাল।

পরদিন শারিবা মালতীর বাড়ি যায়। মালতী ঘরে ছিল না। আগের দিনের মতো তার ছেলে দাওয়ায় খেলছিল।

শারিবা দাওয়ার একপাশে বসে তাকে কাছে ডেকে নেয়। অপরিচিত মানুষ দেখে শিশুর চোখে আতংক হয় একটু। তাছাড়া সে পুরুষ মানুষের সাহচর্যে অভ্যস্ত নয়। শারিবা পকেট থেকে বিস্কুট বের ক'রে তার মুখে দেয়।

—কি নাম তুমার?

শিশু রা কাটে না। এক অপরিচিত মানুষের কোলের মধ্যে বন্দী সে।

শারিবা বলে, ভয় কিরে বেটা? খা, বিস্কুট খা।

মালতী পুকুরঘাট থেকে ফিরে দেখে ছেলে তার শারিবার কোলে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। ছেলেকে আদর করলে কোন মা না সন্তুষ্ট হয়। কিছু না বলে সে ঘরে ঢুকে যায় এবং এক টুকরো খেজুর পাতার চ্যাটাই নিয়ে বেরিয়ে আসে।

—মাটিৎ বসলেন, দাদা?

—আমি ঠিক আছে।

শারিবা চ্যাটাইটা মালতীর হাত থেকে নিয়ে তার উপরে বসে। বলে, ছেলা তো তুমার খুবই চালাক।

মালতী হাসে। ঘাড় বাঁকিয়ে শারিবাকে তার দিকে তাকাতে হয়, কেননা মালতী দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে, তার সঙ্গে কোনাকুনি, সামনাসামনি নয়।

শারিবা তার পরেও ছেলের সাথেই কথা বলে, মালতীর সাথে কি যে কথা বলা যায়, তা সে ভেবেই পায় না, একটা অপরাধবোধ তার ভেতরে কাজ করে, যা সে কখনো ভুলতে পারে না। ওমরকে সে বাঁচাবে বলেছিল, কিন্তু বাঁচাতে পারে নি।

ওঠার সময় মালতী নিয়মমতো আবার আসার কথা বলে। নিয়মমতো শারিবাও 'আচ্ছা' বলে।

পরদিন শারিবা আকালুর দোকান থেকে আবার বিস্কুটের প্যাকেট কিনলে আকালু চোখ নাচিয়ে বলে, ক্যারে শারিবা?

শারিবা আহত হয় ও লজ্জা পায়। সে কোনো কথা বলে না, হাত বাড়িয়ে একটা বিস্কুটের প্যাকেট তুলে নেয় শুধু।

আকালুই আবার বলে, মালতী কিন্তু হাঁসুয়ার কোপ মারে শারিবা, সে খ্যাল রাখেক।

শারিবা এবার বিরক্ত ও অপমানিতও বোধ করে। সে বলে, তোর অনেক পয়সা হচ্ছে নারে আকালু?

—কি কথায় কি কথা!

—ঠিক কথা। শারিবাক চেনো না তুই?

—ছাড দে উসব কথা, মজা করলাম। কথাডা কি, বিহাসাদি কি বুড়' বয়সেও করবু? তোর বাপ বলিছিল—

এভাবে পরপর তিন-চারদিন শারিবা বিস্কুট নিয়ে মালতীর বাড়ি যায়। মালতীর ছেলেটি তার খুব নেওটা হয় ও মালতীও খানিকটা সহজ হয় তার কাছে।

এই দু'বছরে বাজিকর পাড়াতেও যে কি বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, তার খবর শারিবার পুরোপুরি জানা ছিল না। শুধু নমোশূদ্রদের লোভী পুরুষরাই মালতীকে জ্বালাতন করে না, বাজিকরদের জোয়ান ছেলেরাও করে। শারিবার ঘনঘন মালতীর ঘরে যাতায়াতে দু'একজন নজর রাখে এবং আকারে ইঙ্গিতে দু-চার কথা বলেও। শারিবা সতর্ক হয়।

তারপর তাকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে হয়। যে ক'টা সামান্য টাকা সে নিয়ে এসেছিল, তা খরচ হয়ে গেছে প্রায়।

যাওয়ার আগের দিন সে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে আসে।

সে বলে, কাল চলি যামো, ঠিক করিছি।

—কাল?

—হাঁ।

—ফের কবে আসপেন?

—এখন কই কেংকা?

মালতী চুপ ক'রে থাকে।

শারিবাই আবার বলে, এটা কথা ক'বার চাছি।

—ক'ন।

—কি বা আবার ভাবেন তুমি—

—ক'ন।

—ই চেংড়া ছাবাল নিয়া কতদিন এংকা এংকা থাকবা তাই ভাবি।

—করমো কি?

—ই ভাবে তো মেয়ামানষে থাকবা পারে না।

—রূপায় কি?

—রূপায় তো এটাই, বিহা কর।

মালতী হাসে, ম্লান হাসি। তারপর তার চোখে জল আসে। মুখ আড়াল করতে সে ভেতরে ঢুকে যায়।

শারিবা দ্বিধায় পড়ে যায়। কথাটা বলে কি ভুল করলাম? সে ভাবে। সে অনেকক্ষণ একা বসে থাকে। মুসলমানী ও হিন্দুয়ানীতে বিভক্ত বাজিকরেরা রহুকে বিস্মৃত হয়ে গেছে, একথা এবার সে গভীরভাবে ভেবেছে। হতাশার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে আর রহু চণ্ডালের হাড় খুঁজবে না, একথা বোঝে শারিবা। অনেক চিন্তা করেও সে বুঝতে পারে না, এতে বাজিকরের ভালো হল কি খারাপ হল।

শহরে হানিফের সহায়তায় সে একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিল। সরকারী বাসের ক্লিনারের চাকরি। দরখাস্তের যে জায়গায় ধর্মের কথা লেখা আছে, সেখানে কি লেখা হবে সে নিয়ে বড় সমস্যা হয়েছিল। হানিফ পরামর্শ দিয়েছিল, যা হোক একটা লিখে দিতে, হয় হিন্দু, নয় মুসলমান। কেন যেন শারিবা রাজি হয় নি। বলেছিল, লিখেন—বাজিকর। বাজিকর! এমন আবার ধর্ম হয় নাকি? হয় না? নাহলে কেন এত লাঞ্ছনা? দরখাস্ত লেখক বলেছিল, এতে চাকরি হবে না। চাকরি হয়ও নি, সে যে কোনো কারণেই হোক না কেন।

এখন শারিবা এক তীব্র দ্বন্দ্বে ভোগে। রহুকে যারা রক্তের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই রহু, পীতেম, জামির, এরা কি বাজিকরের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা

করতে চেয়েছিল, না চেয়েছিল বাজিকর সবার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাব? রূপা কিংবা ইয়াসিন ঠিক কাজ করেছে, না পৃথক অস্তিত্বের দম্ভ নিয়ে শারিবা ঠিক কাজ করছে? এইসব সমস্যার সমাধান এখন খুবই জরুরি। তার বয়স এখন বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। এখন পর্যন্ত সে বিয়ে করে নি, ঘরসংসার করে নি, যা তার সমাজে এবং পুরো গ্রাম সমাজেই আশ্চর্যের বটে। লুবিনি তাকে বলত 'বুঢ়া', বলত সে নাকি পীতেমের থেকেও বৃদ্ধ। অথচ এই বার্ধক্য লুবিনিই সঞ্চারিত করেছে তার মধ্যে। শারিবা শুধু বৃদ্ধ নয়, শারিবা প্রাচীন। তাই শারিবা আলোছায়ায় সঞ্চরমান রহুর মতো বিষণ্ণ।

দীর্ঘ সময় বসে থাকার পরে যখন মালতী ঘর থেকে বের হয় না, তখন শারিবা মনস্থির ক'রে ফেলে। সে মালতীকে আঘাত করেছে, এতে সে স্থির নিশ্চয় হয়, দুঃখ ও লজ্জা পায় সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, মালতী আমি উঠি।

মালতী দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়, তার চোখ সিক্ত। শারিবা তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিন্তা করে, আমার সংকোচ বোধ করার কি আছে। আমি অত্যন্ত দরকারী একটা কথা বলেছি। সে সোজাসুজি তাকায় মালতীর চোখে। বলে, যদি বেথা দিয়া থাকি তুমাক, তবি মাপ করি দিবা। কিন্তু যি কথাডা ক'লাম সিটা ভাববার। যাই।

মালতীর চোখ আবার উপচে পড়ে। সে কিছুই বলতে পারে না, কোনো কথা নয়।

সারাদিন শারিবা থাকে একটা ঘোরের মধ্যে। সে কাল শহরে চলে যাবে, আবার কি ফিরে আসবে এই মানুষগুলোর মধ্যে? বাজিকরদের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার আর কি কোনো দরকার আছে? শাজাদী ও রূপাকে সে কি বলে যাবে?·শরমী কি বলবে? শরমী তাকে বিয়ের জন্য বড় বেশী চাপ দিচ্ছে।

রাতের অন্ধকার নামলে শারিবা পাতালু নদীর দিকে চলতে শুরু করে। আজ আকাশে চাঁদ আছে। পৃথিবী রহস্যময়। অনেকক্ষণ নদীর পাড়ে সে একা বসে থাকে। তারপর একসময় ফিরবার জন্য সে উঠে দাঁড়ায়, তারপর অন্যকিছু চিন্তা ক'রে গ্রামে ফেরার বদলে নদীর বাঁওরের দিকে এগোয়।

নিস্তব্ধ বাঁওরের চারপাশে একমাত্র হাওয়ার শব্দ। চাঁদের আলোয় দীর্ঘ গাছ এবং নিচের ঝোপঝাড়ে আলোছায়ার লুকোচুরি। নদীর পাড় থেকে ঘাসের জঙ্গল উঠে গেছে একদিকে। আধামানুষ সমান ঘাসের জঙ্গল। সেখানে সঞ্চরণশীল ছায়ার দিকে শারিবা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। লুবিনি এই ছায়ার মধ্যে তাকে রহুকে চিনতে শিখিয়েছিল। তখন সে শুধু ছায়াই দেখেছিল, চোখ তীক্ষ্ণ করেও আর কিছু দেখতে পায়নি। তবুও রহু যেন তার রক্তের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। এমন সে ভাবে,- তবে কি রহু তৃপ্ত? বাজিকরদের আর কিছু না হোক স্থিতি হয়েছে। আর কোনো বাজিকর কোনোদিন এই গ্রাম ছেড়ে নতুন ক'রে রাস্তায় বেরোবার কথা ভাববে না। এখন তার যা কিছু ভাবনা তা এই দরিদ্র হতশ্রী কুঁড়েঘরগুলোকে কেন্দ্র ক'রে, এতে শারিবার আর কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু শারিবার রক্তের অস্থিরতা কাটে না কেন? কেন লুবিনির কাঁপা কাঁপা হাত তাকে এখনো অনেক কিছু দেখাতে চায়? সে আলোছায়ার দিকে তাকিয়ে পীতেমের মার খাওয়া দেখে, পেমার আর্তনাদ শোনে, নমনকুরির বন্যার জল ক্রমশ বেড়ে উঠে সর্বনাশ হতে দেখে, নৌকার গলুইয়ের উপর রক্তাক্ত জামিরকে দেখে। সে দেখে লুবিনিকে ধর্ষিতা হতে, হাতির পায়ের চাপে ঘর ভাঙছে, শিশু মরছে—পলায়নপর বাজিকর গোষ্ঠীকে সে দেখে জল কাদা ভেঙে পাতালু নদীর তীর ঘেঁষে ছুটতে। সে দেখে সেই বীভৎস রাত যখন তার ভাই সাপের কামড়ে মারা যায়। আরো কত জানা-অজানা দৃশ্য সে সম্মোহিতের মতো দেখে। তারপর সবশেষে ওমরের ছিন্ন মুণ্ড যখন আকাশপথে তার দিকে ছুটে ভাসতে থাকে তখন সে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে। দু'হাতে মুখ ঢেকেও রেহাই পায় না সে। ওমরকে সে বলতে শোনে, শারিবা তুই হামাক বাচাবু বলিছিলি!

এ সবের কোনো উত্তর কি আছে শারিবার কাছে? সে চোখের থেকে হাত নামিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকায়। পীতেম থেকে শারিবার মধ্যেকার এই একশো বছরে বাজিকর স্থিতি পেয়েছে। এখন আর তাকে সহজে কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না, একথা এখন সব বাজিকরই বোঝে। আবার যদিও মাত্র কয়েক বছর আগেই ওমরের কবন্ধ যে অপরাধে এই নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, আজ যদি শারিবা সেই মালতীকেই বিয়ে করে তবে নিশ্চয়ই আর সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার প্রথম কারণ বাজিকরেরা স্থিতি পেয়েছে, আর দ্বিতীয় কারণ, ভায়রো যে ব্যবস্থাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে রেখেছিল, তার মৃত্যুর পর বড় দ্রুত ভেঙে পড়ছে সেই ইমারৎ। বিরোধ বাড়ছে দিগর এবং দিগর-বহির্ভূত মানুষদের মধ্যে। সব দিগর-বহির্ভূত মানুষেরা বাজিকরদেরও সমর্থন চায়। শারিবা কালই ইয়াসিনকে বলবে সেই সব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যারা ভায়রো, আজুরা ও অন্যান্য ভূস্বামীর হিসাব-বহির্ভূত জমি দখলের চক্রান্ত করছে। এইভাবেই স্থায়িত্ব আসবে।

শারিবা শান্ত হয়। কিন্তু তার পরেই তার ইন্দ্রিয় প্রখর হয়। ঘাসের জঙ্গলের কাছে একটি ঘনীভূত ছায়া, শুধু ছায়াই নয়, মনুষ্য আকৃতি বিশিষ্ট। এই অত্যন্ত অনাবৃত প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সঞ্চরণশীল ছায়া দেখে সে শিহরিত হয়। প্রথমেই তার লুবিনি বর্ণিত রহুর কথা মনে হয়। সে স্থির হয়ে অপেক্ষা করে।

ছায়াশরীর ঘাসের ঝোপের আবছা আড়াল ছেড়ে উন্মুক্ত বেলাভূমিতে আসে ও সমর্পণের ভঙ্গিতে মাটিতে বসে। শারিবা মালতীকে চিনতে পারে। মালতী এমন রুদ্ধ আবেগে কাঁদে যে শারিবার উঠে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে সাহস হয় না। মালতী এইভাবে দীর্ঘ সময় কাঁদে।

তারপর একসময় শারিবা ধীরে ধীরে মালতীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তার মাথায় হাত রাখে। মালতী আতংকিত চিৎকারে নদীতীরের স্তব্ধতা খান খান করে।

শারিবা তাকে দু'হাতে ধরে ও বলে, মালতী আমি শারিবা।

মালতী বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখে, থরথর ক'রে দেহ কাঁপে তার, সে নিমজ্জমান মানুষের মতো শারিবাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে।

অনেকক্ষণ এভাবে থাকার পর শারিবা তাকে ঠিকভাবে বসায়। বলে, তুমি চিল্লালা ক্যান্?

—ডর লাগিছিল। ভাবলাম পি বুঝি হামার মাথাৎ হাত রাখে।

—পাগল।

—মানুষ মরলে কুথায় যায়?

—মাটিৎ মিশা যায়।

—সাচা? আর কেছু থাকে না?

—থাকে, যি মানুষ মরে, অন্ত মানুষের মনে থাকে সি। ইয়াই হামার জানা।

—তবি যি মানুষে কয়—

—আর কিছু জানা নাই হামার।

—তাই।

—ইখানে আসিছিলা ক্যান্?

—সকালে কথাডা ক'লেন, মন যে বড় উতলা হল। তাই ভাবছিলাম চেংড়ার বাপের মন বুঝি। জীবনটা তো কাটাবা হবে।

—সিটাই ভাবার কথা। ওমরকে তো ভুলবা কছি না। ওমর থাকুক যোদের মনেৎ।

মালতী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

শারিবা বলে, আর কোনো কথা আছে মনে?

মালতী বলে, হামার চেংড়া?

শারিবা বলে, হামার চেংড়া হবে।

শারিবা উঠে দাঁড়িয়ে মালতীকে হাত ধরে তোলে, তারপর দু'জনে গ্রামের দিকে ফিরতে থাকে।